আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

পরবাস

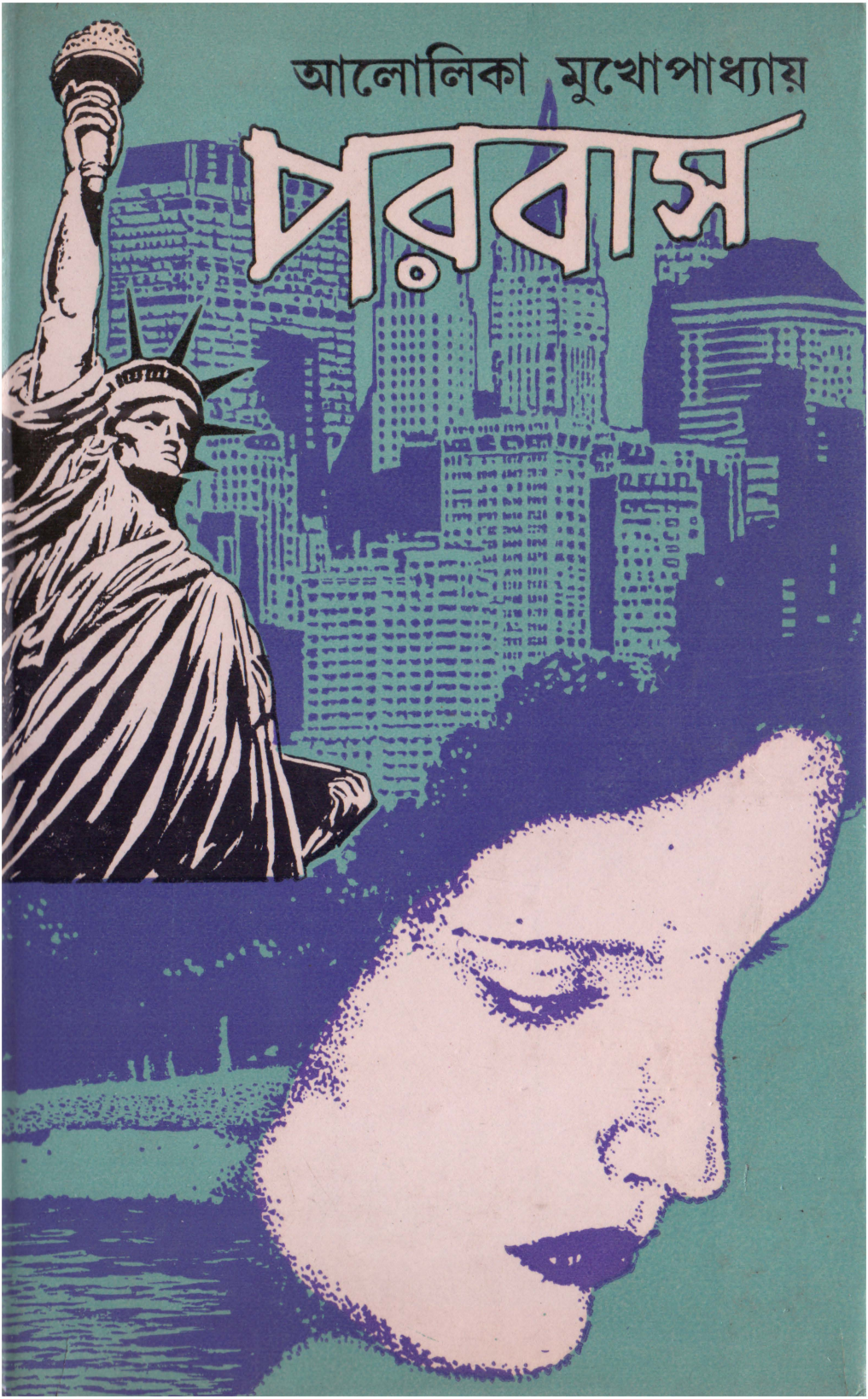

পরবাস

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু বাবাকে—

আমার প্রথম প্রকাশিত বই-এর জন্যে যাঁর
একান্ত আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা ছিল।

সূচীপত্র

আবিষ্কার ১
সুখ দুঃখের ভাগ ১১
কালীধনের দিদি ১৮
কালো বুদ্ধের চোখ ২৫
পরবাস ৩২
সমন ৩৯
যামিনীর কথা ৪৯
রিনির ভাবনায় একটি সোমবার ৫৫
সানকারলোসের স্বপ্ন ৬৪
অজাতক ৭৩
ভুল স্বর্গ ৮৪
রাজা সলোমনের দরবারে ১০২
আবরণ ১২৩
অনিকেত ১৪০

ভূমিকা

পশ্চিমবাংলা আর বাংলাদেশের মানুষ সাহিত্য মনস্কতায় সমশ্রেণীভুক্ত—এমন এক মর্যাদা দানের পরে, এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাঙ্গালীর কোনো পর্যায় ভুক্তি আছে কিনা, সেই সংশয় নিয়ে আমার গল্প সংকলনের ভূমিকা লেখার তাগিদ অনুভব করেছি। প্রবাসী অথবা অভিবাসী যে নামেই চিহ্নিত থাকি, আমরা যারা সামান্য কিছু লেখালেখির প্রয়াস নিয়েছি, স্বীকৃতি আর মূল্যায়নের আশায় শুধুমাত্র এই প্রবাসী সমাজের ওপর নির্ভর করতে পারি না। আমাদের মূল লক্ষ্য—দেশের পাঠক সমাজ। তাঁদের দৃষ্টিদানের অপেক্ষায় থাকি। ভাষার ভিত্তিতে বাঙ্গালী, ভৌগোলিক ভিত্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক—এরকমই আমাদের পরিচয় হোতে পারে। অথবা পর্যায় ভুক্তি।

এই গল্পগুলির পটভূমি মূলতঃ মার্কিন দেশ। ঘটনা, চরিত্র সবই অভিবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা আর অনুভব থেকে জন্ম নিয়েছে। আমেরিকার বাঙ্গালীকে যদি অন্য ধরণের বাঙ্গালী বলে চিহ্নিত করা হয়, তবে এ সেই অন্য বাঙ্গালীদের গল্প। শৈশব থেকে কৈশোরে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যাচ্ছে যে মার্কিন বাঙ্গালী, গত বাইশ বছরে তাদের কথা বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছি। অধিকাংশ গল্প "দেশ" ও "শারদীয়া বর্তমানে" প্রকাশিত হোয়েছে। এবং অধুনালুপ্ত "সুকন্যায়"। ছোটদের নিয়ে লেখাগুলি "কিশোর মন," আর আমেরিকার স্থানীয় পত্রিকা "আন্তরিকে" ছাপা হয়েছিল।

এই সংকলনে ছোটদের গল্প আর বড়োদের গল্প বলে কোনো শ্রেণীবিভাগ করিনি। শুধু ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অন্য ধরণের বাঙ্গালীর শৈশবের গল্প থেকে শুরু করেছি। একাধিক বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে নয়, এই সমাজের প্রতিচ্ছবি আঁকার চেষ্টায় কিছু ঘটনা ও চরিত্রকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছি।

গল্পগুলিকে বই-এর আকারে প্রকাশ করতে চেয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য ও উপদেশ পেয়েছি শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। এ জন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে, যিনি প্রথম আমাকে "দেশ" পত্রিকায় লেখার জন্যে উৎসাহ ও সুযোগ দিয়েছিলেন। ধন্যবাদ—শ্রীআনন্দ বাগচী ও শ্রীবরুণ সেনগুপ্তকে। এই সংকলন প্রকাশের ভার নিয়েছেন প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স'। এ জন্যে এঁদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

গল্প সংকলনের ভূমিকা আর দীর্ঘ করবো না। কেন এই নির্বাচন, কেমন এই নির্বাচন, সে বিচার পাঠকের। মনোনয়ন অথবা "অমনোনয়নের টিকা" শিরোধার্য করার দায় থাক আমার।

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

১৫ই মার্চ ১৯৯৫
ওয়েন
নিউজার্সি।

পরবাস

॥ ১ ॥ আবিষ্কার

আজ হাইস্কুলে আমাদের গ্র্যাজুয়েশন হল। আমার স্কুলের পর্ব শেষ। আগামী সেপ্টেম্বরে কলেজে যাবো। ভাবতে কি আশ্চর্য লাগছে, শেষ পর্যন্ত আমেরিকায় আমার স্কুলজীবন কেটে গেল! অথচ দশ বছর আগে, আমি কেন, মা-ও ভাবতে পারতো না আমার পড়াশোনা কেমন করে হবে। কোথায় হবে? আমাকে কি করে বড় করে তুলবে—সেই চিন্তাতেই মা তখন দিশেহারা। আজ আমার গ্র্যাজুয়েশনের দিনে মা এত খুশি, কিন্তু একবার যেন চোখের পাতা ভার ভার মনে হোলো। মা কি তবে লুকিয়ে কখনো একটু কেঁদেছিল? কি জানি।

এখন রাত তিনটে বাজে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। সারাদিনের আনন্দ উত্তেজনার ফলে হয়ত স্নায়ুগুলো শান্ত হতে পারছে না। তার চেয়েও বড় কারণ বোধহয়—আমি যে আজ খুব বড় একটা ঘটনা আবিষ্কার করে ফেলেছি। সেই আবিষ্কারের মুহূর্ত থেকে এমন এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শুধু আজ নয়। হয়ত আরো অনেকদিন তার রেশ থাকবে। শুয়ে শুয়ে আজ কেবলই ভাবছি···

ছোটবেলার সব কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে আর সব ছোট ছেলেমেয়েদের তুলনায় আমার শৈশবের পরিবেশ অনেকটাই অন্যরকম ছিল। আমরা গোরখ্‌পুরে মাসীর বাড়িতে থাকতাম। মাঝে মাঝে বেনারসে যেতাম, গোধুলিয়ার মোড়ে দিদিমার ছোট্ট ঘরে। আমার মার নিজের কোনো থাকার জায়গা ছিল না। বাবাকে কখনো দেখিনি। তবে জানতাম, আমার বাবা আছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। বাবার কথা জানতে চাইলে মা বলতো—"তোর বাবা অনেক দূরে চাকরী করে। তাই আসতে পারে না।"

কিন্তু দিদিমা বাবার কথা উঠলে ভীষণ রেগে যেত। বড়মাসী তো বলেই ছিল আমার বাবা খুব খারাপ লোক। মাকে নাকি প্রায়ই মারধোর করত। তাই দেড়বছর বয়সে আমাকে নিয়ে মা চলে এসেছিল। ঘুরে ঘুরে এখানে ওখানে মার জীবন কাটতো। বাবা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে খুব বেশি চেষ্টাও করেনি। কিন্তু আমাকে জোর করে ফেরত নিয়ে যাবে বলে চিঠি লিখে লিখে ভয় দেখাতো। একবার নিতে এসেওছিল। আগে থেকে বুঝতে পেরে বড়মাসী আমাদের সরিয়ে দিয়েছিল। ওদের রেলকোয়ার্টারের পেছন দিকের রাস্তায় রেলওয়ে হাসপাতালের কমপাউণ্ডার শিউপূজনের বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে মা পনেরোদিন আমাকে নিয়ে লুকিয়ে বসেছিল। বাবা নাকি সেদিন পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু সত্যি সত্যি পুলিশ ডেকে আনেনি।

আসলে বাবা বোধহয় চাইতো, আমরা বাবার কাছে থাকবো, কিন্তু নিজে সংসার ছেড়ে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াবে। ঠিকমত টাকা পয়সা রোজগার করবে না। মা প্রতিবাদ করতে গেলে মাকে মারধোর করবে। বড় হবার পর মার কাছে শুনেছি—বাবার আলাদা একটা সংসার ছিল। সেটাই প্রথম সংসার। আমার মামার বাড়ির দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, এ সব কথা লুকিয়ে বাবা মাকে বিয়ে করেছিল। তারপর দুই সংসারের প্রয়োজন মেটাতে পারতো না। তাই নিয়ে অশান্তি করতো, মাকে কষ্ট দিতো।

সেই বাবাকে আমি একেবারেই মনে করতে পারি না। ছোটবেলা থেকে পরগাছার মত যে সব আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে থাকতাম, তাদের অবস্থাও বিশেষ সচ্ছল ছিল না। আমার স্কুলে ভর্তি হবার বয়স হলে মা একটানা গোরখপুরে থাকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ বাবার চিঠি এলে মা ভয়ে ভয়ে আমাকে নিয়ে এখানে ওখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতো। ক্রমশ বাবার ভয় দেখানোর জোর কমে আসছিল।

আমি গোরখপুরে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। পড়াশোনা ভালোই লাগতো। মা বাড়িতেও অনেক বাংলা বই জোগাড় করে এনে পড়াতো। মা নানারকম সেলাই জানতো। ওখনকার চেনাশোনা লোকেদের বাড়ি জামাকাপড় সেলাই করে দিয়ে কিছু কিছু রোজগার করতো। মার সঙ্গে রেলকলোনীর কোয়ার্টারে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন ছিট কাপড় নিয়ে আসতাম। আবার তৈরি হওয়া জামা-কাপড় দিয়ে আসতাম। হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা করলে সাইকেল রিকশা চড়তে চাইতাম। মাঝে মাঝে মা আমাকে সাইকেল রিকর্শা চড়িয়ে গোরখনাথের মন্দিরে নিয়ে যেত। মন্দিরের বিরাট বাগানে বসে বসে কত কি ভাবতো। আমি বাদাম খেতে খেতে গেটের বাইরে বাঁদর খেলা দেখতাম। সে সব দিনে মা যতই উদাস দৃষ্টি মেলে জলের ধারে বসে থাকুক না কেন, আমি কিন্তু ঘাগ্‌রাপরা 'ফুলমতী' আর টুপীপরা 'রামদাসের' বিয়ে দেখে, মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে সাইকেল রিকশা চড়তে পেরে ভীষণ খুশি হয়ে ভাবতাম—রোজ কেন এত মজা হয় না ? এই ছিল আমাদের জগৎ।

একদিন দুপুরে রেলওয়ের বোস সাহেবদের বাড়িতে মার সঙ্গে বালিশের ওয়ার দিতে গিয়ে নতুন একজনকে দেখলাম। মোটা মত, মাথায় অল্পস্বল্প চুল, খুব ফর্সা সেই ভদ্রলোক চক্‌চকে জামাকাপড় পরেছিলেন। হাতে আলো-জ্বলা-নেভা ঘড়ি, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। গা থেকে কি সুন্দর সেণ্টের মত গন্ধ বেরোচ্ছিলো।

আমরা অফিসারদের বাড়িতে সামনের গেট দিয়ে ঢুকতাম না। সেদিনও পেছনের বাগানের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম। ভদ্রলোক সেখানে ক্যামেরা নিয়ে একটা গাছের ছবি তুলছিলেন। আমাদের দেখে সামান্য হাসলেন। মা তো থতমত খেয়ে গিয়েছিল। উনি আমার একটা ছবি তুলতে চাইলেন। একটুও লজ্জা না পেয়ে আধময়লা হাফ্‌প্যাণ্ট, গেঞ্জী আর রবারের চটিপরা অবস্থায়

হাসি হাসি মুখে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। আবার কি মনে করে বিবেকানন্দের ছবির স্টাইলে হাত দুটো আড়াআড়ি করে বুকের সামনে রাখলাম। জীবনে সেই প্রথম আমার একার ছবি উঠেছিল। খুব হাসবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রোদ্দুরে চোখদুটো খালি কুঁচকে যাচ্ছিলো।

মিসেস বোস মাকে স্নেহ করতেন। আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা জানতেন। বড় মেসোমশাই-এর রেলওয়েতে সাধারণ চাকরী ছিল। তাঁর সংসারে মা যে কত সংকোচ নিয়ে থাকতো, তাও মিসেস বোস বুঝতে পারতেন। সেই দারিদ্র্যের মধ্যেও মার চেহারায় এমন এক উজ্জ্বল দীপ্তি ছিল, আত্মসম্মান-বোধের ছাপ ছিল, সহজে কেউ অবজ্ঞা করতে পারতো না।

আমার ছবি তোলার ঘটনার পরে কি যে হল ঠিক বুঝতে পারলাম না। বেশ কয়েকবার মিসেস বোস আমাদের ডেকে পাঠালেন। প্রতিবারই ফর্সা লোকটি মা-র সঙ্গে আলাদা ঘরে বসে কি সব কথাবার্তা বললেন। পরে দুবার ওঁরা গাড়ি পাঠিয়ে মাকে নিয়েও গেলেন। কিন্তু বড়মাসী আমাকে সঙ্গে যেতে দিলো না।

কয়েকদিন পরে আমি না বলতেই মা আমাকে নিজে থেকে সাইকেল রিকশা চড়িয়ে গোরখনাথের বাগানে নিয়ে গেল। বাগানে বসে বাদাম কেনার পয়সা দিল। গেটের বাইরে থেকে বাদাম কিনে নিয়ে গিয়ে দেখি মা একমনে কি যেন ভাবছে।

বসে বসে বাদাম খাচ্ছি, মা হঠাৎ বললো—"শামু, আজ তোকে একটা গল্প বলবো।" আমি তো বেশ অবাক হয়ে গেলাম। এমনিতে মা নিজে থেকে গল্প বিশেষ বলতেই চাইতো না। আর বললেও সেই একঘেয়ে ডালিমকুমার আর বুদ্ধুভুতুম। সেগুলো আর শুনতেও ইচ্ছে করতো না। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে বললাম—"তাহলে একটা নতুন গল্প বলো।"

মার গলার আওয়াজ কি রকম যেন কাঁপছিল। ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার কপালে, গালে সুড়সুড়ি দিতে দিতে মা বলছিলো, "দুখিনী মা আর তার ছোট্ট ছেলে দুখীর গল্পটা তোর মনে আছে শামু?"

আমি মাথা দুলিয়ে বলেছিলাম—"হুঁ-উ-উ। কিন্তু আর দুঃখের গল্প শুনবো না। একটা মজার গল্প বলো।"

মা বলেছিল, "নাঃ, আর দুঃখের গল্প বলবো না। সেই তাদেরই এবার কত মজা হবে শোন্। তাদের কষ্ট দেখে হঠাৎ একজন বড়মানুষের খুব মায়া হল। তিনি মস্ত বড় চাকরী করেন। অনেক দূর দেশে থাকেন। বিরাট বাড়ি, গাড়ি।"

আমি বলতে লাগলাম—"ঝি, চাকর, মালী, দারোয়ান"। মা থামিয়ে দিয়েছিল—"না, না, ও সব তাঁর কিছুই নেই।"

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম—"তবে কি রকম বড়লোক মা?"

মা উত্তর দিয়েছিল, "না রে, বিদেশের বড়লোকদের ঝি, চাকর দরকার হয়

না। মেশিনেই সব কাজ করা যায় তো।"

'বিদেশের বড়লোক' কথাটা শোনামাত্র আমার গল্পের ঘোর কেটে গিয়েছিল। ন' বছর বয়সেই ঐ গল্পের মধ্যে যেন একটা সত্যি ঘটনার পূর্বাভাস খুঁজে পেয়েছিলাম। হঠাৎ উঠে বসে মার চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম, "কে এত বড়লোক মানুষ মা? যার দুখিনী মা আর দুখীকে দেখে কষ্ট হল?"

মা চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীর গলায় বলেছিল, "দুখিনী মা আর দুখীকে তুই চিনিস?"

আমি স্পষ্ট বলেছিলাম—'চিনি'।

মা যেন খুব চেষ্টা করে বলতে পারল, "সেই লোক হলেন মিসেস বোসের দাদার বন্ধু সুকুমার বিশ্বাস।"

আমি ভালো করে কিছু বুঝতে পারছিলাম না। বলেছিলাম, "ঐ সাহেবদের মতো মোটকা বুড়োটা আমাদের কি দেবে মা? অনেক টাকা?"

মা একটু হাসবার চেষ্টা করল, "বুড়ো নয় রে, মাথায় চুল কম বলে ওরকম দেখায়। টাকা দেবেন কেন? সে তো দুদিনেই ফুরিয়ে যাবে।"

—"তবে কি দেবে?"

মা আমার রোগা হাতটা মুঠোয় চেপে ধরে এক পলক তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "উনি আমাদের সারাজীবন ওঁর কাছে থাকতে দেবেন। তোকে মানুষ করবেন। তুই আমেরিকায় কত আরামের মধ্যে থাকবি। সাহেবদের স্কুলে পড়বি।"

আমি কয়েকমুহূর্তে সেদিন কি বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে গিয়েছিলাম? কিছু সন্দেহ আমাকে পেয়ে বসেছিল। মরীয়ার মত মাকে চূড়ান্ত প্রশ্ন করেছিলাম, "কিন্তু কেন মা? কেন উনি আমাদের এত দয়া করবেন? তুমি যে বলো কারুর কাছে কিছু চাইতে নেই। তবে? আমরা তো চিনিই না ওকে!"

মার সারামুখে যন্ত্রণার ছাপ। সেদিন বোধহয় নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বিষণ্ণ গলায় বলেছিল, "উনি আমাকে বিয়ে করবেন শামু। তোর তো বাবা থেকেও নেই। উনিই তোর বাবার মতো হবেন।"

সেই রাতে আমি কতক্ষণ যে জেগেছিলাম। মার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে থেকেও বুঝতে পেরেছিলাম, মা জেগে ছিল। আমি বাবাকে দেখিনি। 'বাবা' ডাক কেমন তাও জানতে পারিনি। বাবা না থাকার দুঃখ অথবা থাকার আনন্দ কোনো কিছুই আমার অভিজ্ঞতায় ছিল না। শুধু কষ্ট হতো ভালো খাবার, ভালো জামাকাপড় পাইনি বলে। দুঃখ হত মাকে সবাই বকতো বলে। ভালো স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পাইনি। গাড়ি চড়া, বড় বাড়িতে থাকা সে সব তো সেদিন স্বপ্ন ছিল আমার কাছে। তবু যখন মা বলল আমাদের সুসময় আসছে, জানি না কেন সেরকম আনন্দ হল না। কি এক অজানা ভয়, মাকে ঘিরে

অদ্ভুত সব চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুলছিল। আমরা আমেরিকায় গিয়ে অনেক আরামে থাকবো, মার কাছে প্রচুর টাকা থাকবে—এই সুখের ছবির পাশাপাশি বিরুদ্ধ কোনো পরিস্থিতির সম্ভাবনা আমার কাছে প্রবল হয়ে উঠেছিল। বারবার চেয়েছিলাম, দয়ালু লোকটা তার সব টাকা আমাদের দিয়ে দিক, শুধু নিজে দূরে থাকুক। দুঃখিনী মা আর দুখীর গল্পে সেই অতিরিক্ত চরিত্রকে আমি চাইনি। সেদিন শেষ রাতে মা আমার পিঠে হাত রেখে ডাকছিল। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলাম।

সুকুমার বিশ্বাস সেবার রচেস্টারে ফিরে এসেছিলেন। একবছর পরে গিয়ে মাকে বিয়ে ক'রে আমাদের নিয়ে এসেছিলেন। বোস সাহেবদের চাপে পড়ে বাবা তারই মধ্যে মাকে বাধ্য হয়ে ডিভোর্স দিয়েছিল। আমি ছোট ছিলাম বলে মা আমার দায়িত্ব পেয়ে গেল। মামার বাড়িতে কেউ মার দ্বিতীয় বিয়েতে আপত্তি করেনি। মার জীবনে এবার একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আসবে ভেবে দিদিমাও বাধা দেয়নি।

রচেস্টারে এসে প্রথম কিছুদিন যেন স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কাটল। গোরখপুর, বেনারসের বাইরে যে এমন পৃথিবী আছে, জীবনযাত্রা যে এত সমৃদ্ধ হতে পারে, মানুষ যে এরকম ফর্সা হয়, সুন্দর হয়, কোনো বাড়িতে যে অফুরন্ত খাবারের ব্যবস্থা থাকে—প্রতিনিয়ত তার আবিষ্কারে আমি মগ্ন হয়ে থাকলাম। সুকুমার বিশ্বাসের বিশাল বাগানঘেরা মস্ত বড় বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। বাগানে নতুন নতুন পাখি অচেনা গাছপালা। কখনও হরিণ থমকে দাঁড়ায়। খরগোশও এত কাছে যেন কখনও দেখিনি। সুকুমার বিশ্বাসের আমেরিকান বৌ কয়েকবছর আগে ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন। একমাত্র মেয়ে মিশেল ডর্মে থেকে কলেজে পড়ছিল। সে ছুটিতে বাড়ি এসে আমাদের দেখে প্রথম প্রথম ভীষণ গম্ভীর হয়ে থাকতো। আমার চেয়ে অন্তত দশ-এগার বছরের বড় বলে আমি তাকে দিদি কিংবা মিশেলদি বলার চেষ্টা করেছিলাম। মা-ই শিখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মিশেল ঐ সব ডাকাডাকি একদম পছন্দ করেনি। তার কথামতো তাকে মিশেল বলেই ডাকতে শুরু করলাম। মাকেও সে সরাসরি 'মীরা' বলে ডাকতো। অথচ আমি ভাবতেই পারতাম না ওর কুমড়োপটাশ বাবাকে (গোরখপুরে মাসীর ছেলেরা সুকুমার বিশ্বাসের ঐ নাম দিয়েছিল)। আমি যখন তখন 'সুকুমার' 'সুকুমার' বলে ডাক ছাড়ছি। পরে বড় হয়ে মিশেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমি যদি ওর বাবাকে ড্যাড্ বলতে পারি, ও কেন আমার মাকে সেই সম্মান দিতে পারেনি? মিশেল বলেছিল—সে আমার মাকে অসম্মান করে না। কিন্তু নিজের মা বলেও ভাবতে পারে না। ওর বক্তব্য ছিল আমি তো জীবনে নিজের বাবার স্নেহ, ভালোবাসা পাইনি। তাই বাবার মত কাউকে পেয়ে হয়ত সে অভাববোধ কিছুটা মিটে গেছে। কিন্তু ও তো সেদিন পর্যন্ত নিজের মার স্নেহ, আদরযত্ন পেয়েছে। সেই মার জায়গায় আর কাউকে মেনে নেওয়া যায় কখনো?

মিশেল আমার ঘর সাজিয়ে দিয়েছিল। কোনো ছোট ছেলের জন্যে যে এরকম সাজানো ঘর থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। দেওয়ালে নীল ওয়াল-পেপার, আলাদা ফার্নিচার, টেলিভিশন, স্টিরিও। নতুন বাবা হবার উৎসাহে সুকুমার বিশ্বাস প্রায়ই নানা খেলনা কিনে আনতেন। আমাকে শিখিয়েছিলেন তাঁকে ড্যাড্ বলে ডাকতে। মার কথা অনুযায়ী প্রথম প্রথম যখন তাঁকে 'বাবা' বলে ডাকতে চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছিলাম না, 'ড্যাড্' বলতে পেরে সেই অস্বস্তি কেটে গিয়েছিল। দামী দামী জামাকাপড়, জোড়া জোড়া জুতো, নতুন বই, রঙের বাক্স, পেন, ঘড়ি, ছোট্ট ক্যামেরা—নিজের সম্পত্তি সারাদিন নেড়েচেড়ে দেখতাম। তখন গরমের ছুটি। ড্যাড্ সাঁতারের ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন। জলে আমি ভয় পেতাম না। গোরখপুরের শহরে মাসীর ছেলেদের সঙ্গে কত সাঁতার কেটেছি। বেনারসের গঙ্গায় দিদিমার সঙ্গে কতবার নেমেছি।

সেদিনের সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আমার জীবনে প্রায় স্বর্গের স্বাদ এনে দিতে পারত। কিন্তু কোথায় যেন কি অভাববোধ কাঁটার মত অহরহ জানিয়ে দিত তার উপস্থিতি। আমার শৈশব তার মালিন্যের জরাজীর্ণ ছাপ নিয়ে একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সেই অস্তিত্ব হারানোর যন্ত্রণা কি ঐ বয়সেই অনুভব করতাম? আমি গোরখপুরের রেলকলোনীর শ্যামলকান্তি ভট্টাচার্য রচেস্টারে এসে 'স্যাম্ বিসোয়াস্' হয়ে গেলাম। কখনো দুঃসহ গরমে, কখনো দারুণ শীতে মাটিতে পাতা বিছানায় মার বুকের আশ্রয়ে আমার অসংখ্য রাত কেটে গেছে। অথচ প্রাচুর্যের সময়ে এয়ারকন্ডিশনড ঘরে নরম ম্যাট্রেসের ওপর আকাশ নীল চাদরে শুয়ে প্রথম রাতে আমার চোখে ঘুম আসতো না। কখনো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে হঠাৎ মনে হোতো আমার কোথাও কেউ নেই। বড় ইচ্ছে হোতো মার কাছে ছুটে যাই। কিন্তু জানতাম সুকুমার বিশ্বাস বিরক্ত হবেন। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে উঠে গেছি। বারবার দরজা ঠেলার পর হালকা সবুজ রং-এর নাইটি প'রে, গায়ে নতুন পাউডারের গন্ধ মেখে, ছোট ছোট খোলা চুলে ঘুম চোখে যে বেরিয়ে আসতো—তাকে আমি আমার দুঃখী মা বলে চিনতে পারতাম না। আমি কি 'খুব' স্বার্থপর ছিলাম। ছোটবেলা থেকে মাকে অভাব অনটনের মধ্যে থাকতে দেখে সেটাই কি আমার কাছে মাতৃত্বের স্বাভাবিক রূপ বলে মনে হোতো? নইলে কেন মার সাজগোজ, সুখী রাজ-কন্যার মত মুখখানা দেখে বারবার মনে হোতো—আমার জন্যে নয়, মা নিজের সুখের জন্যে এ জীবন বেছে নিয়েছে।

এদেশের স্কুলে আমার প্রথম দিকে বেশ অসুবিধে হতো। ইংরিজী কতটুকুই বা জানতাম? অঙ্কটা বরং সহজ লাগতো। পড়াশোনায় আগ্রহ ছিল। খুব চেষ্টা করতাম যাতে অল্প সময়ের মধ্যে ক্লাসে অভ্যস্ত হোয়ে যেতে পারি। সুকুমার বিশ্বাস বাড়িতে পড়াতেন। তাও দশবছর বয়সে ফোর্থ গ্রেডে ভর্তি হলাম। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আমার চেয়ে বয়সে একটু ছোট ছিল।

তবে ওদের যা বড়সড় চেহারা, আমাকে সে তুলনায় ছোটখাটোই দেখাতো। ভয় ছিল, সব বিষয়ে ওদের কাছে দুর্বল প্রমাণিত হবো। কিন্তু ধীরে ধীরে বেশ মানিয়ে নিলাম। খেলার সময় আমার লাফ, ঝাঁপ, দৌড়োদৌড়ি, তরতর করে মাংকিবার বেয়ে ওঠা, জিমন্যাস্টিক ক্লাসে শক্ত শক্ত ডিগবাজী খাওয়া দেখে স্কুলের অনেকেই আমাকে বন্ধু করে ফেললো।

স্কুলজীবনে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হোলেও সামাজিক জীবনে কিন্তু অন্যরকম ব্যবহার পেলাম। বাঙালী ছেলেমেয়েরা সহজে আমাকে আমল দিতো না। তখন আমি বেশীরভাগ বাংলায়, নয়তো ভুলভাল ইংরিজীতে কথা বলতাম। উচ্চারণগুলো ঠিক ওদের মতো হোতো না। পার্টিতে গিয়ে খুব বেশী খেয়ে ফেলতাম। ওরা অনেকে ভাত খায় না। ওদের মধ্যে বেশীরভাগ বাড়িতে স্প্যাগেটি, পীত্‌জা, নয়তো ফ্রায়েড চীকেন, স্যালাড রাখা থাকতো। আমি তো সে সব আগে খেতে শিখিনি। আড়চোখে দেখেছি দূরে বড় বড় বাসনে পোলাও, মাংস, চিংড়িমাছ, চপ সাজানো আছে। মা লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলতো—"শামু আমাদের মতো সবকিছু খেয়ে নেয়।" আমি নিজে হাতে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে অনেকটা পোলাও, গাদাখানেক মাংস, দুটো অন্তত মাছ, বাটি ভর্তি দৈ, মিষ্টি নিয়ে ওদের মাঝখানে খেতে বসে যেতাম। ওরা দৈ, মিষ্টি, পায়েস চেখেও দেখে না। দেশে থাকতে এ সব আমাদের কাছে বড়োলোকের জিনিস ছিল। বড়মাসীর বাড়িতে মাসে একবার মাংস আসতো। আর এখানকার ছেলেমেয়েগুলো এরকম করে কেন ভেবেই পেতাম না। ওরা চিকেন খায়, হাড়ের গায়ে কত মাংস লেগে থাকে। ফেলে দেয়, আবার একটা নিয়ে সেরকম নষ্ট করে। আমার একমনে চিকেন খেয়ে সাদা করে ফেলা। তারপর কুড়মুড় করে হাড় চিবিয়ে রস খাওয়া দেখে পলা নামে একটা অহংকারী মেয়ে হেসে উঠে বলেছিল—"ও মাই গড্! লুক্ অ্যাট দ্যাট্ মনস্টার!"

বাড়িতেও হাত দিয়ে ভাত চটকে না খেলে স্বাদ পেতাম না। আঙুলে ফাঁক দিয়ে ঝোলমাখা ভাত অনবরত চটকে চটকে বার করছি দেখে সুকুমার বিশ্বাস ভীষণ ধমক দিয়েছিলেন। মা আড়ালে ডেকে বলতো—"শামু, একটু স্মার্ট হেতে শেখ্। উনি তো তোর ভালোর জন্যেই বকেন।"

ভালোর জন্যে একে একে কত কিছুই তো ছেড়ে দিলাম। নিজের দাদুর দেওয়া নাম, মার কাছে শোওয়া, নতুন নতুন বাংলা গল্পের বই জোগাড় করে পড়া, হাত দিয়ে খাওয়া, চিনি দেওয়া গরম দুধ খেতে চেয়ে তার বদলে রোজ সাত সকালে ঠাণ্ডা দাঁত কন্‌কনে টক অরেঞ্জজুস্ খাওয়া—এমন কত কি?

গোরখপুর, বেনারসের দিনগুলো কবে যেন স্মৃতিতে অস্পষ্ট হোয়ে এল। দিদিমা মারা যাওয়ার পর আমরা একবার গোরখপুর যাবো কথা হোয়েছিল। কিন্তু মা নিজেই আর সেখানে যেতে চাইতো না। বড়মাসী মাঝে লিখেছিল—

আমার বাবা নাকি তাদের শাসিয়ে গেছে, আমার খবর না পেয়ে পুলিশ নিয়ে আসবে। ছেলে নিয়ে পালিয়ে গেছে বলে মার নামে কোর্টে নালিশ করবে। ঝামেলার জন্যেই মা গোরখপুরে যেতে ভয় পেতো। তাছাড়া সুকুমার বিশ্বাসকে খুশী রাখতে মা সর্বদা ব্যস্ত তখন। তিনি চাইলেন বলে মা অত সুন্দর লম্বা চুল কেটে ফেললো। বেনারসের বুড়ীদের মতো সেই হেয়ারকাট দেখলে মাসীরা নিশ্চয়ই হাসাহাসি করতো।

প্রথম আসার পর মার অন্যধরনের সাজগোজ, রোজ রোজ লিপস্টিক মাখা আমার একদম পছন্দ হতো না। কিন্তু যত বড় হতে লাগলাম এদেশের মহিলাদের দেখে দেখে মার সাজগোজ আর আমার চোখে অস্বাভাবিক লাগতো না। মাকে বিচার করতে গিয়ে ক্রমশ আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে লাগলো। সামারে সমুদ্রের ধারে মা যখন সুইমিং কসটিউম্ পরে ড্যাডের হাত ধরে ঢেউ-এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো আবার পরমুহূর্তে ভেসে উঠতো—সে সময় আমার সারা দেহে মনে একটা তিরতিরে সুখের অনুভূতি ছড়িয়ে যেত। মনে হোতো, আহা! সেই দুঃখী মানুষটা, ধুলোমাখা চটি পরা, গরীব অসহায় চেহারার আমার সেই মা আজ জীবনের যাবতীয় শখ সাধ তিলতিল করে মিটিয়ে নিচ্ছে। বালির চড়ায় বসে দুপুরের ঝলমলে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি এই মহাদেশ, এই প্রাচুর্য আর সুকুমার বিশ্বাসের মহানুভবতার প্রতি কৃতজ্ঞ হোয়ে উঠতাম।

তারপর কত বছর চলে গেছে। মিশেল বিয়ে করে মিশিগানে থাকে। বছরে অন্তত একবার দেখা হয়। ফোন করে মাঝে মাঝে। আমার জন্মদিনে আর ক্রিসমাসে উপহার পাঠাতে ওর কখনো ভুল হয় না। মা ওকে প্রথম থেকে সমীহ করতো। আজও সে দূরত্ব থেকে গেছে। ড্যাড্ ইদানীং বড্ড কুঁড়ে হয়ে গেছেন। আর কয়েকবছরের মধ্যে রিটায়ার করবেন। ছুটির দিনে বসে বসে বীয়ার খাওয়া, টেলিভিশন দেখা আর রাজ্যের খবরের কাগজ পড়া ছাড়া কোনো কিছুতেই ওঁর আগ্রহ নেই। মা তো ওঁর চেয়ে অনেক ছোট। মার এখনও কত উৎসাহ, প্রাণস্ফূর্তি অবশিষ্ট রয়ে গেছে। নইলে এই সেদিনও অ্যামিউজ্‌মেণ্ট পার্কে গিয়ে আমার সঙ্গে রোলারকোস্টারে চড়ে আসে? এতকাল মাকে অনেক সঙ্গ দিয়েছি। অগাস্টের শেষে ওহায়োতে "কেস্ ওয়েস্টার্ন রিজার্ভে" পড়তে চলে যাবো। তখন মা খুব একা হয়ে যাবে। গত আট বছরে আমার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে নিশ্চয়ই। শিক্ষা, সাজ-পোশাক, চালচলন সব কিছুতেই আমেরিকার ছাপ পড়েছে। কিন্তু মা আর আমি মনে মনে আজও অনেকখানি বাঙালী রয়ে গেছি। মার সঙ্গে বাংলায় কথা বলি। সময় পেলে বাংলা বই উল্টে পাল্টে দেখি। বাংলা গান শুনি। আমি জানি, আমি দূরে চলে গেলে ড্যাডের দেওয়া আশ্রয় আর নিরাপত্তার মধ্যে থেকেও শান্তির অভাব মা প্রতিদিন অনুভব করবে।

আজ গ্র্যাজুয়েশনের আনন্দ উত্তেজনায় সারাদিন কোথা দিয়ে কেটে

গেল। হাইস্কুলের ডিপ্লোমা নেবার সময় গাউন আর হুড্ পরে আমরা যখন একে একে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, দূরের গ্যালারিতে বসে মা একদৃষ্টে আমাকে লক্ষ্য করছিল। ড্যাড্ চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে একমনে বসেছিলেন। হঠাৎ হঠাৎ আমাকে হাত নেড়ে উঠছিলেন!

ইটালীয়ান রেস্টুরেণ্টে গ্র্যাজুয়েশন ডিনার খাওয়ার পর আমরা বন্ধুরা মিলে মাইকের বাড়ি গেলাম। ড্যাড মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। মা জানতো ফিরতে আমার রাত হবে। মাইকের বাড়িতে নাচ, গান, হৈ, হুল্লোড় চললো অনেকক্ষণ। ওরা ভোরবেলা দল বেঁধে অ্যাটলাণ্টিক সিটি যাবে ঠিক করলো। আমার যাওয়া হবে না। কারণ উইকএণ্ডে আমার জন্যে বাড়িতে গ্র্যাজুয়েশন পার্টি দিচ্ছে ড্যাড্ আর মা। এই কদিন কাজকর্মে একটু সাহায্য করতে হবে। আজকাল ড্যাড একদম কাজ করতে চান না। মার কাছে ধমক খান বেশ।

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হলো। বাইরে দেখলাম মায়েদের বেডরুম অন্ধকার। নীচের ফ্যামিলিরুমে আলো জ্বলছে। বোধহয় আমি ফিরবো বলে জ্বালিয়ে রাখা আছে। গাড়ি গ্যারাজে রেখে বাড়ির চাবি বের করার আগেই দরজা খুলে গেল। দেখলাম মা দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঙ্গারে জ্যাকেট রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি শোওনি কেন মা? জানতে তো আমার দেরী হবে।"

মা সোফায় বসতে বসতে বললো, "আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না রে।"

আমি পাশে বসে বললাম, "আজ সবাই কি একসাইটেড মা! পুরো গ্রুপটা অ্যাটলাণ্টিক সিটি যাচ্ছে।"

মা ধীরে ধীরে বললো—"হাস্ইকুল গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলি শামু! খুব আনন্দ হচ্ছে না রে?" মাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে হেসে বললাম, "তোমার কেমন লাগছে মা? হাউ ডু ইউ ফীল্ ?"

হঠাৎ মার চোখ দুটো জলে ভরে গেল। আমার কাঁধের পাশে মুখ রেখে ছোট্ট মেয়ের যত কান্না চাপার চেষ্টা করলো। একসময় ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, "চল্ এবার একবার গোরখপুর যাই শামু।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "হঠাৎ? এত বছর বাদে?"

মা বললো, "তোকে নিয়ে একবার গোরখনাথের মন্দিরে যেতে ইচ্ছে করে।"

বহুবছর পরে মনে পড়লো গোরখনাথ চুঙ্গীর কাছে বিশাল বাগানে ঘেরা সেই মন্দির। গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীরা মন্ত্র পড়ে পড়ে মন্দির ঘিরে ঘুরছে। ঝিলের স্বচ্ছ জলে পিপুল গাছের ছায়া। তবু সবই তো সুখের স্মৃতি নয়। মাকে বলে ফেললাম, "কিন্তু কেউ যদি আমাকে ফিরে আসতে দিতে না চায়? যদি ফেরত চায় আমাকে?"

মা থমকে গিয়ে বললো—"কে? কে নেবে তোকে?"

—"কেন, আমার নিজের বাবা? তাকে বুঝি ভয় নেই তোমার?" আমি

হয়ত ঠাট্টাই করেছিলাম। মা কেমন যেন উদাসীন চোখে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেবার সময় মার অস্ফুট স্বর শুনলাম, "শুনেছি তোর বাবা আর বেঁচে নেই।"

আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। ঠিক মনে হলো কেউ বলছে সুকুমার বিশ্বাস আর বেঁচে নেই। কি আশ্চর্য! বাবা বলতে মনে মনে তবে কি তাঁকেই বুঝি? কিন্তু কবে? কখন থেকে? নিজের জন্মদাতাকে তো কোনোদিন জানলাম না। যিনি প্রতিপালন করলেন, তাঁকেও যে মনে মনে বাবা বলে মেনে নিতে পেরেছিলাম, তাও তো নয়। প্রথম দিকে তো ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট আক্রোশ ছিল। মনে হতো—'মোটা বুড়োটা' মাকে কেড়ে নিয়েছে। তবু মার তাগিদে ফাদার্স ডে'-তে কার্ড দিয়েছি। উপহার দিয়েছি। তখনও জানতাম, মার জন্যে তাকে খুশি করছি। আমাদের প্রতিপালনের ঋণ শোধ করছি। আমার বয়ঃসন্ধিক্ষণে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ হতো। মনে হতো আমাকে মানুষ করার অজুহাত দেখিয়ে দুটো মানুষ নির্লজ্জের মত পরস্পরকে উপভোগ করছে। মার মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না।

তারপর একসময় সেই ক্ষোভ, অভিমান, আক্রোশ থিতিয়ে গেছে। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেছি মানুষটির মধ্যে ঔদার্য আছে, স্নেহ আছে, আমার জন্যে প্রশ্রয় আছে। তখন সেই অনুভবের মধ্যে কৃতজ্ঞতা মিশেছিল, হয়ত শ্রদ্ধাও ছিল। কিন্তু তার নাম কি ভালোবাসা? তুমি সুকুমার বিশ্বাস, আমাকে স্নেহ ভালোবাসা কতটুকু দিতে পেরেছো, কিসের আশায় দিয়েছো, কার প্রতি তোমার আকর্ষণ ছিল—এই সব সংশয় সন্দেহ নিয়ে আমি যে তোমাকে বারবার বিচার করতে চেয়েছি। আশ্রয় দিয়েছো, বেঁচে থাকার সংস্থান দিয়েছো—শুধু এইজন্যে কতবার ভেবেছি কৃতজ্ঞতা ছাড়া আমার কাছে আর তোমার কিছু পাওনা নেই। কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের কাছে এর বেশি আশা করতেও নেই। কিন্তু আমার ভাবনাগুলো আজ রাতে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন? গ্র্যাজুয়েশনের পর তুমি যখন আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলেছিলে, "কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্ মাই বয়! আই অ্যাম্ প্রাউড অফ্ ইউ"! তখনও কি আমি বুঝেছি কবে তুমি আমার জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছো? "তোর বাবা বেঁচে নেই"—এই কথাটা না শুনলে এত বড় সত্যি কথা আমি কেমন করে জানতে পারতাম?

রাত শেষ হয়ে আসছে। পাশের ঘর থেকে ড্যাডের নাক ডাকার ভীষণ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। খালি গায়ে হাঁটু পর্যন্ত পায়জামা পরে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। নাঃ, আর কোনোদিন তাঁকে মার কাছে "সুকুমার বিসোয়াস্" বলবো না আমি। বাইরে ড্যাড্-ই বলবো। আর মনে মনে যে কি বলে ডাকবো সেটাও আজ জেনে গিয়েছি। সেই সম্পর্ক, সেই ডাক গ্র্যাজুয়েশনের দিনে আমার নিজস্ব আবিষ্কার!

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে থাকতে থাকতে নিনা বুঝতে পারল ইউ এস এয়ারের ফ্লাইট এসে পৌঁছেছে। একের পর এক যাত্রীরা বেরিয়ে আসছে। নিনা একটু কৌতূহল নিয়ে ভাবছে, ওদের নতুন ঠাকুমাকে কেমন দেখতে হতে পারে। বাবার এই পিসিমাকে ও কখনো দেখেনি। উনি সবেমাত্র কলকাতা থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছে আবার অন্য ফ্লাইট নিয়ে ওদের শহরে বেড়াতে আসছেন। নিউইয়র্কে বাবার বন্ধু ওঁকে এই ফ্লাইটে উঠিয়ে দিয়েছেন। এখানে কয়েকদিন থেকে ওঁর মেয়ের কাছে শিকাগো চলে যাবেন।

নিনা দেখতে পেল একজন ফর্সা, রোগামত বয়স্কা মহিলা এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে আসছেন। চোখে, মুখে একটু ভয় ভয় ভাব। বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'এই তো মনুপিসি এসে গেছেন।'

ওঁর ভয় ভয় ভাবটা কেটে গিয়ে, এক মুখ হাসি ফুটল—"বাবাঃ, আছিস তাহলে ? প্লেনটা ছাড়তে যা দেরি করল, ভাবছিলাম বেরিয়ে যদি তোদের দেখতে না পাই।"

ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যেই এধার-ওধার তাকিয়ে মা চট করে ওঁকে প্রণাম করে নিয়েছেন। নিনা আর ওর বার বছরের ভাই ববিকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নতুন ঠাকুমা চিৎকার করে বললেন, "হ্যাঁরে হাঁদু, এই বুঝি তোর ছেলেমেয়ে ?"

বাবা হেসে ফেললেন। বাবার এই হাঁদু নাম আমেরিকায় কেউ জানে কিনা সন্দেহ। নিনা, ববিকে কাছে ডেকে নতুন ঠাকুমা ওদের গালে চুক চুক করে চুমু খেলেন। ওঁর মুখে কেমন একটা অস্পষ্ট মিষ্টি গন্ধ, দেশের বুড়ো মানুষদের পান, মশলা খাওয়া মুখের গন্ধের মত। ববি একফাঁকে হাতের পাশ দিয়ে চুমু খাওয়া ভিজে গালটা মুছে নিল।

লাগেজ নেবার জন্যে খানিকক্ষণ সময় গেল। যতবার সুটকেশগুলো ঘুরে ঘুরে আসে, নতুন ঠাকুমা হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন—'ওইটা, ওইটা, তুলে নে হাঁদু।'

বাবা নিতে গিয়ে অপ্রস্তুত। একজন আমেরিকান প্যাসেঞ্জার তুলে নিল, সেটা তারই সুটকেশ। এত নীল, গোলাপী, খয়েরী সুটকেশের ভিড়ে নতুন ঠাকুমা নিজের সুটকেশ গুলিয়ে ফেলেছেন। শেষ পর্যন্ত সুটকেশ পাওয়া গেল। নিনার কাছে এসে ববি ওঁর সুটকেশের গায়ে বড় বড় করে লেখা নামটা দেখাল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, 'ক্যাটায়ানী ডেভী।'

গাড়িতে ওঠার সময় মা ওঁকে সামনের সিটে বসালেন। নিনা ভাবছিল—

মার আজ কি হল ? ছোটবেলায় কত ইচ্ছে হত, বাবার পাশে সামনের সিটে বসে। কিন্তু মা কিছুতেই ওদের বসতে দিতেন না। ববিকে পেছনে কারসিটে বসিয়ে, নিনাকে তার পাশে বসিয়ে দিতেন। ওরা সামনে বসলে নাকি অ্যাক্সিডেণ্টে মরে যেতে পারে, আসলে নিজে বাবার পাশে বসবেন বলে এইসব বলতেন। আজ ওঁদের পিসিমার বেলায় বুঝি অ্যাক্সিডেণ্টের ভয় নেই ? বাবা পিসিমার সিট্‌বেলট বেঁধে দিলেন। নিউইয়র্কে নিয়ম করে দিয়েছে, সামনের সিটে বসলে সিট্‌বেলট বাঁধতেই হবে। উনি দেখে শুনে বললেন, "একেবারে প্লেনের মতই ব্যবস্থা, অ্যাঁ ?"

হাইওয়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চলছে। বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলোয় দূরে নদীর জল লাল দেখাচ্ছে। নিনার ধারণা এসব পথঘাট নিশ্চয়ই ওঁর কাছে নতুন মনে হচ্ছে। বাবা বারকতক দেখাবার চেষ্টা করলেন—"ওই দেখ, কতবড় ব্রিজ আসছে, নিচে পটোম্যাক নদী।"

কিন্তু নতুন ঠাকুমার ওসব দিকে একটুও মন নেই। অনবরত পেছন ফিরে ফিরে মার সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করছেন। সিটবেলট থাকায় ইচ্ছেমত ঘুরতে পারছেন না। বলছেন, এ এক বিষগেরো হল তো ?

বাবা হাসছেন। বলছেন, সব গল্প বাড়ি গিয়ে হবে। এখন ঠিক করে বস তো।

ওদের বাড়িটা বাইরে থেকে দেখে নতুন ঠাকুমার কি হাসি ! বললেন, "ওমা এ যে খেলাঘর। ছবিটবি দেখে ভাবতাম, না জানি কোন প্রাসাদে থাকিস তোরা।"

মা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "কেন পিসিমা, বাড়ি কি খুব ছোট ?"

পিসিমা বুঝতে পেরে সামলে নিয়েছেন—"না গো, ছোট বলিনি তো। মানে, সবই আছে, অথচ কেমন যেন ছবির মত। নিচু নিচু ছাদ। বাইরে বড় বড় ঝোলা বারান্দা নেই। ছাদের মাথাটাও ছুঁচলো মত, ওঠা যায় না, নারে হাঁদু ?"

বাবা পরিবেশ হালকা করার চেষ্টায় ওঁকে আবছা অন্ধকারের মধ্যেই বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন।

নিনা, ববি দুজনেই অবাক হয়ে গেছে। এখানে তো কেউ বাড়িতে এলেই তাঁকে ঘুরে ঘুরে সারা বাড়ি দেখান হয়। বাথরুম, ক্লোসেটগুলো পর্যন্ত খুলে খুলে তাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখানো হয়—কত জায়গা সেখানে। তখন তিনি বলেন—'ফ্যাণ্টাস্টিক ! বি-উ-টি ফুল।' আর ইণ্ডিয়া থেকে যাঁরা আসেন, তাঁরা তো আরো মুগ্ধ হয়ে বলেন—'সত্যি ! কি ব্যবস্থা ! কি আইডিয়া !' আর ইনি কিনা এত বড় কলোনিয়াল বাড়িটাকে বলছেন ছোট। বাবা অবশ্য বলেছিলেন, নতুন ঠাকুমা নাকি পাকিস্তানের (এখন যার নাম বাংলাদেশ) কোন্ ল্যাণ্ডলর্ডের মেয়ে ছিলেন। বোধহয় তাঁদের বাড়িটা তাহলে আরো বড় ছিল।

বাগান থেকে ফিরে এসে উনি চা খেতে চাইলেন। অনেক অনেক চিনি মিশিয়ে চা খেলেন পর পর দু কাপ। তারপর সুটকেশ খোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মা ওঁকে এখনই এসব খোলাখুলি করতে বারণ করছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে বাবাকে দিয়ে তালা চাবি খুলিয়ে অনেক কিছু বার করে ফেলেছেন। মাকে দিলেন আমসত্ত্ব, ডালমুট, দেশের চা। বাবার জন্যে পাঞ্জাবি, নিনার জন্যে সুন্দর একজোড়া রুপোর বালা। ববির জন্যে কিছু আনতে পারেননি। ও কতবড় হয়েছে, তা তো জানতেন না। ওঁর ছেলে নাকি বলে দিয়েছে, এদেশ থেকে ডলার ভাঙিয়ে ববিকে কিছু কিনে দিতে। কলকাতার এয়ারপোর্ট থেকে ছেলের কিনে দেওয়া ডলারগুলো উল্টে পাল্টে দেখে বাবুকে বললেন, "এতে হবে তো রে?" বাবা হেসে সেগুলো ওঁর সুটকেশে আবার ভরে দিতে দিতে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক কিছু হবে।"

সন্ধেবেলাটা গল্পে গল্পে কেটে গেল। রাতে খাবার সময় পর্যন্ত নতুন ঠাকুমা আর জেগে থাকতে পারলেন না। মা ওঁকে উঠিয়ে খাওয়াবার অনেক চেষ্টা করলেন। ছোট মেয়ের মত হাত নেড়ে না না করে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাবা বললেন, "মনুপিসির জেটল্যাগ চলছে। ঘুমোতে দাও।"

পরদিন সোমবার। সকালে উঠে নিনা, ববি স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। বাবা অফিসে যাবার তোড়জোড় করছেন। এই ব্যস্ততার মাঝখানে নতুন ঠাকুমা ভোর থেকে উঠে সমানে কথা বলে যাচ্ছেন। বাবাকে ডেকে ডেকে বলছেন—"বুঝলি হাঁদু, এত আরামেও ঘুম হল না। শেষ রাত থেকে জেগে বসে আছি। অথচ উঠে যে চান করব, জপ করব, সেও পারছি না। তোদের বাথরুমের ঠাণ্ডা, গরম জলের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো না বুঝে কি করে চান করি বল? ও কি? তুই শুধু কমলার রস খেয়ে কোথায় চললি? ও বউমা, হাঁদুকে জলখাবার দিলে না?"

মা নিনার টোস্টে জ্যাম মাখাতে মাখাতে বললেন, "সকালে উনি কিছু খেতে চান না।"

ববিটা এমন অসভ্য, হঠাৎ মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। মাকে বলল, "হু ইজ দ্যাট 'উনি' মাম্? ইয়োর সৌরীন, আই মিন্ আওয়ার ড্যাড্?"

মা রাগে গরগর করতে করতে ওদের লাঞ্চ গোছাতে লাগলেন। নতুন ঠাকুমা বললেন, "অ্যাই! বাংলা বল্ না।"

সেদিন স্কুলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে নতুন ঠাকুমার কথা ভাবছিল নিনা। ওর নিজের ঠাকুমা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। দিদিমা আছেন, কিন্তু দাদু অসুস্থ বলে ওঁরা কখনো আমেরিকায় আসতে চান না। এরকম একজন মানুষের সঙ্গে ও আগে এদেশে কখনো থাকেনি। উনি একটু অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন বটে, কিন্তু মনে হয় বাবাকে খুব ভালবাসেন। ঘুরে ফিরে কেবলই হাঁদু আর হাঁদু।

বিকেলে ওরা বাড়ি এসে শুনল নতুন ঠাকুমা তখনো ঘুমোচ্ছেন। খেলতে যাবার সময় দেখল, মা ওঁর জন্যে ইণ্ডিয়ার চা তৈরি করছেন। এবার বোধহয় ওঁকে ডেকে তুলবেন।

আজ সন্ধেবেলা উনি বেশ ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছেন সারা বাড়ি। রাতে বিশেষ কিছু খাবেন না। ইণ্ডিয়ার নিয়মমত মা ওঁকে দুপুরেই ভাত খেতে দিয়েছেন। যাঁদের বর মারা গেছেন, তাঁদের এরকম নিয়ম মানতে হয়—নিনা ইণ্ডিয়ায় গিয়ে সেটা লক্ষ্য করেছে! এই যে নতুন ঠাকুমার চৌকো করে পরা সাদা কাপড়, মুখে কোন মেকাপ নেই—এসবই নাকি ওঁর বর মারা গেছেন বলে। উনি মাছ, মাংস, ডিম কিছুই খেতে পারেন না। উনি যে কদিন এ বাড়িতে থাকবেন, বীফ, পর্ক আনা হবে না—মা বলে দিয়েছেন ওদের।

ববি সব শুনে মাকে বলেছিল, "ওঁর বর মারা গেছেন বলে কি ওঁর পানিশমেণ্ট দেওয়া হয়েছে? কি স্ট্রেঞ্জ কাস্টম!"

এ নিয়ে সেদিন অনেক আলোচনা হয়েছিল বাবা-মার সঙ্গে।

আজ ওদের খাবার টেবিলের একধারে আলাদা একটি চেয়ারে নতুন ঠাকুমা বসেছেন। ওরা দুপুরে স্কুলে লাঞ্চ করে। রাতে বাড়ির খাবার খায়। ওদের অল্প খাওয়া দেখে নতুন ঠাকুমা অবাক। ওরা ডাল, তরকারি বিশেষ খায় না। খেলেও শুধু খায়। ভাত আলাদা খায়। মাংস আর স্যালাডই বেশি পছন্দ করে। নতুন ঠাকুমা বাবাকে বললেন, "তোরও ভাত খাওয়া বড্ড কমে গেছে হাঁদু। হ্যাঁরে, এগুলো সত্যি মুরগি তো, না শুয়োর-টুয়োর খাচ্ছিস? তাহলে কিন্তু আমি এ বাড়িতে ভাত খাব না।"

ববির গলায় কাশির খক খক আওয়াজ। নিনা একমনে জল খেয়ে যেতে লাগল।

মা বললেন, "না না, ওসব কেন হবে? ওইতো মুরগির পা, দেখছেন না?"

নতুন ঠাকুমা বললেন, "কে জানে বাবা! সবই কেমন গোদা গোদা। মুরগির পা তো নয়, যেন সালোয়ারপরা কাবলীওলার পা।"

রাতে নতুন ঠাকুমাকে ওরা একটু দোকান বাজার দেখাতে নিয়ে গেল। উনি পরশু চলে যাবেন। এখানে দেখবার মত যা আছে, তা ওঁর দেখার বেশি সময় নেই, শরীরও ক্লান্ত রয়েছে। তাই মোটামুটি একটু নিয়ে বেড়ান হচ্ছে।

ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের সাজান শো-কেস, আলোর মেলা, অজস্র লোকজন, অঢেল জিনিসপত্র দেখতে দেখতে উনি চলেছেন। কখনো এধার ওধার দাঁড়িয়ে পড়ছেন। একটি মডেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলেন, "ওমা, সাঁওতাল-পানা নিগ্রো মেয়েটারও স্ট্যাচু বানিয়েছে দ্যাখ্।"

মা বললেন, "পিসিমা আন্তে।"

উনি হার মানার পাত্রী নন। বললেন, "বাঃ, এখানে আবার কে বাংলা বুঝবে?"

মা হেসে ফেললেন। এসকেলেটরে ওঠার মুখে ভীষণ নার্ভাস ভাব। খালি

বলছেন—"আমি পড়ে যাব বউমা।"

নিনা আর বাবি ওঁর দু হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, নিজেরাও সঙ্গে ওপরে উঠতে লাগল। ওপরে পৌঁছে এক পা বাড়িয়ে দিতে হবে বলায়, মাঝপথ থেকে অনবরত ডান পা উঁচু করছেন। বাবি হেসে উঠছে, নিনার মজা লাগছে। দুই ভাই বোনে ওঁকে ধরে নিয়ে চলেছে বিরাট দোকানের এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোরে।

হঠাৎ ওঁর মনে পড়ল বাবিকে কিছু কিনে দিতে হবে। "—অ্যাই, কি নিবি তুই ? কি তোর পছন্দ বল না ?"

মা বললেন, "থাক না পিসিমা, পরে হবে।"

উনি কখনো একটা বিরাট রঙ-চঙে সোয়েটার দেখাচ্ছেন, কখনো আন্দাজে একটা প্যাণ্ট দেখিয়ে বলছেন, "প্যাণ্ট কিনবি ? কেন্ না ?"

নিনার হাসি পাচ্ছে ভীষণ। বাবি জামা-কাপড়ের ব্যাপারে বড্ড খুঁতখুঁতে। বিশেষ কোম্পানির ডিজাইনার জীন্স ছাড়া পরে না। ওকে কিনা এইসব কিনে দেবার চেষ্টা করছেন উনি। একটু মায়াও হল। আহা, উনি তো আনন্দ করেই দিতে চাইছেন। বাবি শেষ পর্যন্ত একটা টি শার্ট কিনল। বুকে বড় বড় করে লেখা একটি কোম্পানির নাম Adi das। ওঁকে বুঝিয়ে বলল—"বুকে আদিদাস লেখা আছে।"

নতুন ঠাকুমা খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন—"হরেকৃষ্ণদের গেঞ্জি বুঝি ? ওরা সাহেবরা নাকি সব দাস হয়ে গেছে, কে যেন বলছিল।

এরপর সুপার মার্কেটে যাওয়া হল। শপিং কার্ড নিয়ে সবাই ঘুরে ঘুরে বাজার করছে। ইচ্ছেমত জিনিস তুলছে, রাখছে। নতুন ঠাকুমা সবকিছু দেখতে দেখতে চলেছেন। বাবা বললেন, "এই এক একটা ঠেলাগাড়িতে রয়েছে এদের এক সপ্তাহের মত বাজার।"

তার আগে নতুন ঠাকুমা ভেবেছিলেন, এসব আমেরিকানদের একদিনের বাজার। তখন তাদের পেটুক না কি যেন বলছিলেন ফিসফিস করে। এক সপ্তাহের বাজার শুনে একটু লক্ষ্য করে বললেন, "এ আর এমন কি ? আমাদের সাতটা বড় থলের বাজার ঢাললে এর বেশিই হবে।"

নিনাদের আজ বাজার করার তেমন দরকার ছিল না। মা তাও কিছু কেনাকাটি করলেন। ফল, দই, দুধ, সিরিয়াল—এইসব জিনিস কেনা হল। নিনার চিকেন ফ্র্যাংক নেবার ইচ্ছে ছিল। মা বারণ করলেন। হয়ত এক পেপার ব্যাগে সবকিছু দিলে, উনি খেতে চাইবেন না।

ডেয়ারী সেকশনে গিয়ে একের পর এক ফ্রীজার ভর্তি থরে থরে সাজান দুধ, দই, চীজ, মাখন দেখতে দেখতে উনি কেমন অন্যমনস্কের মত বললেন, "কত দুধ দই। আহা! এদের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ভাল হবে না। আর আমাদের—"

পরে মুখখানা বিষণ্ণ করে গাড়িতে উঠলেন।

অনেক রাত অবধি গল্প হল। মাঝখানে নতুন ঠাকুমার মেয়ে শিকাগো থেকে ফোন করলেন। বাবা বললেন, "মনুপিসি, বড্ড কম সময়ের জন্যে এলে। ওদিকে ডলি তো কেবলই প্ল্যান করছে তোমায় নিয়ে কোথায় কোথায় বেড়াবে। তাই আটকাতেও পারছি না বেশিদিন।"

নিনা লক্ষ্য করছিল, নতুন ঠাকুমার যেন অত বেড়ানোর ইচ্ছে নেই। বাবাকে বলছিলেন, "অ্যাতো দূরে এলাম শুধু তোদের দেখার জন্যে। দেশে অনেক ভাল ভাল জায়গা দেখেছি। আর কি দেখব ?"

নিনা বলল, নায়াগ্রা, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, ডিজনীল্যান্ড তো ইণ্ডিয়াতে নেই। ডলিপিসি সেখানেই নিয়ে যাবে তোমাকে। এছাড়া ওয়াশিংটন নিউ-ইয়র্কের মিউজিয়মগুলো তো দেখলেই না।"

উনি বললেন, "মিউজিয়ম দেখতে তোদের দাদু খুব ভালোবাসতেন। সেখানে গিয়ে সব দেওয়ালের ছোট লেখাগুলোও পড়তেন। একটা মর্চেপড়া তরোয়াল দেখতেন একটি ঘণ্টা ধরে। তাও কিই বা দেখেছেন ! বিদেশে বেড়াতে আসার কত ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিছুই তো হল না। সংসারটাকে দাঁড় করাতে করাতেই চলে গেলেন।"

ওঁর দুঃখী দুঃখী মুখখানা দেখে নিনার মন খারাপ লাগছিল। বাবা, মাও কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন।

রাতে নিজের ঘরে খাটে শুয়ে অনেকক্ষণ থেকে নিনা ঘুমের চেষ্টা করছে। হঠাৎ দরজা খুলে আস্তে আস্তে নতুন ঠাকুমা ঘরে ঢুকলেন। খাটের একধারে বসলেন, বললেন, "নিনা, জেগে আছিস ?"

নিনা বলল, "হুঁ। তুমি ঘুমতে যাওনি ?"

উনি বললেন, "যাব। হ্যাঁরে, একলা ঘরে শুতে তোর ভয় করে না ?"

নিনা হাসল—"ভয় করবে কেন ?"

নতুন ঠাকুমা কাছে সরে এলেন—"কেন ভূত-টুত ? তোদের এখানে সাহেব-ভূত নেই ?"

নিনা বলল, "গোস্ট বলে কিছু আছে নাকি ? আমি ওসব বিশ্বাস করি না।" উনি ফিসফিস করে বললেন, "খুব সাহসী তো তুই। আমি তোর বয়সে রাতে একা পায়খানায় যেতে পারতাম না।"

নিনা হেসে ফেলল—"ভূতদের বুঝি ওটাই থাকার জায়গা ?"

উনি বললেন, "তখন তো তাই ভাবতাম ! আচ্ছা, একা ঘরে শুতে একটু গা ছমছমও করে না তোর ?"

হঠাৎ নিনার কেমন সন্দেহ হল। ওঁর হাঁটুতে একটা হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি একা শুতে ইচ্ছে করছে না ?"

নতুন ঠাকুমা সামান্য থমকে গেলেন। তারপরই বললেন, "না রে, একদম ঘুমোতে পারছি না। কলকাতার বাড়ির জন্যে খুব মন কেমন করছে। নাতি, নাতনী, আমার ছেলে, বৌ সকলের জন্যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।"

কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকলেন। ধীরে ধীরে অস্পষ্টসুরে বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, "এদেশে তোদের কত সুখ। কত জামাকাপড়, কত খেলনা, দোকানে বাজারে দুধ, ফল, মাছ, মাংসের ছড়াছড়ি। কেমন ঠাণ্ডা বাড়ি। লোডশেডিং নেই। আর ওরা কত কষ্ট করে...।"

কান্নায় গলা বুজে গেল তাঁর। নিনা স্তব্ধ হয়ে রইল। মনে পড়ল—সুপার মার্কেট থেকে ফিরে অবধি উনি কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। রাতে মা বেশি করে ফল, সন্দেশ, দুধ দিলে সরিয়ে রাখছিলেন থালা থেকে। তখন হয়ত ওঁর দেশের আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে পড়েছিল।

নিনার কারুর সঙ্গে এক বিছানায় শোবার অভ্যেস নেই। আজও জানে, ওর আর ঘুম আসবে না। সারা বাড়ি নিঝুম। বাবা, মা শুয়ে পড়েছেন। ববির ঘরের দরজা বন্ধ। ওরা কেউ জানে না, ওর এই গোলাপী রং-এর ঘরে ঝালর দেওয়া ক্যানোপী বেডে শুয়ে অভিমানী একটি ছোট্ট মেয়ের মত দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছেন নতুন ঠাকুমা। ওঁর নিঃশ্বাসের শব্দ ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে। হয়ত জেগে আছেন, হয়ত বা জেগে নেই। নিনা কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। এ পাড়ায় প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে পেছনের বাগানে সারারাতের জন্যে আলো জ্বলছে। ওর মনে অজস্র ভাবনা ভিড় করে আসছে। নতুন ঠাকুমার এই দুঃখ দুর করার কি কোনো উপায় নেই? ওর চোদ্দ বছর বয়সের অভিজ্ঞতায় ও জানে এক দেশের অফুরন্ত দুধ, ফল, খাবার জিনিস, আরামের উপকরণ, ইলেকট্রিসিটি আর এক দেশে পাঠানর ইচ্ছেটাই একটা অসম্ভব কল্পনার মত শোনাবে। আর তাছাড়া নতুন ঠাকুমাও তো ওদের কাছে কিছু চাননি। এই দুদিনের মধ্যে ইণ্ডিয়ার অবস্থার কথা তুলে একবারের জন্যেও বাবা, মার কাছে কোনো সমালোচনা করেননি। বরং আমেরিকার কোনো কিছু নিয়েই ওঁর অহেতুক উচ্ছ্বাস নেই। হয়ত আজ এই একা ঘরে নিনার কাছে অসতর্ক মুহূর্তে যে আবেগ প্রকাশ করেছে, সেও মনে হয় ছেড়ে আসা নাতি-নাতনিদের জন্যে মন কেমন করছিল বলে। শুধু এইটুকু কথার ওপর নির্ভর করে এখন তাদের জন্যে কিছু কিনে দিতে গেলে ওঁর কি মনে হবে না, নিনা হঠাৎ তাদের অনুকম্পা দেখাচ্ছে।

নিনার মনে হল বড় দেরি হয়ে গেছে। কেন ও আগে ভাবল না? কেন ওর আর ববির জমানো ডলার দিয়ে তাদের জন্যে অনেক চকলেট, জামাকাপড় আর খেলনা কিনে রাখল না আগে থেকেই। যাতে নতুন ঠাকুমাকে প্রথমদিনে বলতে পারত—আমাদের কাজিনদের জন্যে আমরা এইসব গিফট কিনে রেখেছি।

স্কুলবাস থেকে নেমে টুং টাং টুং টাং ক'রে ডোরবেল বাজাতে গিয়ে মণিকার মনে হল দরজা খোলাই আছে। বাড়িতে ঢুকে ধুপধাপ শব্দে ভারী বইএর ব্যাগ, পায়ের বুট, কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ, জ্যাকেট এধার ওধার রাখতে গিয়ে লক্ষ্য করলো ফ্যামিলি রুমের বড় সোফার ওপর অনেক নতুন নতুন প্যাকেট রাখা আছে। উঁকি মেরে দেখলো—কোনোটার মধ্যে বাচ্চাদের কম্বল, কোনোটার মধ্যে স্ট্রেচ সুট, উলের স্ল্যাকস্, সোয়েটার, টুপির সেট, এছাড়া কার্পেটের ওপর বেবী ওয়াকারের নতুন বাক্সে কত কি রয়েছে। মণিকা অবাক হয়ে ভাবলো—এতরকম বাচ্চাদের জিনিস্! হঠাৎ ওর মনের মধ্যে কেমন যেন খুশীর আভাস টের পেল। তবে কি মা এগুলো কোনো বিশেষ কারণে কিনে এনেছেন? যে আসবে ভেবে মণিকা রোজ রোজ অপেক্ষায় থাকে, স্কুলের বন্ধু ক্যাথি, ডিয়ানা, স্টেফানীর ছোট্ট ছোট্ট ভাই-বোনগুলোকে দেখলে ওর বুকের ভেতর যাকে পাবার জন্যে প্রবল ইচ্ছে জাগে, সেরকম কারুর কি সত্যি সত্যি এতদিনে আসার সময় হ'ল? একরাশ উত্তেজনা নিয়ে কিচেনে ঢুকে মাকে জিজ্ঞেস করলো—'হাই মামু, হোয়াই হ্যাভ ইউ বট সো মেনি বেবী স্টাফ?' রুমা ফ্রীজ খুলে কি সব বার করছিলেন। মণিকাকে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসলেন—'এ মাসে যে অনেকগুলো বেবী শাওয়ার, নতুন বেবী দেখতে যাবার ইনভিটেশন আর বার্থ ডে পার্টি আছে। 'গিম্‌বলস্'এ সেল্ ছিল। সব একেবারে কিনে আনলাম।'

মণিকার মনের মধ্যে কে যেন একসারি মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। ম্লান মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে ফ্যামিলি রুমের দরজার কাছে এসে আবার জিনিসগুলো দেখতে লাগলো। রুমা কিচেন থেকে 'ক্যারটকেক' আর 'জেলো' খেতে ডাকছেন। মার ক্যারটকেক খেতে যা ভালো হয়, অন্য দিন হলে বাড়িতে ঢুকে বেকিংএর গন্ধ পেয়েই মণিকা কিচেনে ছুটে যেত। কিন্তু আজ বাচ্চাদের জিনিসগুলো দেখার পর হঠাৎ এক দুরন্ত আশা থেকে নিরাশায় পৌঁছে গিয়ে এ মুহূর্তে ওর কিছুই ভালো লাগছে না। বারবার কেন এরকম হয়? ওর এগারো বছর বয়স হয়ে গেল, অথচ আর কোন ভাই-বোন হ'ল না—এজন্যে বাবা, মা আগে বরং দুঃখ করতেন, কিন্তু এখন যেন ওঁদের কিছুই মনে হয় না। মণিকার কত কষ্ট কেউ বুঝতে পারে না। ওর ছোটবেলার শোবার ক্রীব, কারসীট, স্ট্রোলার, প্লে পেন, হাই চেয়ার, ছোট বাইক, নীল রংএর বিরাট গাড়ি সব কিছু একে একে অন্যদের দিয়ে দিয়েছেন। শুধু একদিন মণিকা জেদ ক'রে ওর ছোট্ট মিকিমাউস আঁকা টয়লেট চেয়ারটা নিজের ঘরের ক্লোসেটে পুতুলের বাক্সের পেছনে ঢুকিয়ে রেখেছিল। যদি কখনো ওর নিজের ছোট ভাই বোন হয়, ওর

জিনিস তো আর কিছুই পাবে না, ও তখন তাকে নিজের 'পটি চেয়ারে' বসিয়ে টয়লেট ট্রেনিং দেবে। ওর ছোটো হয়ে যাওয়া সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় প্রায় সবই মা সুটকেশে ভ'রে ইণ্ডিয়াতে আত্মীয়-স্বজনদের ছেলে-মেয়েদের দিয়ে আসেন। একেবারে বাজেগুলো, আর যত রাজ্যের জুতো, স্নোবুট, স্নিকার, জ্যাকেট, রেনকোট দিয়ে দেন 'স্যালভেশন আর্মি'কে, গরীব বাচ্চাদের দেবার জন্যে। শুধু লণ্ডনের 'মার্কস অ্যাণ্ড স্পেনসার' থেকে কেনা ওর ছোটবেলার একটা উলের স্ল্যাকস্ আর সোয়েটার মণিকা এক ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছে। যদি কোনোদিন ওর বোন 'দেবিকা' (নামটা ও নিজেই ঠিক করেছে, আমেরিকানরা ডেবি বলে ডাকতে পারবে) কিংবা ভাই 'দেব' (আমেরিকানরা বলবে ডেভ) জন্মায়, তখন ঐ লুকিয়ে রাখা জিনিস দুটো তাদের দেবে। কিন্তু কোথায় আছে তারা ? 'মার্কস অ্যাণ্ড স্পেনসারে'র লাল সোয়েটার প'রে পটি চেয়ারে ব'সে ব'সে টয়লেট ট্রেনিং নিতে কেউ আসছেই না।

'মণি, এসো স্ন্যাকস্ খেয়ে যাও। এক্ষুনি ক্যারল এসে যাবে'—মার ডাকে কোনো সাড়া না দিয়ে মণিকা গোঁজ হয়ে বসে থাকলো। একটু পরে রুমা প্লেট নিয়ে এলেন। 'কি হলো ? এত আপসেট দেখাচ্ছে কেন ? স্কুলে কিছু হয়েছে ?' মণিকা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লো। 'তাহলে ? গ্রেড খারাপ করেছিস ? কি রে ?' ওর কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। রুমা কেবলই জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন—'পিয়ানো প্র্যাকটিস্ না ক'রে ভয় ধরেছে, না ? এক্ষুনি তো ক্যারল-দিদি (রুমা ঠাট্টা করে এসব নাম দেন) আসবে।' হঠাৎ একটা ছুতো পেল মণিকা। রেগে উঠে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো—'আই হেট হার।' রুমা ভুরু কুঁচকে বললেন—'আবার ? বলেছি না কথায় কথায় লোককে হেট করি বলবে না ? কি হয়েছে সত্যি করে বলো।' মার ধমকে মণিকার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো। রুমা একটু নরম হয়ে বলল—'কাঁদছিস কেন বল্ না।' মণিকা প্রাণপণে কান্না চাপার চেষ্টা করে অস্ফুট গলায় বললো—'হোয়াই ডোণ্ট ইউ গেট এ বেবী শাওয়ার মাম্ ?' রুমা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলেন। ধীরে ধীরে মণিকার কান্না-ভেজা মুখখানা মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন—'তোকে তো কতবার বলেছি মণি, ভগবান যদি না পাঠান বাচ্চারা নিজে থেকে আসতে পারে না।' এই কথাটাতেই মণিকা আরও অবুঝ হয়ে যায়। ভগবান কেনই বা ওদের বাড়িতে বেবী পাঠাল না ? মা এত বাচ্চা ভালোবাসেন। কারুর বাচ্চা হবে শুনলে তাকে বেবী শাওয়ারের নেমন্তন্ন করেন। কত রান্না করে তাকে খাওয়ান, সুন্দর শাড়ি দেন, কাউকে বাচ্চাদের জিনিস, অথচ মারই একবারও বেবী শাওয়ার হতে দেখলো না মণিকা। কত বাড়িতে কত রাগী মতো মা থাকেন, তাদের তো ঠিক বাচ্চা হচ্ছে। ভগবান কি কিছু দেখতে পান না ? ঐ যে শোভা আণ্টি, তাঁর বাড়িতে পার্টি হলে তো বাচ্চারা যেতে রীতিমত ভয় পায়। লিভিং রুমে ঢুকতে গেলেই তেড়ে আসছেন, ফ্যামিলি রুমেও বসার

নিয়ম নেই। তাঁদের বাড়ির ঠাণ্ডা বেসমেণ্টে একগাদা পুরোনো ফার্ণিচারের মধ্যে সব বয়সের ছেলে-মেয়েদের ঠেলে পাঠিয়ে দেন! ওপরে এসে উঁকি মারলেই এক ধমক—'গো ডাউন স্টেয়ারস্।' বড়দের জন্যে কত কি ভালো ভালো রান্না হয়। ওদের চিকেন আর ভাত নীচে বসেই খেতে হবে। চিংড়ি মাছে যে কাঁটা নেই, ছোটরা যে ওটাই ভালোবাসে তা কি শোভা আন্টি বোঝেন? কোনবার ওদের চিংড়ি মাছ, কাটলেট, ফীশফ্রাই কিছুই দেন না। মণিকা খায়নি শুনে মা পরে দুঃখ করেন। অথচ ঐ সেলফিশ জায়ান্ট শোভা আন্টিরও কি সুন্দর ন্যাড়া মাথা একটা বাচ্চা হলো। তাকে নিয়ে মণিকাদের বাড়ি ডিনারে এলেন। পার্টিতে নোংরা প্যাম্পার ওদের কিচেনের গারবেজের মধ্যে ফেলে পালিয়ে গেলেন। কি গন্ধ! কি গন্ধ। মা তাতেও কিছু মনে করলেন না। আর মাকে বেবী না দিয়ে ভগবান কিনা শোভা আন্টিকেই দিয়ে দিলেন। এই জন্যেই তো মণিকা আজকাল ভাইবোনের জন্যে মাকালীর ছবির সামনে প্রার্থনা করা ছেড়ে দিয়েছে। ইণ্ডিয়াতে ঠাকুমা শিখিয়ে দিয়েছিলেন কি করে 'হে ঠাকুর' বলতে হয়। এমনিতে ও ভালো বাংলা বলতে পারে না। বাবা, মাও সেরকম জোর করেন না। তবু শুধু 'দেবিকা' বা 'দেবের' আশায় ও 'হে ঠাকুর আমাকে একটা ভাই দাও' মুখস্থ করেছিল। নাঃ, ওতে কোনো কাজ হয় না।

গরমের ছুটিতে মণিকা বাবা, মার সঙ্গে ফিলাডেলফিয়া থেকে ইণ্ডিয়া বেড়াতে গেল। ভাইবোন না থাকার দুঃখ যখন ক্রমশঃ থিতিয়ে আসছে, ঠিক তখনই যে ওর জন্যে মস্ত এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে, ও ভাবতেই পারেনি। কলকাতায় পৌঁছোবার কদিন পরেই ঠাকুমার বাড়িতে একদিন ওর দাদু দিদিমা নেমন্তন্ন খেতে এলেন। খাওয়াদাওয়ার পর সবাই ঠাকুমার বিরাট খাটে বসে যখন পান খাচ্ছেন, বাবা বললেন—'আজ আপনাদের একটা খবর দেব। সব শুনে আপনাদের মতামত দেবেন।' ঠাকুমা বেশ অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। দাদু, দিদিমাও নড়েচড়ে বসলেন। বাবা বলতে শুরু করলেন—'অনেকদিন ধরেই ভাবছি আমাদের আর একটি বাচ্চা থাকলে ভালো হয়। মণি ভীষণ লোন্‌লি। ওর জন্যেই একটি ভাই বা বোন দরকার।' মণিকার দিদিমার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। একমনে মেয়েকে লক্ষ্য করতে করতে বললেন—'ওমা! কিছু বুঝতে পারিনি তো, কবে থেকে?' দাদু হঠাৎ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বাবাকে বললেন—'চলো চলো আমরা বরং ও ঘরে গিয়ে বসি।' বাবা দাদুকে বসিয়ে বললেন—'না, না ওসব কিছু নয়। আগে আমার কথা শেষ করি। আপনারা তো জানেন, রুমার সেই মেজর অপারেশনের ব্যাপারটা। তা এবার ঠিক করেছি মাদার টেরেসার অর্ফানেজ থেকে একটি বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করবো।' মণিকা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে একবার বাবাকে দেখলো, একবার মাকে, একবার বাকী সবাইকে। মা কেমন যেন ভয়ে ভয়ে ঠাকুমার দিকে তাকাচ্ছেন। ঠাকুমা গম্ভীরভাবে বললেন—'কেন? এখন তো রুমার শরীর ভালো হয়ে গেছে। নিজেরই

একটি হোক না।' বাবা মাথা নেড়ে বললেন—'ওর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। এ বয়সে বাচ্চা হবার অনেক রিস্‌ক আছে। ওদেশে ডাক্তাররাই বলে যে' দাদু তার আগেই জিজ্ঞেস করলেন—'কার বিপদ হতে পারে, মার না বাচ্চার?' রুমা বললেন—'বাচ্চাদেরই অনেক সময় বার্থ ডিফেক্টের ভয় থাকে বাবা। ওদেশে কত যে এরকম বাচ্চা দেখি।' দিদিমা বললেন—'যাঃ তোদের যত বাজে ভাবনা! কই আমাদের চেনাশোনা কত জনের তো বুড়ো বয়সে বাচ্চা হল। কারুর তো বাবা ডিফেক্ট মিফেক্ট দেখিনি। কি বলুন দিদি অ্যাঁ?' মণিকা এত আলোচনার সব কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝতে পারলো এঁরা কেউই ব্যাপারটা চাইছেন না। কিছু একটা বলার জন্যে ও ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলো। রুমা ধীরে ধীরে বললেন—'কথাটা একটু 'ভেবে' দেখুন, একটা দুঃস্থ বাচ্চাকে মানুষ করবো। সেই ভেবেও তো'···। বাবা ঠাকুমাকে বললেন—'অত ভেবে দেখারই বা কি আছে মা? তুমি নিজেই তো কত গরীব আত্মীয়-স্বজনকে এ বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলে, কত লোককে মেয়ের বিয়ের খরচ, ছেলের পড়ার খরচ দিয়েছো।' ঠাকুমা বললেন—'কাউকে সাহায্য করা আর নিজের ছেলে ব'লে মানুষ করা এক নয় শিবু। সেখানে আমার কোনো প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু এখানে তোমার অনেক আশা থাকবে। কি বংশ পরিচয়, কেমন সংস্কার কিছুই জানতে পারবে না। শুধু পরিবেশ আর শিক্ষা-দীক্ষার গুণেই তো মানুষ সম্পূর্ণ হয় না। যদি কখনো আঘাত পাও—' বাবা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—'সে আঘাত কি মানুষ কখনো নিজের সন্তানের কাছে পায় না?' ঠাকুমা শান্তভাবে বললেন—'তখন তাকে ভাগ্য ব'লে মেনে নিই। তাতে নিজের কোন সিদ্ধান্তের দায় থাকে না রে শিবু। কিন্তু এত বড় ঝুঁকি নেবার আগে একটু ভেবেচিন্তে দেখিস। পরের ছেলে মানুষ করা অত সহজ নয়।' দিদিমা এতক্ষণ কিছু বলার সুযোগ পাননি। এবার গলা ঝেড়ে বলে উঠলেন—'হ্যাঁ বাবা, এ হচ্ছে খোদার ওপর খোদকারি।' বাবা সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলেন—'আসলে আমরা অনেকদিন থেকেই ভেবেচিন্তে অ্যাডপ্‌শন এজেন্সীর থ্রু দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছি। চিঠিপত্রও অনেক লেখা হয়েছে। মোটামুটি ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এবার একটি বাচ্চাকে নিয়ে যেতে পারবো বলেই আরও এসময় দেশে এলাম। কিন্তু তোমরা এতটা আপত্তি করবে ভাবিনি।' মণিকা আর থাকতে না পেরে ঠাকুমাকে বললো—'প্লীজ ঠাকুমা, আমারও একটা ব্রাদার চাই, একটা সিসটার চাই। হাউ মেনি টাইম্‌স্‌ মা কালীকে প্রে করেছি, ইউ নো দ্যাট্‌।' দিদিমা বললেন—'তুই থাম্‌। ব্রাদার, সিসটার ক'রে চেঁচাচ্ছিস তো খুব। তখন আর এত আদর পাবি বাবা, মার কাছে?'—'হোয়াই নট? তোমার তো থ্রী চিলড্রেন, তুমি কি মাম্‌, মাসীমণি আর মামাকে ডিস্‌ক্রিমিনেট করো? ডু ইউ?' মণিকা খাটের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে দিদিমার দিকে ঝুঁকে গলার শির ফুলিয়ে ঝগড়া করছে দেখে দাদু হেসে ফেললেন। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন এই আলোচনাই চলতে লাগলো।

তারপর দু' তিনদিন ঠাকুমা কি সব ভাবলেন। বাবাও গম্ভীর। মা বলছিলেন, ঠাকুমার বোধহয় এ জন্যে দুঃখ হয়েছে যে, বাবা সব কিছু ঠিক করার পর কেন ঠাকুমার মত চাইলেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুমা বললেন—'আমার কোনো আপত্তি নেই। যা ভালো মনে করেছো করো!' দিদিমাও দাদুর বোঝানোতে আর বেশী আপত্তি করলেন না। শুধু ফিসফিস করে মাকে বলছিলেন—'ব্রাহ্মণের বাচ্চা আনিস।'

মা, বাবা রোজ সকাল থেকেই এ ব্যাপারে ব্যস্ত থাকছেন। অফানেজে যাচ্ছেন, কত কাগজপত্র সই করছেন, পাসপোর্টের ব্যবস্থা, টিকিট কাটা, ভিসার ব্যবস্থা করার জন্যে কেবলই বেরিয়ে যাচ্ছেন। মা'র শখ বলে ছেলে নেওয়া হচ্ছে। তার নাকি মাত্র চার মাস বয়স। মণিকা রোজই তাকে দেখতে যাবার জন্যে বায়না ধরছিল। কিন্তু হঠাৎ ওর চিকেনপকস্ হলো। মামার বাড়িতে পুরো দুটো সপ্তাহ দিদিমা ওকে মশারীর ভেতর শুইয়ে রাখলেন। গরমে, শরীরের কষ্টে, ঠাকুমার বাড়িতে বাচ্চাটার জন্যে কি কি কেনা হচ্ছে দেখতে না পেয়ে বেচারীর ভীষণ মনখারাপ হতে লাগলো। ওদিকে বাচ্চাটারও নাকি খুব ডায়রিয়া হয়েছে, সে এখন হাসপাতালে। বাবা, মা ছাড়া কেউ তাকে এখনও পর্যন্ত দেখেনি।

ক্রমশ মণিকা সেরে উঠলো। বাবা রোজই দেখতে আসছেন। ও বাড়িতে দুদিন হলো বাচ্চাটা এসে গেছে। সেখানে যাবার আগের রাতে আনন্দে, উত্তেজনায় মণিকার ভালো ঘুম হল না। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলো—একটা স্ট্রোলার নিয়ে ও কোথায় কোথায় যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ভেতরে ব'সে আছে ফর্সা ধপধপে, নীল চোখের একটা ছোট্ট পুতুলের মত মানুষ, মাথায় বেশী চুল নেই কিন্তু··

পরদিন সকালে দাদু, দিদিমা মণিকাকে নিয়ে ও বাড়িতে রওনা হলেন। দিদিমা লাল বাক্সে সোনার হার নিয়ে চলেছেন। দাদুর হাতে মিষ্টির বাক্স। গাড়িতে যেতে যেতে মণিকা বললো—'আই অ্যাম্ গেটিং ভেরী নার্ভাস।' দাদু বললেন—'কেন?'—'আই ডোন্ট নো। বেবীটাকে কি করে হ্যাণ্ডেল করবো দাদু? কত ডেলিকেট হবে, না?' দাদু বললেন—'তোমাকেই তো দেখাশোনা করতে হবে। তোমারই তো বেশী শখ ছিল।' দিদিমা পান চিবোতে চিবোতে বললেন—'হ্যাঁ বুঝবি মজা, পায়ে যখন হিসি ক'রে দেবে।' 'ও, নো, বেবী তো প্যাম্পায় পরবে।'—'কি বললি? পামপার! সে আবার কি?' মণিকা মজা পেয়ে গেল। চোখ কুঁচকে হেসে হেসে বললো—'না, না, হাগিস্ ডায়াপার কিনে দেব'। (Huggies diaper-এর বিজ্ঞাপন আমেরিকার টেলিভিশনে ও প্রায় রোজই দেখেছে)। দিদিমা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে বললেন—'হাগিস্ ডাইপার? মানে হাগার নেংটি? এদিকে তো তুই বাংলায় পণ্ডিত। অসভ্য কথাগুলো বেশ শিখেছিস তো?' খুব হাসাহাসি করতে করতে ওরা ঠাকুমার বাড়ি পৌঁছে গেল।

দোতলার ঘর থেকে কথাবার্তা ভেসে আসছে। দিদিমা 'কই দাদুভাই কই' বলতে বলতে হনহন ক'রে ঘরে ঢুকে পড়লেন। মণিকার বুক ঢিপঢিপ করছে। বেশী আনন্দ হলে কি এরকম হয়? উঃ কতদিনের ইচ্ছে 'হে ঠাকুর' শুনলেন শেষ পর্যন্ত। ঘরে ঢুকে এক পা এগিয়েই ও থমকে গেল। মা খাটে ব'সে আছেন। কোলে ঐ কি সে, যার জন্যে ওরা এত আশা নিয়ে এতদূরে এসেছে? কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মণিকার শরীরটা শিউরে উঠলো। কালো রোগা, এতটুকু একটা পোকার মত বাচ্চা, মাথাভর্তি তেল আর চোখে কালো রং মেখে পিট্ পিট্ ক'রে তাকাচ্ছে। সরু সরু হাত পা'গুলো কিলবিল ক'রে নাড়ছে আর মাঝে মাঝে বিশ্রী ফাটা গলায় কাঁদবার চেষ্টা করছে। দিদিমার উচ্ছ্বাস থেমে গেছে। মৃদু গলায় বললেন—'এত রোগা কেন রে?' বাবা বললেন—'ডায়রিয়ায় ভীষণ ভুগে উঠল যে।'

মণিকাকে দরজার একপাশে দাঁড়াতে দেখে রুমা ডাকলেন—'আয় মণি আয়। দ্যাখ্ তোর ভাই এসেছে।' মণিকা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। 'ও নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট হিম। হি ইজ নট মাই ব্রাদার' ব'লে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো। বাবা কাছে এলে বাবাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। ঘরে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেছেন। ঠাকুমা বললেন—'আমি জানতাম প্রথমটা এরকম হবে। এতদিন একা ছিল তো।' দিদিমা ততোক্ষণে নিজেই হতাশা সামলে নিয়েছেন। মণিকাকে ডেকে বললেন—'ওকি মণিকা, ওরকম করে নাকি বোকা মেয়ে? তুমি না দিদি হও?' বাবা, মা সবাই ওকে আদর করছেন, শান্ত করার চেষ্টা করছেন। ভাবছেন ভাই দেখে বুঝি ওর হিংসে হয়েছে। মণিকা কি করে বোঝাবে ওর আসল যন্ত্রণা কোথায়? ও তো বন্ধুদের ভাই-বোন দেখে নিজের ভাই-বোন চেয়েছিল। তারা কত সুন্দর, ফর্সা, মোটাসোটা নরম নরম বাচ্চা। ওর নিজের মা এত সুন্দর, ওকে তো সবাই 'প্রিটি' বলে। অথচ ঘেন্না করার মত এই বিশ্রী বাচ্চাটাকে ওদের বাড়ির একজন ব'লে এবার থেকে মেনে নিতে হবে, সবাইকে দেখাতে হবে—ভেবে ভেবে দুঃখে, লজ্জায় ওর বুক ভেঙে যাচ্ছিলো।

বাকি কটা দিন মণিকা একেবারে গুম মেরে রইলো। বাড়ির লোকেরা ওর সম্পর্কে একই কথা ভাবছেন। বাচ্চাটা বাবা, মার ঘরে শুচ্ছে। মণিকা রাত্রে ঠাকুমার কাছে শুয়ে শুয়ে অনেক উপদেশ শুনছে, কোনটাই ভালো লাগছে না। ঠাকুমা বলেছেন—'মা কালীর কাছে ভাই চেয়েছিলে। পেলে তো? এখন কেউ এরকম করে বুঝি—' মণিকা কোনো উত্তর দেয়নি। ঘুমের 'ভান' ক'রে মট্‌কা মেরে শুয়ে থেকেছে। ওর ধারণা মা কালীর কাছে প্রে করার জন্যেই অত কালো ভাই এল। এর চেয়ে মা সরস্বতীর কাছে চাইলে ভালো হতো।

বাচ্চার নাম রাখা হয়েছে কৃষ্ণেন্দু। দরকার পড়লে আমেরিকানদের কাছে ক্রীস্ হয়ে যাবে। দিদিমা প্রথম দিকে রোগা, কালো বলে খুঁতখুঁত করলেও শেষের কদিন 'ও কালীধন, কালীধন' ক'রে কি অসম্ভব বাড়াবাড়ি যে আরম্ভ

করলেন। মণিকা ইচ্ছে করেই তার এতদিনের প্রিয় 'দেব' নামটার কথা চেপে গেল। এ তো আর 'আগ্‌লি ডাকলিং'এর গল্পের মত ছোট্ট কুশ্রী হাঁসের বাচ্চা নয় যে, বড় হয়ে রাজহাঁস হয়ে সবাইকে অবাক ক'রে দেবে! ঐ চেহারা পরে মণিকাদের স্কুলের সেই রোগাপটকা ঝাঁকড়াচুলো রাকেশ প্যাটেলের মতই হবে শেষ পর্যন্ত, যাকে আমেরিকান ছেলেরা এমনিতে 'রকি' বললেও মারামারির সময় 'ইউ নিগার' ব'লে রাগিয়ে দেয়। এর জন্যে আর 'দেব' নাম রাখার দরকার নেই।

কলকাতা থেকে রওনা হবার দিন মণিকা মার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বারের মত খুব কান্নাকাটি করলো। ঠাকুমা, দিদিমারও চোখে জল। প্রণাম করার সময় ঠাকুমা বুকে জড়িয়ে ধরে অন্যান্য বারের মতই বললেন—'ভালো থেকো।' তারপর প্রায় কানে কানে বললেন—'ভাইকে ভালোবেসো।'

প্লেনে ওঠার পর থেকে মণিকা আপন মনে বই নিয়ে বসে থাকলো। ওর ধারণা অনেকেই ওদের সঙ্গে এরকম অদ্ভুত মার্কা একটা বাচ্চা চলেছে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। মা তো বললেও পারতেন বেবীটা অ্যাডপটেড! সে তো বললেন না, বরং সারাক্ষণ তার স্কাইকট, বেবীফুড, দুধের বোতল আর প্যামপার বদলানো নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন! মাঝেমাঝে মণিকার সাহায্য চাইলেন। বললেন—'আর অসভ্যতা কোরো না। আগে এত ভাই-বোনের জন্যে অস্থির হতে। তারপর কলকাতায় যা করলে ছিঃ।' বাবা অবশ্য হাসলেন। বললেন—'বুড়ি মেয়ে এত জেলাস হলি অ্যাঁ।' মণিকা এই 'জেলাস' হবার বদনামটাই বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে। আসল কারণটা তো আর বলা যায় না! মা ঐ কালীধনকে নিয়ে যা আনন্দে আছেন, তাকে বিচ্ছিরী বললে আর সহ্য করবেন না! এমনিতেই মা কারুর চেহারার নিন্দে করা একদম পছন্দ করেন না। নিউ-ইয়র্কে ওঁদের চেনা তৃপ্তিদি বলে একজন ট্যারা ভদ্রমহিলা অন্য একজনকে অনবরত মোটা বলেন। ফিলাডেলফিয়াতে একজন ফর্সা ভদ্রমহিলা বাদবাকী সবাইকে 'কালো মত' বলে চেনাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মা একেবারেই এরকম কথাবার্তা বলেন না। আর তাঁরই মেয়ে হয়ে মণিকা সদ্য পাওয়া ভাইকে দেখতে ভালো নয় ব'লে অপছন্দ করেছে জানলে মনে মনে অসম্ভব কষ্ট পাবেন। মহা মুশকিলে পড়া গেছে।

কুয়েত থেকে প্লেনটা ওঠার পর হঠাৎ বাচ্চাটা বারবার বমি আর পায়খানা করতে লাগলো। প্রথম দিকে মাও ততোটা বুঝতে পারেননি। ক্রমশ এত বেশী ডায়রিয়ার মত লক্ষণ দেখা গেল যে ভয়ে, ভাবনায় বাবা মা অস্থির হয়ে গেলেন। সঙ্গে যা ওষুধপত্র ছিল তাকে খাওয়ানো হল। লণ্ডন পৌঁছোতে এখনও অনেক দেরী। বাচ্চাটা ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছে। এয়ার হোস্টেসরা যা পারে সাহায্য করছে। ওর ডিহাইড্রেশন হতে পারে ভেবে বাবা চিনি আর নুনের জল বোতলে ভরে খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সে আর চোখ খুলে তাকাচ্ছে না, মাঝে মাঝে শুকনো জিভ বের ক'রে ঠোঁট চাটবার চেষ্টা

করছে, হাত পাও স্থির হয়ে আছে। মার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়ছে। অসহায় মুখ তুলে বাবাকে বললেন—'কিছু একটা করো।' বাবা প্লেনের মধ্যে ডাক্তার খুঁজছেন। একজন ডাক্তার পাওয়া গেল। তিনি এসে বাচ্চার পাল্‌স্‌ দেখলেন, মুখ গম্ভীর।

মণিকার বুকের ভেতরে একটা জমাট অনুভূতি ক্রমশ যে ভেঙেচুরে যেতে বসেছে। কোথা থেকে যেন প্রবল আলোড়ন আসছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই তীব্র যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে এগার-বারো বছরের মেয়েটা ভাবছে—যাকে দেখার পর শুধু বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা ছাড়া অন্য কোনো বোধ ওর জন্মায়নি, আজ এ মুহূর্তে কেন তার জন্যে এত কান্না আসছে? আপন মনের সংকীর্ণ ভাবনার বিচারে ও যে বারবার ঐ রুগ্ন, অসহায় শিশুকে অবাঞ্ছিত মনে করেছে —এমন সব গম্ভীর চিন্তায় মানসিক যন্ত্রণা পাবার বয়স ওর না হলেও, নিজের অবচেতনে কোথাও যে এক বড় রকম অবিচার, অন্যায়, পাপবোধ লুকিয়ে আছে—সেটাই সম্ভবতঃ ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে। কেবলই মনে হচ্ছে, ও চায়নি বলে, ভালবাসেনি বলেই কি বাচ্চাটা তার সব দীনতা নিয়ে সরে যাচ্ছে? প্লেনের জানলা দিয়ে মণিকা দেখলো, নীচে শুধু মেঘের সারি। নিশ্চয়ই 'হে ঠাকুর' ওখানেই কোথাও আছেন। গত কয়েকদিনের সমস্ত বিরূপতা ভুলে গিয়ে, অনুতাপে, আবেগে সম্পৃক্ত হয়ে ও আপন মনে বলতে লাগলো—'হে ঠাকুর...হে ঠাকুর,...আই ওন্ট হেট হিম এনি মোর। হি ইজ মাই ব্রাদার! প্লীজ, লেট হিম সারভাইভ...'

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে বাচ্চার অবস্থার কিছু পরিবর্তন হ'ল। সে এখন আর প্যাম্‌পার নষ্ট করছে না। একটু পরে পরে চিনির জল খাচ্ছে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। চেহারায় আর সেই বিবর্ণ ভাব নেই। লণ্ডনে পৌঁছেই বাবা ডাক্তারের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজন হলে দু-একদিন লণ্ডনে থেকে পরে অন্য ফ্লাইটে ওঁরা নিউইয়র্ক হয়ে ফিলাডেলফিয়া যাবেন। মা একভাবে বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছেন। মণিকা অপরাধীর মত মুখ করে এক সময় বাচ্চাটার হাত ধরলো। মা বললেন—'দেখলি তো কত কষ্ট পেলো! এখন তোর একটু ফীলিং হয়েছে, নারে?' মণিকা লজ্জা পেয়ে হাসলো। ছোট বাচ্চাটাও যেন কত কষ্টের পরে শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সামান্য হাসছে। মণিকা সেই অপুষ্ট হাত দুটো নেড়ে নেড়ে আদুরে গলায় ফিস ফিস ক'রে বলতে লাগলো —'আই লাভ ইউ মিস্টার ব্রাউনি...হাই ডাকি!...কুচি কুচি...কু-উ...উ...হাই কিউটি! ইউ ক্যান্‌ ইউজ মাই পটি চেয়ার...অ্যাণ্ড মাই ওল্ড সোয়েটার...।'

॥ ৪ ॥ কালো বুদ্ধের চোখ

"বার বার গ্যারাজে যাচ্ছ কেন?"

শোভনার রাগী রাগী গলা শুনে অপু আর তপু দুজনেই চমকে উঠল। ওরা যে চুপি চুপি গ্যারাজে ঢুকেছে, মা ঠিক টের পেয়েছেন। অপ্রস্তুত হয়ে

বেরিয়ে আসার সময় দুজনে একসঙ্গে মার মুখোমুখি পড়ে গেল। শোভনা শান্ত অথচ কঠিন গলায় বললেন, "কেন এরকম করছ? বলেছি না, ও জিনিস আর বাড়িতে রাখা যাবে না।"

অপু হঠাৎ বলে উঠল, "বাট দিস ইজ রিয়েলী আনবিলিভেবল! একটা মডেল কি হার্ম করতে পারে? অজয়কাকা একটা স্ট্রেঞ্জ কথা বলে গেলেন, আমরা সেটাই বিলিভ করব?"

শোভনা স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, "হ্যাঁ, আমার কথা ভেবে তাই-ই করবে। যাও, বাড়িতে ঢোক।"

দুই ভাই গম্ভীর মুখে টেলিভিশন দেখতে বসল। শোভনা দোতলায় উঠে গেলেন। অপু ফিসফিস করে ছোট ভাইকে বলল, "আমার বিশ্বাস হয় না। তোর বিশ্বাস হয়?"

তপু কাঁধ ঝাঁকিয়ে আরও ফিসফিসে গলায় বলল, "ঠিক জানি না। কিন্তু কিছু একটা গণ্ডগোল নিশ্চয় আছে। পরপর সব ঘটনাগুলোর কথা একবার ভেবে দেখ!"

ভীষণ চিন্তিতভাবে অপু খচর-মচর করে পপকর্ণ খেতে লাগল। অপুর টেলিভিশন দেখতে ভাল লাগছিল না। স্পোর্টস ইলাসট্রেডেট ম্যাগাজিনখানা নিয়ে ও বাড়ির পেছনে ঢাকা বারান্দায় একটি চেয়ারে গিয়ে বসল। তপুর কথার খেই ধরে কিছু পুরানো ঘটনা ওর মনে পড়তে লাগল।

ওরা গত বছর কলকাতা বেড়াতে গিয়েছিল। চলে আসবার তিনদিন আগে মামার বাড়ি থেকে ফেরার পথে লেক মার্কেটের স্টল থেকে মা হঠাৎ দারুণ সুন্দর একখানা বুদ্ধ মূর্তি কিনে আনলেন। স্লেট রঙ-এর মাটির হাফবাস্ট মূর্তি। চোখের দৃষ্টি এমন গভীর, যেন মনে হয় মানুষের ভেতর অবধি দেখে নিতে পারছে। বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এমন নিখুঁত মূর্তি রাস্তার দোকানে পেলে? দেখলে মনে হয় কোন বড় দোকানের জিনিস!"

শুধু ঠাকুমা বলেছিলেন, "চোখের দিকে তাকালে কেমন গা শিরশির করে না?"

সুটকেস গোছানর সময় ঠাকুমাই যত্ন করে তাকে কাপড় দিয়ে মুড়ে দিলেন। বাবা, মার টালীগঞ্জ ক্লাব-এর নিউইয়ার্স পার্টি থেকে আনা ক্রেপ পেপারের লাল টুপী বুদ্ধের মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "চূড়োটা আর ভাঙবে না।"

টুপী পরা বুদ্ধকে দেখে ওরা দু ভাই খুব হাসছিল।

তারপর দিন দুপুরে খেতে বসেছে, হঠাৎ মামার বাড়ি থেকে টেলিফোনে খবর এল, হার্ট অ্যাটাক হবার দশ মিনিটের মধ্যে দিদিমা মারা গেছেন। উঃ! মার তখন কি অবস্থা! কারুর মা মারা যাবার যে কি কষ্ট, অপু নিজের মাকে দেখে সেবারই বুঝতে পেরেছিল। মামার বাড়িতে গিয়ে দেখত, মা সারাদিনই শুধু কাঁদছেন। কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না। রাতের পর রাত ঘুমোতে পারছেন

না বলে মামারা মাকে ঘুমের ওষুধও দিয়েছেন একদিন। অপু তপুরও ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। ছোটবেলা থেকে দিদিমা ওদের কত আদর যত্ন করেছেন। নিউ জার্সি থেকে যতবার ইণ্ডিয়া গেছে, চান করান, খাইয়ে দেওয়া, বিরাট খাটে পাশে নিয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প বলা, দিদিমা সবসময় ওদের ঘিরে থাকতেন। ওরা দুজনে বাংলা বলতে পারে বলে উনি সবাইকে ডেকে ডেকে বলতেন, "দ্যাখ, আমার আমেরিকার সাহেব নাতিরা কেমন বাংলা বলে।"

দিদিমার শ্রাদ্ধ মিটে যাবার পর ওরা নিউ জার্সি ফিরে এল। কিন্তু ফেরার সময় কি বিভ্রাট! আগেরবারের প্লেনের বুকিং ক্যানসেল করানর পর আর কিছুতেই বুকিং পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে ওদের স্কুল খুলে গেছে, পড়ার ক্ষতি হচ্ছে। বাবার ছুটি শেষ। অথচ ফিরতে পারছেন না। মার শরীর এত খারাপ যে প্রায়ই শুয়ে থাকেন। অনেক চেষ্টার পর বুকিং পেয়েও কলকাতা থেকে বম্বে পৌঁছে শুনল, ওদের জন্যে ইণ্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে কোন রিজার্ভেশন নেই। তিনদিনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কের প্লেনে উঠতে পারল। প্লেনে মার খুব জ্বর এল, বার বার বমি করতে লাগলেন। কোন ডাক্তার নেই। এয়ার হস্টেসরা অ্যাসপিরিন, অ্যাভোমিন দিল। কুড়ি-একুশ ঘণ্টা ফ্লাইটের পর ওরা যখন নিউইয়র্কে এসে পৌঁছল, মা তখন খুবই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

এর মধ্যে দেখা গেল ওদের একটা বড় সুটকেস এসে পৌঁছোয়নি। বাবা তার জন্যে নানা ডেস্কে খোঁজ-খবর, কমপ্লেন করতে লাগলেন। মা অত শরীর খারাপ, মন খারাপ নিয়েও বলতে লাগলেন, "কি হবে বল তো? ওতেই এখানকার সব লোকেদের জন্যে তাদের বাড়ি থেকে দেওয়া জিনিসগুলো ভরেছিলাম। সুনন্দার পাটালি গুড়, অমিতার শাড়ি, দীপার পুজো সংখ্যা, পালবাবুর লুঙ্গী, জর্দা, পানবাহার

অপু তখন অধৈর্য হয়ে মাকে থামিয়ে দিয়েছিল। ঐ সুটকেসের মধ্যেই ওর স্কুলের যত বইখাতা, ছুটির হোমওয়ার্ক থেকে গেছে। আর মা কিনা কার লুঙ্গী আর গুড়ের জন্যে মন খারাপ করছেন।

কাস্টমস-এর বাইরে এসে ওরা আরও মুশকিলে পড়ল। কেউ তাদের নিতে আসেনি। আসলে বম্বেতে যা বুকিং-এর গোলমাল হল, শেষ মুহূর্তে টেলিগ্রাম করায় যাদের নিতে আসার কথা ছিল, তারা নিশ্চয়ই খবরই পায়নি। বাইরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ছিল। সেই শীতের রাতে ট্যাক্সি ভাড়া করে অসুস্থ মাকে নিয়ে, একটা সুটকেস হারিয়ে, ওরা ষাট মাইল দূরে বাড়িতে পৌঁছেছিল।

কয়েকদিনের মধ্যে মার নিউমোনিয়া হল। মা হাসপাতালে ভর্তি হলেন। তখন ওদের যে কি কষ্ট হয়েছিল। উইক ডে-তে ছোটদের হাসপাতালে ঢুকতে দেয় না। মার সঙ্গে শুধু ফোনে কথা হয়েছিল। বাবা বাড়ির কাজকর্ম মোটেই ভাল জানেন না। দুবার জামাকাপড় এমন করে ওয়াশিং মেসিনে দিলেন, সে শার্টগুলো পরিষ্কারই হল না। জীন্স-এর গায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো সাবান লেগে

থাকল। বাড়িঘর অগোছাল। একদিন ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে স্কুলবাস চলে গেল। রাতে বাবার তৈরি বিচ্ছিরি ডাল আর ঝালবিষ ডিমের ডালনা একদিন খেয়েই ওরা আর খাবে না ঠিক করেছিল। এদিকে সে সময় কদিন এত বরফ পড়ছিল যে রোজ রোজ রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ডিনার খাওয়াও হচ্ছিল না।

মা সুস্থ হয়ে বাড়ি এলেন। কিন্তু বাবাকে কিছুদিন ধরে বেশ চিন্তিত মনে হল। অপু শুনল বাবার অফিসে নাকি 'লে অফ' শুরু হয়েছে। আরও অনেক কোম্পানিতেই চেনাশোনা ইণ্ডিয়ানদের চাকরি চলে যাচ্ছে! সারা আমেরিকায় আনএমপ্লয়মেণ্টের জন্যে লোকেদের ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাবা প্রায়ই বলতে লাগলেন, "আমাদের কোম্পানির সামনে নতুন কোন প্রজেক্ট নেই। জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে?"

মার্চের শুরুতে অপু তপুর পোষা প্যারাকিট পাখি চার্লির সারা গায়ে লাল লাল ঘা হয়ে সবুজ পালক খসে পড়ে যেতে লাগল। ওরা খাঁচা দুলিয়ে পাখিটাকে জন্তু-জানোয়ারদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি দু-তিন রকমের ওষুধ দিলেন, স্প্রে দিলেন, নতুন ভিটামিন দিলেন। কিছুতেই কিছু হল না। সে আর ডিগবাজী খেত না, ডাকাডাকি করত না, ভাল করে খাবার খেত না। কেবলই ঠোঁট দিয়ে গা চুলকে চুলকে রক্ত বার করত আর মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ে থাকত। বসন্তকাল এল। বাগানে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখে সে অন্য বছর কত ডানা ঝাপটাত, কিচির-মিচির করত। এবার দেখেও দেখল না।

একদিন সকালে মা খাঁচা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখলেন চার্লি ঘাড় গুঁজে মরে পড়ে আছে। ওরা সেদিন ভাল করে খেতে পারল না। নিউইয়র্ক-এর 'শামিয়ানা' নামে মিষ্টির দোকান থেকে আনা সুন্দর একটা ছোট্ট খালি বাক্সে চার্লিকে শুইয়ে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে ওরা কফিন তৈরি করল। তপু চেয়েছিল, ওর নিজের ঘরকেই ফিউনারাল হোম বানিয়ে চার্লিকে ফুল দেওয়া অবস্থায় বাক্সের ঢাকা খুলে অনেকক্ষণ রাখবে, যাতে ওর পাড়ার বন্ধুরা ফুলটুল নিয়ে দেখতে আসতে পারে। কিন্তু বাড়িতে কেউ রাজি হলেন না। পেছনের বাগানে ওক গাছের নিচে বাবা মাটি খুঁড়ে দিলেন। অপু, তপু বাক্সটা রেখে মাটি চাপা দিল। তারপর অনেকদিন পর্যন্ত ওরা কমলা রঙ-এর খাঁচাটার দিকে তাকাতে পারত না।

এক মাস পরে বাবাকে তিন হাজার মাইল দূরে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যেতে হল। অফিস থেকে কয়েক মাসের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবা না থাকায়, বাড়িতে কিছু ভাল লাগত না। অঙ্ক বুঝতে না পারলে বাবা, সায়েন্স বুঝতে না পারলে বাবা, ছুটির দিনে দূরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে বাবা, বাইরে ডিনার খেতে যাওয়া মানে বাবা, অথচ সেই বাবাই কত দূরে চলে গেলেন।

পুজোর সময়টাও সে বছর বিশেষ ভাল কাটল না। বাবা মাত্র দুদিনের জন্যে এসেছিলেন। দিদিমার জন্যে পুজোর কদিন মার মন ভাল ছিল না। দশমীর দিন খুব কাঁদছিলেন। তার মধ্যে পুজোর কাজ করার সময় মা নিজের

ব্যাগ দূরে সরিয়ে রাখতে কে যেন সেখান থেকে মার কানের ডায়মণ্ডের দুল আর ডলার চুরি করে নিল। আগে কখন পুজোর হলে এরকম ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু সেবার ওখান থেকে আরও অনেকের জিনিস চুরি হল। সিকিউরিটির লোকেরা বলল তোমাদের রিলিজিয়াস ফেসটিভ্যালে ইণ্ডিয়ান ছাড়া কেউ আসে না। তোমাদের লোকেরাই কেউ এ কাজ করেছে।

অপু খুব অবাক হয়েছিল, লজ্জাও করছিল শুনে।

ইণ্ডিয়া থেকে চিঠি এল মামার বাড়িতে দাদু পড়ে গিয়ে খুব আঘাত পেয়েছেন। ঠাকুমার বাড়িতে ছোট কাকারও শরীর খারাপ, হার্টের কষ্ট শুরু হয়েছে। বাবা ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকতেই একদিন অপুদের বাড়ির পেছনের কাঁচের দরজা ভেঙে চুরি হল। সারা বাড়ির জিনিসপত্র ওলোট-পালোট করে চোর মা-র কিছু কসটিউম-জুয়েলারী আর অল্প ডলার নিয়ে পালিয়েছে। পুলিস এসে বলল, গয়নার লোভেই নাকি চোর এসেছিল। মা বাড়িতে আসল গয়না রাখেন না। তাই সেসব কিছু পায়নি। চুরি বিশেষ হল না বটে, কিন্তু ওরা কটা দিন ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে কাটাল। দরজা সারান পর্যন্ত মা সারা-রাত হাতের কাছে ফোন নিয়ে নিচের ঘরে জেগে বসে থাকতেন। তারপরেও কি ভয় করত! তপু বলেছিল, রাতে ঘুম ভাঙলেই ওর নাকি মনে হত দোতলার সিঁড়ি বেয়ে কেউ উঠে আসছে।

ক্রীসমাসের ছুটিতে বাবা বাড়ি এলেন। বাবারও ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু চাকরির জন্যে থাকতেই হবে কিছু-দিন। এই ইস্ট কোস্টের দিকে নাকি চাকরির বাজার ভাল নয়। ইচ্ছে করলে যে এখনই এখানে নতুন চাকরি পাবেন, তারও কোন উপায় নেই। মা-র সঙ্গে বাবা সেই কথা আলোচনা করেন। মা-র শরীর ভাল থাকে না। মাঝে মাঝেই জ্বর হয়। আসলে অপু লক্ষ্য করেছে, বাবা না থাকায় মা মাসের পর মাস ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করেন না। মা মাছ তরকারী, ভাত খেতে ভাল-বাসেন! কিন্তু ওরা ভালবাসে না বলে মাছ এখন একদম আসে না। ওদের দু ভাই-এর পছন্দ অনুযায়ী আমেরিকান ডিনার তৈরি করে দেন। নিজে বীফ খান না বলে বেশির ভাগই ওদের খাবার খেতে পারেন না, আলাদা করেও কিছু করতে চান না। অপু রাগ করে, কিন্তু মার সঙ্গে পেরে ওঠে না।

জানুয়ারির প্রথম দিন মা বাবাকে বললেন, "গত বছরটা এত খারাপ কাটল। জানি না এবার কেমন যাবে।"

সেদিনই পীটসবার্গ থেকে বাবার বন্ধু অজয়কাকা এলেন। লিভিংরুমে বসে থাকতে থাকতে টুলের ওপর রাখা বুদ্ধ মূর্তি দেখে হঠাৎ কেমন থমকে গেলেন। কিছুক্ষণ দেখার পর বাবাকে বললেন, "এবার কিনে এনেছ মনে হচ্ছে? আগে তো কখনো দেখিনি!"

বাবা বললেন, "হ্যা, শোভনা কলকাতায় কিনেছিল। খুব জীবন্ত নয়? অথচ দাম শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে! কত বল তো?"

অজয়কাকা কথাটা খেয়াল করলেন না। অন্যমনস্কের মত বললেন, "শেষ পর্যন্ত কালো বুদ্ধ মূর্তি কিনলে ?"

বাবা একটু অবাক হয়ে বললেন, "তোমার আবার এরকম কুসংস্কার কবে থেকে হল ? ভগবান বুদ্ধের মূর্তি, তার আবার ভাল-মন্দ কি।"

অজয়কাকা বললেন, "না ঠিক তা নয়। আসলে ভগবানের মূর্তি হিসেবে না দেখে, যদি কিউরিও হিসেবে বা পুরনো আর্টপিস হিসেবে ভাব··· ।"

বাবা বললেন—"আঃ, এ তো তাও নয়, যে হাজার বছরের ইতিহাস জড়িয়ে থাকবে। লেক মার্কেটের ফুটপাথে কেনা সাধারণ জিনিস..."

বাবার কথা শেষ হবার আগেই মা এসে দাঁড়ালেন। মার মুখখানা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে এল। কয়েক পলক মূর্তির দিকে চেয়ে থেকে অজয়কাকাকে বললেন, "আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। ও মূর্তি আমাদের সহ্য হয়নি। এখনো হচ্ছে না।"

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, "আঃ শোভনা, কি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ। অজয় ঠাট্টা করছে। আর তুমিও অমনি সিরিয়াস হয়ে উঠলে !"

"না পরিমল, ঠাট্টা নয়। আমাদের একটি চেনাশোনা ফ্যামিলিতে বুদ্ধ মূর্তি নিয়ে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। তুমি বিশ্বাস কর না বলেই, এসব মিথ্যে হয়ে যাবে, তা তো নয়।"—অজয়কাকা গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন।

অপু, তপু অবাক হয়ে একবার অজয়কাকার দিকে আর একবার বুদ্ধ মূর্তির দিকে তাকাচ্ছিল। অজয়কাকার কথাগুলো অপুর একটুও ভাল লাগছিল না। একজন শিক্ষিত মানুষ কি করে একটি পবিত্র মূর্তি সম্পর্কে এরকম কথা বলতে পারেন। কিন্তু ছোট্ট তপুর মন বোধ হয় অজয়কাকার কথাগুলো বিশ্বাস করতে চাইছিল। ও ভাবছিল, টেলিভিশনে 'দ্যাটস ইন-ক্রেডিবল শো'তে তো এরকম কত ঘটনা দেখায়। ওদের নিজেদের একটি বুদ্ধ মূর্তির 'পাওয়ার' আছে—এটা কি সামান্য ঘটনা ? স্কুলে আর পাড়ায় বললে বন্ধুরা সবাই ছুটে দেখতে আসবে। বাবা আর তর্ক করতে চাইলেন না। ক্ষুব্ধ হয়ে অপু শুধু লক্ষ্য করল—মা কি অদ্ভুতভাবে অজয়কাকার বাজে কথাগুলো বিশ্বাস করলেন আর সেই সব গল্প শুনতে শুনতে কি রকম অস্থির হয়ে বারবার নিজের কেনা বুদ্ধ মূর্তির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন।

পরদিন সকালে অজয়কাকা চলে গেলেন। হঠাৎ বাবা বললেন,—"আরে বুদ্ধ মূর্তি কোথায় গেল ? অজয় নিয়ে গেল নাকি !"

মা কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। শেষে বাবা বারবার জিজ্ঞেস করাতে বললেন, "আমি সরিয়ে রেখেছি।" বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ?"

মা বললেন, "গ্যারাজে রেখেছি। একদিন কোথাও ফেলে দিয়ে আসব।"

বাবা ভীষণ রেগে উঠলেন, "কি হল কি তোমার ? যত বাজে কুসংস্কার ! কি ক্ষতি করেছে ঐ বুদ্ধ, যে অত সুন্দর মূর্তিখানা বাইরে ফেলে দিতে হবে ?" বাবা বেশ চিৎকার করে উঠেছিলেন।

হঠাৎ মা সিঁড়িতে বসে ঝরঝরে করে কেঁদে ফেললেন। বলতে লাগলেন, "কি ক্ষতি করেনি ? কেনবার পরদিন আমার মা চলে গেল। তার কি যাবার বয়স হয়েছিল ? কি মনোকষ্ট, শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে ফিরলাম। সুটকেস হারাল। তারপরও একটার পর একটা ক্ষয়ক্ষতি চলেছে। অসুখে ভুগে ভুগে মরছি, তোমার চাকরির এই অবস্থা। একা সবদিক সামলাতে পারি না। তার ওপর গয়না চুরি, বাড়ি ভেঙে চুরি, পাখিটা মরে গেল। কোনটা ভাল হয়েছে বলতে পার ? বাবার শরীর দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে। এবার বোধ হয় বাবাও যাবে।"

মার কান্না আর হাহাকার শুনে অপু, তপু স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। বাবা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। মার পিঠে হাত রেখে শান্ত হতে বললেন।

আজ সারাদিন বাড়িতে থমথমে ভাব। সেদিনের পর থেকে ওরা মাকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। অথচ বুদ্ধ মূর্তিকে বাইরে ফেলে দিয়ে আসতে ওদের কারুরই মন চাইছে না। মাও অতটা বাড়াবাড়ি করবেন কিনা বোধ হয় ভেবে দেখেছেন। কারণ সকালে বাবাকে বলেছেন, "এখন গ্যারাজেই থাক। পরে যা হয় করা যাবে।"

বাইরে গাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দে অপুর এতক্ষণের ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল। কতক্ষণ ধরে ম্যাগাজিন খুলে নানা কথা ভাবছিল, নিজেরই খেয়াল ছিল না। বাবার গলা শুনতে পেয়ে বাড়িতে ঢুকে দেখল, বাবার সঙ্গে ওঁর অফিসের বন্ধু মিস্টার ওয়েসলী দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা নিজের ছুটির মধ্যে আজ এখানকার অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ওঁকে নিয়ে এসেছেন। উনি অপুকে দেখে হেসে বললেন, "হাই কিড ! হাউ আর ইউ ?—" উত্তর পাবার আগেই বললেন, "হোয়্যার ইজ ইয়োর পাওয়ারফুল বুডা ?"

মাকে ডেকে বাবা বললেন, "এডের নানা কালেকশন আছে। ও ওই বুদ্ধ মূর্তিটা চাইতে এসেছে।"

মা ম্লান হেসে বললেন, "কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করব ওটা না নিতে। পরিমল নিশ্চয় আপনাকে সব বলেছে ?"

এড ওয়েসলী বললেন, "ও ইয়েস। কিন্তু চিন্তা করবেন না। একটা চান্স নিয়ে দেখাই যাক না। ইটস কাইণ্ড অফ ইনটারেস্টিং !"

শেষ পর্যন্ত উনি মূর্তি নিয়ে গেলেন। গাড়িতে তোলার সময় অপু দেখল সেই অপূর্ব সুন্দর মূর্তি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। একটি ধর্মের প্রতীককে বিনা বিবেচনায় অভিশপ্ত বলে দিলেন অজয়কাকা। মাও তাই বিশ্বাস করলেন। কি এক অপরাধবোধে অপু সে রাতে অনেকক্ষণ জেগে রইল।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। বাবাকে একবার ক্যালিফোর্নিয়া যেতে হল বটে। কিন্তু আর বেশিদিন থাকতে হল না। আবার এখানকার অফিসে ফিরে এলেন। বাবা থাকায় মার দায়িত্ব, সাংসারিক চাপ কমে গেছে বলেই বোধ হয় শরীর, মনমেজাজ সবই ভাল আছে। মার ধারণা বছরটা মোটামুটি খারাপ

কাটছে না। মাঝে মাঝে এড ওয়েসলীর খবর জানতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অপু, তপু শোনে বাবা খবর আনছেন—এডের সঙ্গে তার বসের প্রায়ই ঝগড়া হচ্ছে। চাকরিতে প্রমোশন হচ্ছে না বলে এডের ভীষণ রাগ বস-এর ওপর। মেডিকেল পরীক্ষায় হাইকলেস্টেরল ধরা পড়ায় তাঁর প্রিয় খাবার ডিম, সসেজ, মাখন, চীজ, রেডমিট, চিংড়ী মাছ সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে ডাক্তার আর বৌ-এর বকা-বকিতে। ছেলে অ্যাকসিডেণ্ট বাধিয়ে বাবার নতুন গাড়ি ভেঙেচুরে এনেছে। অফিসে ঝগড়া, খেয়ে সুখ নেই—এতসব নালিশ সত্ত্বেও উনি নাকি বলেছেন, "ইটস এ পার্ট অফ লাইফ। আই ডোণ্ট থিন্ক, দেয়ার ইজ এনিথিং রং উইথ দ্যাট কিউট চার্মিং বুড্ডা।"

অপু ভাবছিল মা এই সহজ কথাটাই বুঝতে চাইলেন না। সে বছরের সব ঘটনাগুলোকে যদি 'পার্ট অফ লাইফ' বলে মেনে নিতে পারতেন, আজও ওদের লিভিংরুমের ছোট টেবিলে সেই উজ্জ্বল মূর্তি সাজান থাকত। বুদ্ধের চলে যাওয়ার দিন শেষ মুহূর্তের চোখের দৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোনো দুঃখের, অপমানের, অনুযোগের ছায়া পড়েছিল কিনা—ভেবে ভেবে আজ অপু হঠাৎ হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত না।

॥ ৫ ॥ পরবাস

আমার জীবনে যাবতীয় ঘটনায় বৃষ্টির এক অবধারিত ভূমিকা আছে জেনেও আগস্ট মাসে বাড়ি বদল করলাম। অ্যাঞ্জেলা বাটারওয়ার্থ সেপ্টেম্বরে ক্যালি-ফোর্নিয়া চলে গেলেন। আগস্টের আগে তাঁর বাড়ি বিক্রির ইচ্ছে ছিল না। আমরাও এ নিয়ে আর বেশী চাপ দিইনি।

বাড়ির ক্লোসিং-এর আগে রাতভোর বৃষ্টি হল। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের ফাঁকে যখন সকাল হল, ঝম্‌ঝমে বৃষ্টির মধ্যেই ততোক্ষণে বিশাল ভ্যান্ নিয়ে একদল মুভার এসে গেছে। সঙ্গে এনেছে মস্ত মস্ত কার্ডবোর্ডের বাক্স। চোখের নিমেষে ক্লোসেট থেকে হ্যাঙ্গার সুদ্ধু জামাকাপড় তুলে নিয়ে উঁচু বাক্সে আলমারির মতো ঝুলিয়ে দিচ্ছে। হৈ হৈ করে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে ভ্যানে তুলছে। অ্যাপার্টমেণ্টের এক একখানা ঘরে ঢুকে দু-তিনজন মিলে ঝপাঝপ্ বাক্সবন্দী করছে আমাদের দীর্ঘদিনের দরকারী অদরকারী যা কিছু।

হঠাৎ দেখি শাখাপ্রশাখা নিয়ে দুর্গাঠাকুর তাক সমেত নিখোঁজ। বারণ করা সত্ত্বেও সর্দারী করে নির্ঘাৎ কোনো বাক্সের খোলে পুরেছে। দৈত্যের মতো লম্বা কালো মুভারের প্রায় পেটের কাছে দাঁড়িয়ে জেরা করে উদ্ধার করলাম ল্যাম্পশেডের কোলে বসানো খড়কুটো জড়ানো 'গণেশ' আর এক রাশ ছবির মধ্যে রবার ফোমের অজস্র কুচিতে শোয়ানো মা দুর্গাকে। বাক্সর গায়ে আবার ফেল্‌ট্ পেন দিয়ে দাগিয়ে রেখেছে—ফ্র্যাজাইল হ্যাণ্ডল্ উইথ কেয়ার।

কে কার প্রযত্নে থাকে? বিরক্তির মধ্যে হেসে ফেলেছি দেখে অপ্রস্তুত

লোকটা পুরু পুরু ঠোঁটের ফাঁকে ঝক্‌ঝকে দাঁতে হেসে উঠলো। ঠাট্টার সুরে বলল—"এগুলো নিশ্চয়ই তোমার ছোটবেলার খেলনা ?"

আমি ছোটবেলার খেলার সংসার সঙ্গে নিয়ে চলেছি অথবা অন্য কারো সংসারের খেলায় ভেসে চলেছি, এত কথার সময় ছিল না তখন। নয়তো তাকে প্রশ্ন করা যেত। আর সে আলোচনায় লোকটি যে খুব অনীহা দেখাতো, এমনও নয়। বেশ জ্ঞানী জ্ঞানী মন্তব্য, কথায় কথায় জীবনদর্শনের নানা ব্যাখ্যা আওড়ানোর প্রবণতা আমেরিকার এই গরীব মানুষদের মধ্যেও কিছু কম দেখি না। রঙ-মিস্ত্রি সেই পিটারকে আজও মনে আছে।

আগের অ্যাপার্টমেণ্টে তিনতলায় জানলার বাইরের খাঁজে ছোটো ছোটো কালো পাখি বাসা বেঁধে ছিল। শেষ রাত থেকে কিচিরমিচির আর ডানা ঝাপ্‌টানোর শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। মাঝে মাঝে খড়কুটো ঠেলে ঠেলে ঘরে এনে ফেলত। বিল্ডিং সুপার অ্যাপার্টমেণ্ট রং করানোর জন্যে যখন দশাসই চেহারার নিগ্রো মিস্ত্রি পিটারকে পাঠাল, তাকে বলেছিলাম জানলা রং করার সময় রাস্তা থেকে মই বেয়ে উঠে কালো পাখিদের সংসারটা তুলে দিক। কাছেই যথেষ্ট গাছপালা আছে। সেখানে বাসা করে নেবে ঠিক। রোজ রোজ কাক-ভোরে পাখিদের হল্লা সহ্য হয় না। পিটার কাজ সারতে চলে গেল তখনই।

কিছুক্ষণ বাদে ঘেমে নেয়ে এসে উপস্থিত। গায়ের মস্ত ওভার-অলে ছাপ্‌কা ছাপ্‌কা রং লেগে আছে। ঝাঁকড়া চুলে ফেট্টি বাঁধা। ভাবলাম পাখিদের সংসার উচ্ছেদ করে বখ্‌শিশ নিতে এসেছে। কিন্তু পিটারের চোখে মুখে কেমন যেন অনুযোগের ছায়া। ভাসা ভাসা দীর্ঘ চোখ তুলে বলল—"সরি ম্যাম্‌। আই কুড নট্‌ ডু দ্যাট্‌। ইউ নো, আই ফাউণ্ড সাম টাইনি এগ্‌স্‌ আর স্টীল দেয়ার ! হাউ ক্যান্‌ ইউ থ্রো অ্যাওয়ে দ্য নেস্ট ? হেই ম্যাম্‌, ইউ হ্যাভ ইওর ওন্‌ কিড্‌স্‌ ! রাইট্‌ ?"

বুনো পাখির কটা ডিমসমেত খড়কুটোর বাসা ভেঙে দেওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর এই নিষ্ঠুর পাপকর্মে আমি ওকে প্ররোচিত করতে চাইছিলাম বলে প্রায় ধিক্কার দিয়ে দুম দুম করে নীচে নেমে গিয়েছিল ভয়ংকর চেহারার সেই রঙ-মিস্ত্রি। বখ্‌শিশের পাঁচটা ডলার হাতের মুঠোয় নিয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম জানলার পেছনে ভীত সন্ত্রস্ত ডানার মৃদু ঝাপটের শব্দ···

আমাদের নতুন বাড়িতে এসেছি অনেকক্ষণ। প্রায় বিকেল হয়ে এল। মুভাররা ফার্নিচারগুলো ঠিকঠাক ঘরে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেছে। অনেক পুরোনো ফার্নিচার ফেলে এলাম। নতুন কিছু অর্ডার দেওয়া আছে। ডেলিভারি আসতে সময় লাগবে। ভারি বাক্স কিছু কিছু খুলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে গেছে। তবু এখনও অনেক কাজ বাকি। আমার মেয়ে তৃণা এরই মধ্যে টেনে টেনে বের করেছে পোর্সিলিনের পুতুল আর তুলোভর্তি নকল লোমে তৈরী জন্তু জানোয়ারগুলোকে। তাদের ঝুঁটি ধরে ওপর নীচ করছে ক্রমাগত।

অথচ আমি বসে আছি যেন হাতে কোনো কাজ নেই। শরীর যে খুব ক্লান্ত তাও নয়। আগের অ্যাপার্টমেণ্ট পরিষ্কার করে দিয়ে আসতে কদিন পরিশ্রম গেছে ঠিকই। গতকাল সকাল থেকে উঠে উকিলের অফিসে যাওয়া, বাড়ি কেনার যাবতীয় কাগজ পত্রে সই করা, চাবি নিয়ে এ বাড়িতে এসে ঘরদোর দেখে শুনে নেওয়া, ছোটাছুটি গেছে অবশ্য! কিন্তু এ'কদিন আর রান্না খাওয়ার ভাবনা নেই। অদিতি এবেলা দুজনেরই রান্না করে পাঠাচ্ছে। পাশের বাড়ির ক্যাথী শীল্‌বার্গ এসেছিল কেক আর ফলের বাস্কেট নিয়ে। উল্টো-দিকের মহিলার নামটা কেবলই ভুলে যাচ্ছি। সেও মেয়েদের হাত দিয়ে চীজ্‌, ক্র্যাকার আর ব্যানানা ব্রেড্‌ পাঠিয়ে দিয়েছে। জানতে চেয়েছে আর কিছু লাগবে কিনা। পাড়াটা বেশ ঘরোয়া মনে হচ্ছে।

"আর উই গোয়িং টু হ্যাভ্‌ পীত্‌জা টু নাইট?"—কচি গলায় তৃণার প্রশ্ন। "নো, উই ডোণ্ট্‌। আই লাইক্‌ টু হ্যাভ্‌ চাইনীজ্‌"—রণ ওকে রাগাচ্ছে। লিভিং রুম থেকে সুগত বলে উঠল—"নাঃ, কোথাও খেতে যাবো না আজ। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। তোমাদের আণ্টিরা কি সব খাবার পাঠাচ্ছে তো।"

সুগত এসে পর্যন্ত বাড়ি কেনার গাদা কাগজপত্র নিয়ে বসে আছে। সব জিনিস পড়ে পড়ে ঘণ্টা কাবার করে দেওয়া ওর স্বভাব। আমি এত আইনের মার প্যাঁচ, হিসেব নিকেশ বুঝি না। বিষয় ভাবনার অর্ধেক না বুঝে কেটে গেল জীবনের দীর্ঘ সময়। ইচ্ছাকৃত এরকম নানা অজ্ঞতার জন্যে তেমন লজ্জা সংকোচও হয় না। শুধু সুগতকে মাঝে মাঝে অভয় দিয়ে যাই—প্রয়োজনে মানুষ সব পারে।

ওদের কথাবার্তার ফাঁকে দোতলায় উঠে এলাম। বাইরে বৃষ্টির ভেজা গন্ধ। শোবার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে আছি। বাগানে এলম্‌ গাছের ঝাঁকড়া মাথায় মেঘলা বিকেলের মরা আলো। উইপিং উইলোর ঝুলে থাকা ডালগুলো ঝোড়ো হাওয়ার দমকে চামরের মতো উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সারা বাগান জুড়ে বৃষ্টির ফিশফিশ শব্দ। জলে ভিজছে মেপ্‌ল্‌, পাইন আর ওক গাছের সারি। এ সবই আমাদের হয়ে গেল আজ থেকে। গাছপালা, বাগান, বাড়িঘর যা কিছু। কি অনায়াসে কাগজে কলমে মালিকানা বদল হয়ে যায়। অ্যাঞ্জেলা বাটারওয়ার্থের রেখে যাওয়া প্রতিটি জিনিস এ মুহূর্তে শুধু আমার। তাঁর বাগানের বহু যত্নের গোলাপ গাছে প্রতি মরসুমে যত ফুল ফুটবে, দেবদারু, বার্চ, রডোডেনড্রনের শাখায় যতো পাতা ধরবে। ঝরে যাবে, সেই প্রতিটি পাতার একান্ত অধিকার শুধু আমার। প্রকৃতি কি সম্পত্তির অংশ হয়ে যায়?

ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়লো বাবার চিঠি এসেছে গত সপ্তাহে। আমাদের কলকাতার বাড়ি বিক্রী হবার পর বাবার প্রথম চিঠি। ডায়রীর খাপ থেকে বের করে আবার পড়তে শুরু করেছি···

কল্যাণীয়াসু—

আজ পাঁচ দিন হল আমরা নতুন ভাড়া বাড়িতে এসে উঠেছি। ব্যস্ততার জন্য সময় মতো চিঠি লেখা হয়নি। আমাদের পৈতৃক বাড়িতে গত শুক্রবার শেষবারের মতো রাত্রিবাস করে শনিবার এই বাড়িতে চলে এলাম। মন অত্যন্ত বিষণ্ণ। তোমার মায়ের মনের অবস্থা বুঝতেই পারো। বহু সুখ দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত ঐ বাড়ি শেষপর্যন্ত নিজেদের অধিকারে রাখা গেল না। এ জন্যে কাউকে দোষারোপ করি না। সম্ভবত একান্নবর্তী পরিবারে আমরা আর সেরকম বন্ধন অনুভব করতাম না। তাই অতিরিক্ত লাভের আশায় বসতবাড়ি বিক্রী করে দিলাম। অথচ আর্থিক দিক থেকে খুব যে কিছু লাভ হল, এমনও নয়। ভাগের অবশিষ্ট নিয়ে অন্তত ঐ অঞ্চলে আর ফ্ল্যাট কেনা যাবে না। তোমাকে এত সব কথা লিখতে ইচ্ছা হয় না। প্রবাসে অযথা মন ভারাক্রান্ত হবে। তবু না লিখেও পারলাম না। এর পরের বার যখন দেশে আসবে, মনকে প্রস্তুত রেখো। তোমার শৈশবের পরিবেশটি আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অবশ্য আমাদের এ বাড়িটি ভালোই। জলের সমস্যা নেই। তবে পাড়াটি অন্য প্রকার। আমরা সাবেক বালীগঞ্জের মানুষ, এদিকের যাদবপুর অঞ্চলে বিশেষ কাউকে চিনি না। আশা করি, ক্রমশ চেনা পরিচয় হবে—।

আমাদের আমেরিকায় বাড়ি কেনার কথা বাবাকে এখনও জানাইনি। অথচ জানি বাবা খুবই খুশী হবেন। কিন্তু যখন এ বাড়ি কেনার তোড়জোড় করছিলাম তখন কেবলই মনে হচ্ছিলো, সময়টা বড় অদ্ভুত হয়ে গেল। আমাদের কলকাতার বসতবাড়ি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে, নানা অশান্তিতে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। বাবার শরীর অসুস্থ, নানা উদ্বেগে মন বিষণ্ণ। এ অবস্থায় এখানে আমাদের বড়ো বাড়ি কেনার খবর, সম্পত্তির এত বিশদ বিবরণ আমি জানাই কেমন করে? কি যে অপরাধী মনে হচ্ছিলো নিজেকে। দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে স্বার্থপর হয়ে যাইনি কি? কলকাতায় ঐ বাড়িটা তো চেষ্টা করলে কিনে রাখতে পারতাম। বাবাকে থাকতে বলতে পারতাম সেখানে। বাকি অংশ ভাড়া দেওয়া যেত অনায়াসে। এদেশে অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস কিনে ডলার ইনভেস্ট্ করছে না বাঙালীরা? এ না হয় কলকাতায় একটা ইনভেস্ট্মেণ্ট থাকতো। কিন্তু সবই ভেবেছি শেষকালে এবং প্রায় নিজের মনে মনে। ততোদিনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সুগতরও দ্বিধা ছিল। কলকাতায় ডলার ইনভেস্ট্ করার এ মুহূর্তে কোনো যুক্তি নেই ওর কাছে। এদেশে বিষয় সম্পত্তি বাড়ানো, দুই ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতে ভালো কলেজে পড়ানোর জন্যে মোটারকম সঞ্চয় এগুলোই আপাতত প্রধান খরচ। তাছাড়া কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি আছে ওদের। ঝোঁকের মাথায় এরকম সিদ্ধান্ত কি নেওয়া যায়? আর ঐ বাড়ি কেনা মানে জ্যাঠা, কাকাদের ভিটে মাটি ছেড়ে যাবার নোটিশ নেওয়া। আমার মন আমাকে 'প্র্যাকটিক্যাল্' হতে বলেছিল। আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না বুঝে ক্রমশ ভেবে নিয়েছিলাম আমার কিছুই করণীয় নেই।

আসলে আমি সহজে কোনো সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারি না। আমার খালি ভাবনা হয় কোনো উদ্যোগ নেওয়া মানেই একটা বড় রকম পরিশ্রম। নিরুদ্বেগ জীবনের মধ্যে অযথা টানাপোড়েন এবং অসম্ভব মানসিক চাপকে যেচে আমন্ত্রণ জানানো। এ আমাদের পরিবারের ধর্ম। পরিস্থিতি বদলানোর জন্যে কোনো রকম চ্যালেঞ্জ রক্তে নেই। আমি সে জড়তা কাটিয়ে উঠবো কি করে?

ভেবেছিলাম নতুন বাড়িতে এসে সংক্ষেপে সব লিখে জানাবো বাবাকে। এই বিষণ্ণ বিকেলে বাবার চিঠি হাতে নিয়ে উত্তর লেখার কথা ভাবতে ভাবতে কান্নায় গলা বুঁজে এল।

ঠিক একবছর বাদে কলকাতায় পৌঁছেছিলাম। এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি যাবার সময় সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হয়েছিল আমাদের বাড়িটা ছাড়িয়ে চলে গেলাম। সেই মুহূর্তে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মৃদু স্বরে বলেছিলেন—"কোথা থেকে কোথায় চলে গেলাম।"

প্রসঙ্গ বদলাতে আমার ছোট ভাই অশীন বলেছিল—"নতুন পাড়াটা খুব শান্ত, জানিস? আগের বাড়িতে তো লেক মার্কেটের হল্লায় ভোর থেকে ঘুম ভেঙে যেতো।"

বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—"আমাদের বাড়িটা যারা কিনেছে, তারা কি শেষপর্যন্ত নার্সিং হোম করেছে? সেরকমই কথা ছিল না?"

বাবা বলেছিলেন—"না, না, কোথায় নার্সিং হোম? নিজেরা চারতলায় থাকেন। তিনতলা একটা অফিসকে ভাড়া দিয়েছেন। আর একতলা দোতলা মিলিয়ে বিয়েবাড়ি ভাড়া দেন। আজকাল বিয়েবাড়িতে ভীষণ রোজগার।"

সেবার দু মাস কলকাতায় ছিলাম। একদিন পরাশর রোডে গেলাম স্কুলের বন্ধু সুতপার বাড়ি। ফেরার সময় কি মনে হল, যাবো না যাবো না করেও শেষপর্যন্ত পাশের রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। দু পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছি। এ বারান্দা ও বারান্দা থেকে চেনা মুখের ডাকাডাকি, রকের সামনে চেয়ার পেতে বসা প্রৌঢ় মানুষদের স্নেহদৃষ্টির মাঝখান দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হলুদ রং-এর বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোহার ভারি গেটে আর সবুজ রং নেই। স্টীলের পাত বসানো কেমন অন্য রকম চেহারা হয়ে গেছে। ছোটবেলায় ঐ গেটের রেলিং-এর ফাঁকে পা রেখে রেখে গেট ধরে কতো দুলেছি। এদের বাড়িতে কি কোনো শিশু আছে? পেতলের ফলকে দাদুর নাম লেখা ছিল। এখনকার মালিক কোনো রায়চৌধুরী নিশ্চয়ই। তাঁরই নাম লেখা। মাতৃভবন নামটা অবশ্য আজও লেখা আছে বাঁ ধারের ফলকের গায়ে। ভেতরে বাগানের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে হু হু করে উঠলো। সেই গন্ধরাজ, শিউলী, টগর আর কাঞ্চন গাছ তেমনই ভাবে দু ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"আপনাকে বাবা ডাকছেন"—পেছন ফিরে দেখি তেরো নম্বরের ডাক্তার কাকার ছেলে বাচ্চু। এই বাচ্চুকে আমরা ছোটবেলায় পেরাম্বুলেটারে ঠেলে ঠেলে কতদিন লেকে বেড়াতে নিয়ে গেছি।

সেদিন তেরো নম্বরে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। পাড়ার সবাইয়ের মুখে শুধু এক কথা—"তোরা পাড়া ছেড়ে চলে গেলি। কতকালের সম্পর্ক আমাদের। এখন বাড়িটা দেখি আর কষ্ট হয়।"

ফেরার পথে আবার বাড়িটার দিকে তাকালাম। জানি, আর কোনোদিন ঐ গেট খুলে বাগানের চেনা গাছগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া হবে না। ভেতরের প্রতিটি ইঁট পাথর আমার শৈশবের পায়ের ছাপ বুকে ধরে আছে। ঐ ডালিম গাছের নীচে মাটির তলায় চোদ্দ বছরের পোষা কুকুর জিম্‌কে মারা যাবার পর পুঁতে দিয়েছিলাম। পেছনের পেয়ারা গাছের ছায়ায় আমরা কোর্ট কেটে এক্কা দোক্কা খেলতাম।···ঘোর ভাঙতে মনে হল যেন এ জন্মে নয়, অন্য কোনো জন্মে এখানে আমাদের বসবাস ছিল।

ঠিক আমেরিকায় ফেরার মুখে হঠাৎ বাবা মারা গেলেন, তাঁর শেষ সময়ে পাশে থাকা আমার ভাগ্যে ছিল। বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী শেষ যাত্রায় কাঁচের গাড়িটা মাতৃভবনের সামনে কিছুক্ষণের জন্যে থামানো হয়েছিল। ঐ পাড়া থেকে শ্মশানের দূরত্ব বেশী নয়। পুরোনো পাড়ার অনেকে শ্মশানযাত্রী হয়েছিলেন।

এখানে ফেরার পর বিষাদের নীল ঘরে কতদিন যে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকলাম। ইদানীং বারবার একই স্বপ্ন দেখে রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নে দেখি, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। আমার সারা শরীর জলে ভেসে যাচ্ছে। বারবার লোহার গেট ঠেলে যে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছি তার জানলায় জানলায় অস্পষ্ট অপরিচিত সব মুখ। আমি শুধু আর্তস্বরে ডাকি —খুলে দাও, দরজা খুলে দাও···দরজা খোলে না। গেটের রেলিংগুলো কঠিন ভাবে বুকের মধ্যে বিঁধতে থাকে। যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে যায়।

তবু সময়ের কি আশ্চর্য ক্ষমতা। আমাকে স্পর্শকাতরতা আর স্মৃতি-চারণের নড়বড়ে ভূমি থেকে ঠেলে তুলে দিয়ে গেল বাস্তবের শক্ত জমিতে। শোক, স্মৃতি, অনুষঙ্গ সবই থাকে অবচেতনের স্তরে—এই জেনে নিজের সংসারের চালচিত্র সাজানোয় আমি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

আবার দু বছর বাদে কলকাতায় গেলাম খুড়তুতো বোন এনার বিয়েতে। ছোটকাকার বেহালার ভাড়া বাড়িতেই বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে বাড়িতে সবচেয়ে বেশী অবাক হলাম জেনে যে বৌভাত উপলক্ষে বরপক্ষ 'মাতৃভবন' ভাড়া নিয়েছে।

বৌভাতের সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে দেখলাম গেটের ওপর একই ভাবে নহবৎ বসেছে, যেমন বসতো আমাদের সময়ে। ভেতরে দু পাশে সার সার চেয়ার পাতা। গাড়িবারান্দার জায়গাটাও অবিকল আগের মতো আছে। সিঁড়ির ধাপ, ভেতরের দালান কিছুই বদলায়নি? দোতলায় সিঁড়ির মুখে একটা ল্যান্ডিং। সেখানকার দেওয়াল থেকে সার সার ছবি ঝোলানো থাকতো দোতলা পর্যন্ত। আমাদের পূর্বপুরুষদের গোঁফওলা, কোটের পকেটে চেন ঘড়ি লাগানো গম্ভীর মুখের সেই সাদা কালো মস্ত ছবিগুলো কোথায় গেল কে

জানে ? দোতলার দালানের দেওয়ালগুলো যেন খাঁ খাঁ করছে। ঠাকুরমার ঘর-খানা ছিল সবচেয়ে বড়। সেই বিশাল খাট, আয়না বসানো আলমারি, তিন-পাল্লার ড্রেসিং টেবিল, কোথাও কিছুই নেই। ফাঁকা ঘরে ফরাস পাতা। এক কোণে সিংহাসনের মতো চেয়ার সাজিয়ে এনাকে বসানো হয়েছে। ফরাসে বসে আছেন আমার মা, জেঠীমা, কাকীমারা। কারুর কোনো উচ্ছ্বাস নেই। বিয়ে বাড়িতে এসেও যেন স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। এনা শুধু একবার ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—"আমিই চেয়েছিলাম এ বাড়িতে বৌভাত হোক। এখন মনে হচ্ছে, না চাইলেই হত।" আমিও শুনেছি, 'মাতৃভবন' থেকে এনার বিয়ে হলো না বলে ওর বর অরিন্দম এখানে বৌভাতের ব্যবস্থা করেছে।

ঘরটায় বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। বারান্দায় বেরিয়ে দেখি আমার জ্যাঠামশাই আপন মনে তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন। জেঠতুত ভাই বলল—"বাবা, ওদিকে যেও না। ওপরে অফিস। দেখছো না কোলাপসিব্‌ল্‌ গেট বন্ধ আছে।" জ্যাঠামশাই ধীর পায়ে নীচে নেমে এলেন।

হঠাৎ কানে এল—"আমাকে আর দোতলা চিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে না। এ তো আমারই বাপের বাড়ি।"—পিসিমা উঠে আসছেন রেলিং ধরে ধরে। বরপক্ষের কারা যেন ওঁকে দোতলা চিনিয়ে নিয়ে আসছিল।

পিসিমা ধীরে ধীরে ঠাকুমার ঘরে ঢুকলেন। যেন অবাক হয়ে ঘরের দেওয়াল, ছাদ দেখতে দেখতে এনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মা, কাকীমারা ওঁকে বসার জায়গা করে দিচ্ছেন। ঘর ভর্তি আরও কত অপরিচিত মানুষ। পিসিমা ভাঙা ভাঙা স্বরে এনাকে বললেন—"এ বড় আনন্দের ঘর ছিল রে। কতো বাসর জাগা, কতো গান গাওয়া। আবার তুইও এ ঘরেই রাণী সেজে বসে আছিস—" পিসিমা দু হাতে ওর গাল ধরে আদর করছেন।

অনেক রাতে বিয়ে বাড়ির বাইরে এলাম। বৃষ্টিতে সারা শহর ভেসে যাচ্ছে। সুগত কোনোরকমে ছাতা জোগাড় করে তৃণা আর রণকে গাড়িতে পৌঁছতে গেল। বলে গেল আমার জন্য ছাতা নিয়ে ফিরে আসবে।

সামনে আমার সংসারের সাজানো চালচিত্র। শেষবারের মতো পেছন ফিরে দেখলাম। জলের ধারায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। বিশাল বাড়ির জানলায় জানলায় অস্পষ্ট অপরিচিত নামহীন মুখ। লোহার গেট হাট করে খোলা। তবু জানি উন্মুক্ত নয়। অবিশ্রাম জলের শব্দের মাঝে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের গভীরে শুনতে পাই আমার অথবা আত্মজনের প্রতিধ্বনি—দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও।

॥ ৬ ॥

প্রতিদিন বাড়ি ফিরে ডাকবাক্স হাতড়ে কিছু ব্যক্তিগত চিঠি আশা করি। এবং প্রায় দিনই আবিষ্কার করি কোথাও কেউ আমাকে ঠিক মতো মনে রাখে না। মানুষের অনীহা ও বিস্মরণ প্রসঙ্গে কয়েক মুহূর্ত বিষণ্ণ হয়ে থাকি। তারপর চায়ের কাপ হাতে টেলিভিশনের সামনে বসে ঘটনাটা ভুলে যাই।

ইদানীং আমাকে একমাত্র মনে রেখেছে আমেরিকার আদালত। গতকালও একরাশ হাবিজাবি কাগজের সঙ্গে ডাকে এসেছে প্যাসেইক্ কাউণ্টি কোর্ট হাউসের পাতলা খাম। চিঠিখানা খোলার আগেই বুঝেছি আর আমার জুরী ডিউটি থেকে রেহাই নেই।

এর আগে শেরিফের অফিস থেকে যতবার ডাক এসেছে, নানা ছুতো-নাতায় কাটিয়ে দিয়েছি। একবার তো ওয়াশিংটনে বঙ্গ সম্মেলনে নাটক করতে যাবার মুখে সমন ধরিয়েছিল। বিরাট ইণ্ডিয়ান কনফারেন্সে আমার 'কাল-চারাল কমিটমেণ্ট' আছে জানিয়ে কোর্টে চিঠি লিখেছিলাম। আমেরিকার কোর্টে জুরী হওয়ার মতোই ইন্ডিয়ান হেরিটেজের পতাকা কাঁধে নিয়ে দলের সঙ্গে হেঁটে চলাও যে আমাদের মতো এথ্নিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রায় দায়বদ্ধতা বিশেষ, আর ভবিষ্যতে যে আমি অবশ্যই জুরীর আসনও অলংকৃত করব—এমন সব লম্বা লম্বা কথা সাজিয়ে চিঠিখানা লিখেছিলাম। সেবার ভুজুং ভাজুং দিয়ে খুব কাজ হয়েছিল। কিন্তু মাস ছয়েক বাদে দেখি ডাকবাক্সে আবার সেই পাতলা খাম। এদিকে ততদিনে কলকাতা থেকে একদল বন্ধু আসার দিনক্ষণ পাকা হয়ে গেছে। তাদের তো আমি কোর্টঘর দেখাতে পারি না।

ঐ সময় লাগাতার এক-দু সপ্তাহ ধরে জুরী ডিউটিতে ভিড়ে গেলে কে ওদের নায়গ্রা ফলস্ নিয়ে যাবে? এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং আর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টারের মাথাতেই বা চড়াবে কে? অতএব আবার সেই উদ্ভাবনী শক্তির সামান্য প্রয়োগ করে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখতে হয়—বিশিষ্ট ভারতীয় ডেলি-গেটদের গাইডেড টুর দেবার প্রয়োজনে মহামান্য আদালত যেন এবারের মতো আমার অনুপস্থিতি মাপ করে দেন। সেবারেও এক চিঠিতেই কাজ হয়েছিল।

কিন্তু এবার আর কোনো ধানাইপানাই চলবে না। শেষে কি আদালত অবমাননার দায়ে পড়ব? আমি ডাক্তার বা পুলিস নই। অ্যাম্বুলেন্স বা ফায়ার ট্রাকও চালাই না যে এমার্জেন্সি সার্ভিস করি বলে ছেড়ে দেবে। কত বড় বড় অফিসের কর্তাদের ঝুঁটি ধরে নিয়ে গিয়ে জুরীর বেঞ্চে বসাচ্ছে আর আমার মতো অকাজের মানুষকে বারবার ছেড়ে দেবে? সত্যি বলতে কি, আপত্তি করা উচিতও না। কাজটা তো সম্মানেরই। খয়েরি চামড়া নিয়েও যে

আমি এদেশে নেহাৎ হেঁজিপেঁজি মানুষ নই, আমেরিকান নাগরিক হিসেবে আমার বিচারবুদ্ধির ওপরে দেশের ভরসা আছে—এ ধারণাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার রোজ পাঁচ ডলার করে লাঞ্চের জন্যে দেবে। গাড়ির তেলের দাম মিটিয়ে দেবে। কোর্ট পাড়ার পার্কিং লটে ফ্রী পার্কিং। এত সব সদ্-বিবেচনার পরে 'না' বলাও মুশকিল। আর অভিজ্ঞতার ব্যাপারটাও ফেলনা নয়। পেটিট্ জুরী হবো মানে নৃশংস খুনীটুনিকে নাগালের মধ্যে না পেলেও চোর, ছ্যাঁচোড়, গুণ্ডা, বদমাইসদের মামলা থেকে শুরু করে মানহানি, দুর্ঘটনা, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে হানাহানি—সবই আমাদের এক্তিয়ারে পড়বে। তাই বা কম কি। গা হিম করা উত্তেজনা না থাকলেও রায় দেবার আগে পর্যন্ত বুকে জুরীর ব্যাজ্ এঁটে কোর্টপাড়ায় চাল মেরে ঘোরা যাবে। মামলা ফৌজদারি না আবগারি কে জানতে পারছে ?

কিন্তু এত সব যুক্তি সাজিয়েও নিজেই নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে পারছি না। আসলে ঐ প্যাটারসন্ শহরটায় যাবার নামে গায়ে জ্বর আসে। খবরের কাগজ আর পুলিসের রিপোর্ট অনুযায়ী জায়গাটাই মার্কামারা। এ কথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে কালোদের সম্পর্কে ভীতি আমি ছাড়তে পারিনি। সংস্পর্শের অভাবও একটা কারণ হয়ত। কবে নিউইয়র্কে থাকতাম, সে প্রায় ইতিহাস হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল শহরতলির নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে হতে এমন হয়েছে যে প্যাটারসনের কালোপাড়ায় গেলে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ঘটনার শিকার হতে পারি। অথচ এমন নয় ঐ অঞ্চলে, বিশেষ করে কোর্টের পাড়ায় সব সময় চুরি, ছিনতাই রেপ বা খুনখারাপি চলছে। দিনদুপুরে এত কিছু ঘটেও না। কিন্তু আমি তো আর গাড়ি নিয়ে উড়ে যাব না। যে সব রাস্তা দিয়ে যেতে হবে আর বিকেল বেলা কোর্ট ভাঙলে দীর্ঘ সময় ধরে ফিরতে হবে, তার দু ধারে শুধুই কালোপট্টি, মদের দোকান, গো গো ড্যানসিং বার, কারখানা আর ভাঙাচোরা অ্যাপার্টমেণ্ট। ট্র্যাফিক লাইটে গাড়ি থেমে থাকলে অস্বস্তি হয়। দেখি বীয়র ক্যান্ হাতে দঙ্গল দঙ্গল ছেলে আশেপাশে হল্লা করছে। দরকার পড়লে মাঝে মাঝে যেতে তো হয়। মামলার জন্যেই যাই। দোভাষীর কাজ করে কিছু রোজগারও হয়।

উত্তর নিউজার্সিতে ওক্সানা স্টেরাংকার দোভাষী জোগান দেবার ব্যবসা বেশ জমজমাট। নাম দিয়েছে—অ্যাক্শন ট্র্যানস্লেশন ব্যুরো। কোর্টে মামলার জন্যে বিশেষ করে ইংরিজি না জানা আসামী, সাক্ষী, ফরিয়াদি সকলের জন্যে সবরকম ভাষা জানা দোভাষী পাঠায় ওক্সানা। প্রায় সব ভাষারই দোভাষী মজুত আছে ওর স্টকে। আমাকে হিন্দী, বাংলা আর ওড়িয়া দোভাষীর কাজ দিয়ে মাঝে মাঝে কোর্টে নয়ত ও পাড়াতেই উকিলের চেম্বারে চালান করে দেয়। খুচরো কাজ। কখনো এক দিন দু দিনেই মিটে যায় একেকটা মামলা। কখনো বার কতক যেতে হয়। বেশীর ভাগ ডাক আসে বাংলাদেশীদের মামলায়।

ইলিয়াসদের কথা মনে পড়ছে। কেস পড়েছিল উকিল জন্ জিয়ার্ডিলোর

কাছে। মামলার নাম—ইলিয়াস ভার্সেস ইলিয়াস। বাংলাদেশী দুই ভাই একজন অন্যজনের নামে মামলা ঠুকে দিয়েছে। স্বল্পশিক্ষিত ইলিয়াস-ভাইদের ইংরিজী উচ্চারণ আমেরিকান উকিলরা বুঝতে পারছে না। ইলিয়াসরাও মোটে বুঝছে না মার্কিনী উকিলদের অ্যাকসেণ্ট। ডিফেন্স থেকে প্রসিকিউশন —সব মিলে হল্লা জুড়েছে দোভাষী ছাড়া অসম্ভব। ওকসানা স্টেরাংকা আমায় চালান করে দিল।

প্রায় একক অভিনয়ের মতো ব্যাপারস্যাপার। শপথটপথ নিয়ে কর্তৃবাচ্যে কথা বলতে হবে। এই মুহূর্তে আসামী তো, পরমুহূর্তে ফরিয়াদি। নিমেষে উকিল সেজে গেলাম। মজা মন্দ নয়। কিন্তু একেবারে হুবহু ভাষান্তর করতে হবে। একটি শব্দও অদলবদল করা চলবে না। আবার দরকার পড়লে ওদের দেখাদেখি অঙ্গভঙ্গীও করে দেখাতে হবে। যতদিন পর্যন্ত মামলা চলবে ততোদিন পর্যন্ত ইলিয়াস ভাইদের সঙ্গে অন্য কোনো কথাবার্তা বলা যাবে না। ভুলে গল্প করে ফেললে তক্ষুণি তার অনুবাদ করে দুপক্ষের উকিলকে শুনিয়ে দিতে হবে। একটানা অনুবাদ করলে গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। তাই ফাঁকে ফাঁকে হাত দিয়ে থামিয়ে দিয়ে একটু একটু করে বলে নিলেই ভাল। আসামী বা ফরিয়াদির আবেগটাবেগ এসে গেলে আমাকেও খুব কাটখোট্টা থাকলে চলবে না। কথার সুরে আবেদন আনতে হবে। আর আগে থেকে চেনা-শোনা থাকলে এদের দোভাষী হওয়া যাবে না। এতসব জেনে বুঝে নিয়ে আমি চলে গেলাম কোর্ট থেকে প্যাটারসনে উকিলের চেম্বারে। সেখানেই প্রথম দিনের কাজ।

চেম্বারে পৌঁছে দেখলাম দু পক্ষের উকিল আর কোর্ট থেকে মামলা রেকর্ড করতে আসা একটি মেয়ে কফি খাচ্ছে বসে বসে। বাদী, বিবাদীর তখনও দেখা নেই। উকিল জিয়ার্ডিলো বললেন—"আপনি কি বাংলাদেশী?"

—"না, ভারতীয়। তবে আমার মাতৃভাষা বাংলা।" মনে মনে ভাবছিলাম ঢাকা, ফরিদপুর পর্যন্ত চালিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু ইলিয়াসরা যদি সিলেট কিংবা চট্টগ্রামের লোক হয়, তবে আমারই দোভাষী লাগবে তাদের কথা বুঝতে। দেখা যাক।

ইলিয়াসদের আসার কোনো লক্ষণ নেই। বসে বসে ঘড়ি দেখছিলাম। দশটা বেজে গেছে কোন্‌কালে। এক উকিল বললেন—"এদের একদম সময় জ্ঞান নেই। প্রত্যেকবার দেরী করবে।"

ঠিক বুঝতে পারলাম না এরা বলতে কাদের বোঝাচ্ছে। আমরা খয়েরি চামড়ার লোকেরা? নাকি এই দুই ভাই-ই একটু লেট লতিফ্? এর মধ্যে এক উকিল পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটু পরে বাইরে থেকে দরজার নব ঘুরিয়ে ঢুকল নিঃসন্দেহে কোনো এক ইলিয়াস। অতি সাধারণ জামাকাপড়, অবিন্যস্ত চুল, ক্লান্ত চেহারার যুবকটি চোখে চোখ পড়তে সালাম জানালো। উকিলের এক ধমক—"আবার তুমি

লেট্ ? আমরা কতক্ষণ বসে আছি। তোমার বড় ভায়েরও তো দেখা নেই। নাও, ওই মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলে দ্যাখো কেউ কারুর কথা বুঝতে পারছ কিনা। ইনি তো আবার নাকি তোমার দেশের লোকও নন।"

ছোট ইলিয়াস হেসে বলল—"ভাবীজী কোইথ্যিকা আইসেন ? দ্যাশ কোথায় ? এহানে বাসা কুন জাগায় ?"

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম—"ঠিক এইভাবে কথা বলবেন। সিলেট চাটগাঁ বললে একবর্ণও বুঝতে পারবো না কিন্তু।"

শুনে ইলিয়াসের এক গাল হাসি—"জী এমনেই বলবো।" উকিলের প্রশ্ন—"হ্যাঁ, এবার আমাকে ইংরিজিতে বলুন, ইলিয়াস আর আপনার মধ্যে কি কথা হল ?"

আমি সব বলার পর মনে হল সাহেব সন্তুষ্ট হয়েছে। এদিকে বড় ভাই এর পাত্তা নেই দেখে ছোট ভাই আবার গল্প ফেঁদেছে—"ভাবীজী, দাদায় কি কাজকাম করেন ? ডাক্তার বুঝি ?"

আমার ওর সঙ্গে অকারণ কথা বলা বারণ। অথচ বাধা দিতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু উকিল ভারী সজাগ—"কি ? কি কথা হচ্ছে আপনাদের ?" আমি আবার অনুবাদ করলাম। হঠাৎ উকিল নড়ে চড়ে বসে বললেন—"ব্যাপার কি ? ইলিয়াস তখন থেকে আপনাকে সিসটার ইন্ ল বলে ডাকছে কেন ? ডু ইউ নো ইচ্ আদার ? দেন ইউ শুড্ টেল্ আস্।"

আমি একটু রেগে বললাম, "না। এই প্রথম দুজনে দুজনকে দেখছি। ওটা আমাদের ভদ্রতার সম্বোধন। আমি ওর আত্মীয় বা চেনা হলে ও আমার স্বামী কি করেন জিজ্ঞেস করত না। আর আমিও এই কেসে ইণ্টারপ্রেটার হতাম না।"

সাহেব সামান্য হেসে কাগজপত্রে মাথা ঝোঁকালেন। ইলিয়াস ভুরু কুঁচকে বলে উঠল—"কি কইত্যাসে কি ? ও হালা তো আমার ভাইজানের উকিল। একের নম্বর শয়তান। দ্যাখসে্ন না, আমারে ক্যামনে হ্যারাস্ করত্যাসে।"

আমি প্রমাদ গুণলাম। এক্ষুণি তো অনুবাদ করতে হবে। উকিল শ্যেন্-দৃষ্টিতে দেখছেন। ঢোঁক গিলে বললাম—"হি ইজ্ মাই ব্রাদার্স লইয়ার। আই হ্যাভ্ সামওয়ান এলস্।" বাকিটা চেপে গেলাম এই ভেবে যে এখনও মামলার শুনানী শুরু হয়নি। 'সদা সত্য কথা বলিব'র শপথও নিইনি। ভাগ্যক্রমে 'হ্যারাস্' কথাটা এমনই দিশী উচ্চারণে ছেড়েছে ইলিয়াস যে সাহেবেরই সাধ্য নেই তাকে মাতৃভাষা বলে চিনতে পারে। আর আগ বাড়িয়ে ওর বিরোধী পক্ষের উকিলকে "নাম্বার ওয়ান স্টোন" বলে কেস গুবলেট করব নাকি শেষে ?

এরপর মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করলাম। ইলিয়াস উৎসাহ না পেয়ে গুটি গুটি বারান্দায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, অন্য ঘর থেকে ওর নিজের উকিল এসে ডেকে নিয়ে গেলেন।

হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল বড় ইলিয়াস। মাঝ বয়সী রোগা ক্ষয়াটে

চেহারা। মাথার চুল বাবরি ধরনের। কেমন যেন পোড় খাওয়া লড়াকু গোছের হাবভাব। দু-ভাই-এর চেহারা আর জামাকাপড়ের মধ্যে এমন এক দীনতার ছাপ, মনে হয় না এদেশের সচ্ছল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বাঙালীদের সঙ্গে এদের কোথাও কোনো মিল আছে।

বড় ইলিয়াস আমাকে তেমন আমল দিল না। ওর নিজের উকিল যখন আলাপ করিয়ে দিলেন তখন শুধু বলল—"ইংরাজী আমি ভালোই জানি। তবু যে ক্যান্ আপনারে আইতে কইসে।" হয়ত আঁতে ঘা লেগেছে। বললাম —"বোধহয় আপনার ভাই-এর জন্যে দরকার হবে।"

ওর উকিল অনুবাদ শুনে বললেন—"তোমার ইংরিজি আমি যাও বা কিছু বুঝতে পারি কোর্টের রিপোর্টার তো একবর্ণও বোঝে না। আগের দিনই বলে গেছে ইণ্টারপ্রেটার চাই।"

একটা মস্ত ঘরে সবাই মিলে গিয়ে ঢুকলাম। লম্বা টেবিলের দুধারে ইলিয়াস ব্রাদার্স যুযুধান দুই পক্ষ মুখোমুখি বসে গেছে। যার যার পাশে নিজের নিজের উকিল। টেবিলের এক প্রান্তে আমি। অন্য প্রান্তে টাইপ রাইটার, টেপরেকর্ডার নিয়ে রেকর্ড তৈরি করতে বসেছে সেই মেয়েটি। ইলিয়াসদের সঙ্গে হাত তুলে শপথ নিলাম। তারপর শুনানী শুরু হল।

প্রথমে বড় ইলিয়াসকে জেরা শুরু করলেন ছোটর উকিল। যতদূর বুঝলাম বড়ভাই বেশ ক বছর আগে বাংলাদেশী জাহাজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিউ-ইয়র্কে থেকে গিয়েছিল। বাংলাদেশী রেস্তোরাঁয় কাজ করে, নানা কোম্পানীতে ছোটখাটো চাকরি করে শেষ পর্যন্ত একটা কারখানায় কাজ পেয়েছে। মাইনের কাগজপত্রে দেখলাম বছরে চোদ্দ হাজার ডলার রোজগার। এদেশে জীবনধারণ আর সংসার প্রতিপালনের পক্ষে খুবই সামান্য। অথচ প্যাটারসন্ শহরে একটা ছোট বাড়ি আছে নিজের। আগে নিউইয়র্কে অ্যাপার্টমেণ্টে থাকতে দেশ থেকে দুই ভাইকে আনিয়েছিল। বরাবর একসঙ্গে থেকেছে। এখন ভাইরা যা হোক নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। বড় ইলিয়াস চাইছে এবার ওরা আলাদা হয়ে যাক। তাহলে নিজের বাড়ির একটা ঘর ভাড়া দিলে ওর নিজের সংসার চালানোর সুবিধে হবে। কিন্তু ভায়েরা বাড়ি ছাড়বে না। ওদের বক্তব্য, ঐ বাড়ি কেনার সময় বড়ভাই ওদের জমানো ডলার সব নিয়ে নিয়েছিল। তার ওপর প্রত্যেক মাসে বাড়ি ভাড়ার মতো ডলার আদায় করেছে ওদের কাছে। এখন বেশী ভাড়া পাওয়ার লোভে ভাইদের তাড়াতে চাইছে। ওরা কিছুতেই বাড়ি ছাড়বে না। ও বাড়িতে ওদের দাবী আছে।

ছোট ভাইয়ের উকিল প্রমাণ করতে চাইছেন বড় ইলিয়াসের পক্ষে সামান্য রোজগারে বাড়ি কেনা অসম্ভব। কিভাবে প্রথমবার ডাউন পেমেণ্টের নগদ ডলার জোগাড় করেছিল, তার হিসেব দেখতে চাইছেন। বড় ইলিয়াস তৈরি হয়ে এসেছে। বলে গেল কিভাবে বাঁধা মাইনের চাকরির ওপরেও নানা ছুটকো-ছাট্কা খাটুনির কাজ করে ডলার জমাত। তবু কখনো ভায়েদের কাছ থেকে

বাড়ি কেনার জন্যে ডলার চায়নি। শীতকালে লোকের বাড়িতে ড্রাইভ ওয়ের বরফ পরিষ্কার করেছে। ডেলিভারি ম্যান হয়ে দোকানে বাজারে ভারী ভারী মাল পৌঁছে দিয়েছে। রাতে রেস্তোরাঁতে বাসন ধোয়া, কখনো উইক এণ্ডে বাংলাদেশী দোকানে কাজ করা—বহু পরিশ্রম করে তবে ঐ বাড়ি কেনার আগাম কিস্তির ডলার জমিয়েছিল।

আমি এক নাগাড়ে অনুবাদ করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কানে এল ছোট ইলিয়াসের টিপ্পনী—"সব মিছা কথা। মাসে মাসে আমাগো টাকা মারতাসে। আমরা কতকাল দ্যাশে যাইতে পারি নাই। সে দুইবার দ্যাশ্ ঘুইরা আসছে। সব আমাগো টাকা মাইর‍্যা।"

আমি ঘাবড়ে গেলাম। এখন তো বড়র জেরা চলছে। ছোটর কথা বলার ফলে সব গুলিয়ে গেল। বড়র পক্ষের উকিল জানতে চাইলেন ছোট কি ফোড়ন কেটেছে? "টাকা মারতাসে"র ইংরিজি করতে গিয়ে হয়রান হয়ে গেলাম। শোনার পর বড়র উকিল ছোট ইলিয়াসকে এক ধমক। তখন ছোটর উকিল রেগে কাঁই। বলে—"তুমি আমার ক্লায়েণ্টকে ইনসাল্ট করছো?" বড়র উকিল বলে—"আমার ক্লায়েণ্টের ক্রস একজামিনেশনের সময় সাইড টক চলবে না।" হঠাৎ দুই উকিলে প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। টাইপিস্ট কাজ বন্ধ করে বসে আছে। দুই ইলিয়াস কেউ কারুর চোখে চোখ রাখছে না। আমি বুঝতেই পারছি না দু'জনের মধ্যে কে সত্যি কথা বলছে। অনুমান করছিলাম, দু' জনেরই কিছু কিছু কথা বোধহয় ঠিক।

কিছুক্ষণ চিৎকার, টেবিলে ঘুসি মারার পর দুই উকিল আবার শান্ত হলেন। ক্রস্ এক্জামিনেশন চলতে লাগল। এবার বড় ইলিয়াস যে লুকিয়ে বাড়তি রোজগার করত আর ইণ্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিসে তার হিসেব না দেখিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দিত সেই নিয়ে ছোটর উকিলের জেরা শুরু হল। বড় ইলিয়াস প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত দেখে তার নিজের উকিল আবার হাল ধরতে এলেন। আবার দুই উকিলে ঝটাপটি চিৎকার। শান্ত হল বড় ইলিয়াসের দুঃখের বারমাস্যা। এইভাবে কেটে গেল অনেকক্ষণ। ছোট ইলিয়াস বড়র কথা শুনতে শুনতে আরও দুবার "ফের মিছা কথা কয়" বলে ফেলে শেষে নিজের উকিলের কাছেই দাবড়ানি খেল। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে লাগল।

আমি তোতাপাখির মতো তার দাদার বয়ান আউড়ে চলেছিলাম—"আই স্পেণ্ট অলমোস্ট এভ্রী সিঙ্গল্ পেনী ফর মাই ব্রাদার্স। দ্যাটস্ হোয়াই আই কুড্ নট গো টু কলেজ ফর ফার্দার স্টাডিজ..."

ছোট ইলিয়াস আবার ফিশফিশ করছিল—"হঃ, দ্যাশে সে ইশকুলই পাশ দ্যায় নাই। তয় কলেজে যাইবো।"

সেদিন বেশ কয়েকঘণ্টা শুনানী চলেছিল। ছোট ইলিয়াস ঠিকমতো ইংরিজি বলতে পারে না। মাঝে মাঝে বুঝতেও অসুবিধে হয়। একটা

গোডাউনে কাজ করে। বাংলাদেশী রেস্তোরাঁ আর দোকানেও মাঝে মাঝে কাজ পায়। দাদাকে এই তিন চার বছরে ও আর ওর মেজভাই নাকি রোজগারের সব ডলার দিয়ে দিয়েছে। আজ সেই দাদা ওদের পথে বসাতে চলেছে। ছোটর উকিল ব্যাখ্যা করলেন কি ভাবে তাঁর ক্লায়েণ্ট আজ সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের জন্যে লাঞ্চ ব্রেক পেলাম। তখন আবার ছোট ইলিয়াস আলাপ জমাতে এসেছিল—"চালানী পাব্‌দা মাছ খাইসেন নাকি? কই, চিতল্‌ সব চালান আস্‌তাসে সিলেট আর বেঙ্কক থিকা। তবে বাসায় গিয়া কাইট্যা লইতে হয়…"

আমি একটু গম্ভীর হবার চেষ্টায় বললাম—"আপনার সঙ্গে আমার এ সময় কথা বলা বারণ। কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।" বিকেলবেলা শুনানি শেষ হল। আমার কাজও শেষ। এই মামলায় আর আমাকে ডাকা হবে না। কারণ মক্কেলদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। নেহাৎ অন্য কাউকে না পেলে তখন ওক্‌সানা আমাকে পাঠাবে।

পার্কিং লটে এসে বড় ইলিয়াসের সামনাসামনি পড়ে গেলাম। মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। বলল—"দ্যাখেন তো কি ঝামেলায় পড়সি। সামাইন্য কয়টা কথার জইন্য পুরা দিনটা কাবার কইর‍্যা দিলো। অগো আর কি? মামলার খরচ যোগান দিতে আমাগো পরাণডা যায়। আজ কামেও যাইতে পারি নাই।"

এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে প্রশ্ন উকিঝুঁকি দিচ্ছিল সুযোগ পেয়ে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। স্পষ্টই বললাম—"কেন বিদেশ-বিভুঁইয়ে ভায়ে ভায়ে মামলা লড়তে গেলেন? নিজেদের মধ্যে একটা আপস করে নিলে তো এত খরচ হত না?"

বড় ইলিয়াস কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ল—"বহু চেষ্টা করসিলাম। অরা বাসা ছাড়বো না। টাকা পয়সাও কিসু দিবো না। আমার চলে ক্যামনে? পে চ্যাক্‌ তো দ্যাখলেন? খরচায় কুলাইতে পারি না। ঘরে তো বিবি আছে, তিনটা ছেলে মেয়ে।"

বাড়ি ফিরে ক'দিন ইলিয়াসদের কথা ভেবেছিলাম। স্বল্প বিদ্য, স্বল্প বিত্তের মানুষগুলো কোথায় কিভাবে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, আমাদের কোনো ধারণাই নেই। তার ওপর ভায়ে ভায়ে ঝগড়া কাজিয়া বাধিয়ে ঐ সামান্য উপার্জনের একটা মোটা অংশ উকিলের ঘরে দিয়ে আসছে।

তার মাসখানেক বাদে আমার নামে একটা খাম এসেছিল। 'অ্যাকশন ট্রান-স্লেশন ব্যুরো' আমার নামে চেক পাঠিয়েছে। ঐ দিনের পাঁচ ঘণ্টার কাজের জন্যে একশ ডলার। মামলায় দোভাষী পাঠানোর কমিশন হিসেবে স্টেরাংকা ও নিশ্চয়ই ভালোই পেয়েছে। ইলিয়াসের রোজগার বলেছিল ঘণ্টা পিছু ছ ডলার। অথচ মামলার জন্যে আমাকে দিতে হয়েছে তার নিজের রোজগারের চেয়েও তিনগুণ বেশী। মনে পড়েছিল পার্কিং পার্কে দাঁড়ানো সেই ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখ—পে চ্যাক্‌ তো দ্যাখলেন। ঘরে বিবি আছে, তিনটা ছেলে মেয়ে…।

তারপর আবার এতদিন পরে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। জুরী ডিউটির কাগজে সই করে পাঠিয়ে দিলাম সময় মতো।

মামলার দিন সকাল সাড়ে আটটায় কোর্টে পৌঁছলাম। সিকিউরিটি চেকিংএ লম্বা লাইন। টেররিজমের ভয়ে আমেরিকায় খানাতল্লাসী খুব বেড়ে গেছে ইদানীং। সে সব সেরে বেসমেণ্টের লম্বা হলঘরে জুরীদের দলের মধ্যে বসে গেলাম। নাম ডাকা হলো। শেরিফের বক্তৃতা শোনা হলো। বিনে পয়সার কফি বারবার খাওয়া হল। তারস্বরে টেলিভিশন চলেছে। টেবিলগুলো খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনে ছয়লাপ। আমাদের খেজুরে আলাপ শুরু হয়ে গেছে। দলটাকে নানা প্যানেলে ভাগ করে দিয়েছে। মাইকে যখন যে প্যানেলকে ডাকছে, তারা লাইন করে এজলাসে চলে যাচ্ছে। আমরা প্যানেলে আছি জনা কুড়ি। ডাক পড়লে ওপরে জজের সামনে গিয়ে আবার লটারী অনুযায়ী বাছাই হবে। কে জানে কি মামলায় জড়াবো শেষ পর্যন্ত? গ্র্যাণ্ড জুরীর কেসে ডাকলে বেশ গা ছমছমে অভিজ্ঞতা হতে পারতো। এখানে আমার বরাতে নির্ঘাৎ ফৌজদারী জুটবে। বসে বসে অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিলাম। বেলা দশটা নাগাদ আমাদের প্যানেলের ডাক পড়লো।

ওপরে এসে দেখি কোর্ট তখনই গমগম করছে। মামলা মকদ্দমা ছাড়াও ইমিগ্রেশন, পাসপোর্টের জন্যে লোক পিলপিল করছে। আমরা পাঁচ তলায় জজ মার্নারের এজলাসে গিয়ে বসলাম। তখনও জজ আসেননি। কি কেস কিছুই জানি না। ফিশফিশ করে পাশের মেয়েটি বললো—"আসামী কে বলো তো?" আমি খেয়াল করে দেখি একটি কালো ছেলে, বোধহয় বছর তিরিশের নীচেই হবে বয়স, কালো উকিলের পাশে গম্ভীর মুখে বসে আছে। অন্য টেবিলে দু'জন সাদা পুলিস অফিসার। সঙ্গে তাদের উকিল। নির্ঘাৎ কালো ছেলেটাই আসামী।

জজ আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে উঠে আবার বসে গেলাম। জজ কেস সম্পর্কে আমাদের যা বললেন তাতে বুঝতে পারলাম মোট পাঁচটি অভিযোগ আছে মিস্ অ্যানার নামে। আমরা কয়েকজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। মিস্ অ্যানা আবার কোথা থেকে এল? কালো ছেলেটা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। মাথায় ফোয়ারার মতো খাড়া চুল, তাতে কাঠের চিরুনি গোঁজা। মুখভর্তি কাটাকুটি আর বড় বড় ছুলির মতো দাগ! কিন্তু দাঁড়ানোর পর ভালো করে দেখলাম মিস অ্যানাই বটে। ওর পুরুষালী চেহারা আর বসে থাকার জন্যে ধরতে পারিনি। অ্যানার চোখে মুখে অসহিষ্ণুতার ছাপ। অভিযোগগুলোও শুনলাম। বিনা লাইসেন্সে রিভলভার রেখেছে, সেটা নাচিয়ে নাচিয়ে প্যাটারসনের রাস্তায় কাকে কাকে ছিনতাই করেছে। জিনিস হাতিয়ে ধরা পড়ার পর কোন দোকানে কর্মচারীর গলায় ছুরি মারতে গিয়েছিল। পুলিসকে অশ্রাব্য গালাগালি এবং থুতু দিয়েছে গ্রেফতার করার সময়। এরকমই সব অপরাধ। আঁচড়ে কামড়ে দেবার চেষ্টা করেছে বলেও যেন শুনলাম

আপাতত কেস চলছে আসামী ভার্সেস নিউজার্সি স্টেট। সাদা পুলিসের জন্যে আছে সাদা উকিল। মিস্ অ্যানা নিয়েছে কালো উকিল। আমরা বারো-জন জুরী মিলে ঠিক করবো অ্যানা দোষী না নির্দোষ। আমাদের প্যানেলে দেখছি মাত্র তিনজন কালো জুরী। বাকীদের মধ্যে আমি আর একজন চীনে প্রফেসর ছাড়া অন্যরা সাদা। দেখি লটারীতে শেষ পর্যন্ত কুড়িজনের মধ্যে কে কে জুরী বেঞ্চে টিকে যাই।

একটা কাঠের ঢোলের মতো বাক্সে আমাদের নামধাম রাখা আছে। তার হাতল ঘুরিয়ে দিয়ে আসা মাত্র একটা করে নাম উঠছে। দ্বিতীয় বারেই আমার নাম উঠে গেল। জুরী নম্বর দুই হয়ে এজলাসের বাঁ দিকে জুরী বেঞ্চে চলে গেলাম। কিন্তু এখনই হচ্ছে—টিকে থাকার প্রশ্ন। জর্জ আমাদের প্রশ্ন করবেন। তারই মধ্যে প্রসিকিউটর বা ডিফেন্সে উকিল বুঝে নেবেন তাঁর কেস জেতানোর জন্যে আমার থাকা বা না থাকা উচিত কিনা। আমার আগের জন প্রথমবারেই বাতিল হয়ে গেছে, তার মামা পুলিসের লোক বলে। আমার তো সে সমস্যা নেই। আমেরিকায় এত জ্ঞাতি-গুষ্টিও নেই যে পুলিসে ঢুকে বসে থাকবে।

জজ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—পুলিসকে আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র বলে বিশ্বাস করি কিনা।

—"তা করি একরকম।"

—"ওভাবে নয়। সরাসরি হ্যাঁ কিংবা না বলো।"

—"হ্যাঁ, ইয়োর অনার।"

—"এই মামলায় পুলিসের ওপর তোমার পক্ষপাতিত্ব থাকবে? না নিরপেক্ষ থাকবে।"

—"নিরপেক্ষ থাকবো ইয়োর অনার।"

—"আসামী দোকানে চুরি করতে গিয়ে যে দোকানদারকে ছুরি মারতে গিয়েছিল বলে অভিযোগ এসেছে, তার নাম সিরাজুল আমেদ। বাংলাদেশের লোক। এশিয়ান বলে তার প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব থাকা সম্ভব কি?"

আমি একটু থতিয়ে গেলাম। কি বলবো ভাবছি। কালোদের সম্পর্কে আমার ভয়ের কথা স্বীকার করিনি। অ্যানা অপরাধী কিনা সে নিয়ে ভাবারও সময় পাইনি। শুধু জুরীর চেয়ারে বসামাত্র একবার মনে হয়েছিল মানুষ হিসেবেই আমার তো কিছু দায়বদ্ধতা থাকা উচিত এই কালো মেয়েটির কাছে। সাদা সমাজেরই বা কে আমি? গরীব মারকুট্টে চেহারার ঐ হতশ্রী রোগা মেয়েটা কোন পরিস্থিতির চাপে কি করেছে—এমন সব সমাজতত্ত্বের ভাবনা নিয়ে আমি মনটাকে তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলাম। অথচ এই মুহূর্তে শুধু একটা নাম আমার সব হিসেব গোলমাল করে দিয়ে গেল। সিরাজুল আমেদকে আমি চিনি না। কিন্তু সে বাংলাদেশের মানুষ আর প্যাটারসনের দোকানে বসে থাকে—এই খবরেই কেন যে ইলিয়াসদের মনে পড়লো।

আমি উত্তর দেবার আগে অনেক সময় নিয়ে নিলাম। অ্যানা তীব্র চোখে

লক্ষ্য করছে। কালো উকিলের চোখের দিকে তাকাতে পারছি না। এজলাসে জজ আর সম্ভাব্য জুরীরা নিঃশব্দে আমার উত্তরের অপেক্ষা করছেন। আমি কিছু বলবার আগেই ডিফেন্সের উকিল গম্ভীর গলায় বললেন—"ইয়োর অনার, আমার অনুরোধ দু নম্বর জুরীকে একস্‌কিউজ করা হোক।"

জজ আমায় একস্‌কিউজ করলেন। আমি বর্ণ বিদ্বেষী, এ কথাই কি প্রমাণ করে এলাম? আমি জানতাম, হয়ত এমনিতেই ডিফেন্সের উকিল আমাকে চাইবে না। নীচের ঘরে সকাল বেলা জুরীদের আড্ডায় এক মহিলা বলেছিলেন—"কালো আর স্প্যানিশদের মামলায় কখনো আমাদের জুরী করবে না দেখো। কারণ ওদের উকিলরা ধরে নেবে আমরা প্রেজুডিসড্।" আমি অবশ্য এমন ধারণার কথা আগেও শুনেছি। আমরা সাবার্বান হাউসওয়াইফ্‌রা নাকি বেশ কনজারভেটিভ। বড় শহরের পাঁচরকম লোকের সঙ্গে প্রতিদিনের মোকাবিলা নেই। প্রাত্যহিকতার লড়াই বলে কিছু নেই। জীবনের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে অভিজ্ঞতার অভাব থেকে রেপ, খুন, মার্গিং, চুরি ভাবলেই একমাত্র কালোদের মনে পড়ে।

হয়ত এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত নয়। আমি তো জানি এ মামলায় নিরপেক্ষ থাকা সহজ ছিল না। সিরাজুল আমেদ হয়ত ইলিয়াসদের মতোই হবে কেউ। বিদেশ-বিভুঁইয়ে সামান্য পুঁজি নিয়ে বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই সেদিনই ব্রুকলীনে শাকসবজী আর মশলার দোকানে গুলি খেয়েছে বাংলাদেশী দোকানী। ব্রংক্সের ওষুধের দোকান থেকে গুজরাটি সেলস ক্লার্ককে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় ফেলে বীভৎস মার মেরেছে কটা কালো ছেলে। পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার অজয় কাক্কারের মাথায় গুলি মেরে খাদে ফেলে দিলো দুটো টীন এজার, মাত্র একশ ডলারের লোভে। তবে আমি কেন ধরে নেব না অ্যানার পক্ষে সিরাজুল আমেদকে ছুরি মারতে যাওয়া অসম্ভব ছিল না? জুরী হিসেবে আমার সিদ্ধান্ত কি হতে পারতো আমি তো নিজেই জানি। আর একটু তলিয়ে ভাবি না কেন? নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বলে নয়, কালোদের ভয় পাই বলে নয়, শুধু তৃতীয় বিশ্বের মানুষ বলেই আমার কিছু দুর্বলতা থাকা সম্ভব। আমেরিকায় কিসের আক্রোশে অ্যানার মতো মেয়েরা এমন তীব্র ঘৃণা নিয়ে ছুরি শানায়, সেই বিশ্লেষণের চেয়েও যে আমার মনে পড়ছে ইলিয়াস আর অজয় কাক্কারের মতো অভাবী অথচ পরিশ্রমী মানুষগুলোকে। বিদেশের মাটিতে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার মাশুল দিতে তাদের জীবনটাই বিকিয়ে যাচ্ছে কানাকড়ির দামে।

জুরী ডিউটি থেকে আপাতত ছুটি। আবার দু'বছর বাদে ডাক আসতে পারে। সেই সময় এসে পৌঁছোনোর আগে খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করবো পক্ষপাতিত্বের দায়কে সংকীর্ণতা ছাড়া অন্য কোনো সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা যায় কিনা। দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতার অভাবে আইনের চোখে খারিজ হয়ে গেলাম —ঘটনাটা স্বীকার করা কঠিন।

॥ ৭ ॥ যামিনীর কথা

চার কুড়ি বছর আগে নিউ ইয়র্কে যামিনী পার্থসারথি আমাকে বহুরকম শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছিল। আমেরিকা সম্পর্কে আমার ঘোর অজ্ঞতার কারণে তাকে আমি দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ছায়ার মতো অনুসরণ করেছিলাম কিছুদিন। সেও হৃষ্টচিত্তে নানা উপদেশ দিত। তার মধ্যে প্রধান ছিল ধৈর্য ধরতে শেখানো, সামান্য ঘটনায় উতলা না হবার উপদেশ।

তখন সদ্য নিউইয়র্কে এসেছি। একই বাড়িতে দোতলার বাসিন্দা ছিল ইউনাইটেড নেশনস্-এর শ্রীগোপাল আর যামিনী পার্থসারথি। একতলায় ছিলাম আমরা। যামিনীর বড় বড় ছেলেমেয়েরা মাদ্রাজে থেকে পড়াশোনা করত। আমার মেয়ে তখন খুবই ছোট। সবেমাত্র আমার সঙ্গে দেশ থেকে এসেছে। একেবারে নতুন পরিবেশ। কোল ছাড়া হলেই পরিত্রাহি কান্না জুড়ে দিত। আমেরিকায় থাকা মানে যে একা হাতে ঘরে বাইরে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সেই সত্যি হাড়ে হাড়ে টের পেলেও আমি মেয়েটাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কাজকর্ম সারতে পারতাম না। কোথা দিয়ে সময় চলে যেত। নিজের চান, খাওয়া মাথায় উঠত। সে সময় যামিনী-ই ছিল আমার ভরসা।

একদিন মেয়েকে খেলতে বসিয়ে চান করতে ঢুকেছিলাম। বেরিয়ে দেখি সে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ব্লিচিং পাউডারের টিন থেকে পাউডার ঢেলে চেটে চেটে খাওয়ার চেষ্টা করছে। পয়জন কন্ট্রোল সেন্টারে ফোন করে প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে দৌড়ে দোতলায় যামিনীর কাছে গেলাম। যামিনী ওর গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করাতে চেষ্টা করল। এদিকে পয়জন কন্ট্রোল সেন্টারের কথা অনুযায়ী আমি পালা করে দুধ আর অরেঞ্জ জুস খাইয়েও যখন দেখলাম মেয়ে বহাল তবিয়তে বসে আছে, তখন যামিনী আমাকে অধৈর্য হবার জন্যে বেশ ধমক দিল। গ্রাহ্য না করে মেয়েকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। যামিনীও গুটি গুটি সঙ্গে চলল। ওর প্রশান্তি আর নির্বিকার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল ওর ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই বহুবার বিষটিষ খেয়েছে। যাই-হোক, ডাক্তার দেখলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন ব্লিচিং পাউডার অখাদ্য বিবেচনা করে মেয়েটা নাকি শুধু চেখে দেখেছিল। পেটে কিছুই যায়নি।

তার কদিন পরেই আবিষ্কার করলাম মেয়ের ডায়াপার সবুজ জলীয় পদার্থে ভর্তি। আবার ছুটলাম মেয়ে ঘাড়ে নিয়ে দোতলায়—ও যামিনী দ্যাখো, ওর নিশ্চয়ই গ্রিন ডায়রিয়া হয়েছে। যামিনী ডায়াপার পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে রায় দিল—ওর তো পালং শাক খেয়ে হজম হয়নি। ভেবে দেখলাম, ঠিকই তো। আগের দিন মেয়েকে বেবি ফুড কোম্পানির ছোট্ট কৌটো ভর্তি স্পিনাচ ডিলিশাস খাইয়েছি। নির্ঘাৎ সেই ডিলিশাসের ফল। কিন্তু তাও

পুরোপুরি ভরসা হল না। আবার ছুটলাম ফরেস্ট হিলসে মেয়ের ডাক্তারের চেম্বারে। দেখা গেল যামিনীর অনুমান অভ্রান্ত।

যামিনী যথারীতি আমার সঙ্গে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার সময় খুব জ্ঞান দিতে লাগল। মা হবার মতো ধৈর্য নাকি আমার একেবারেই নেই। সব ব্যাপারে অতিরিক্ত উতলা হওয়া স্বভাব···আরও কী কী সব বলে যাচ্ছিল।

এরপরে আমি একদিন মেয়ের ডায়াপারে কমলা রঙের গলিত পদার্থও ভয়ে ভয়ে যামিনীকেই দেখিয়েছিলাম। সেবারেও সবজান্তার মতো বলেছিল—এবারে ক্যারট বেরিয়েছে।

মেয়েকে ঘুম পাড়ানো নিয়ে যামিনীর সঙ্গে প্রায় ঝগড়া লেগে গেল। দেশে থাকতে ঠাকুমা নয়তো দিদিমা, কোলে শুয়ে ঘুম পাড়ানি গানটান শুনে আর পিঠে মৃদু চাপড় খেয়ে খেয়ে তার ঘুমনোর অভ্যেস ছিল। আমি তাকে সবে এখানে একা ঘরে বেবি কটে শুইয়ে ঘুমবার ট্রেনিং দিতে শুরু করেছি, তার চিল চিৎকারে যামিনী দোতলা থেকে এসে হাজির। ছোট্ট মেয়ের এই করুণ কান্না নাকি সে সহ্য করতে পারছে না। আমাকে এক ধমক দিল—ঘুম পাড়ানোর ধৈর্য নেই! বাচ্চাটাকে রোজ রোজ কাঁদাচ্ছ? দাও, আমাকে দাও—দক্ষিণী সুরে গুনগুন করতে করতে মেয়েকে দোতলার অ্যাপার্টমেণ্টে নিয়ে চলে গেল। মেয়ে তো কোল পেয়েই চুপ, তামিল ভাষায় "ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি" বুঝুক আর নাই বুঝুক। দিন কতক যামিনী তাকে ঘুম পাড়িয়ে নীচে এনে দিত। আর বেবি কটে শোয়ানো মাত্র ঘুম ভেঙে তার হাহাকার কান্না শুরু হত। মেয়েটার ঘুমের ট্রেনিং-এর বারোটা বেজে যাচ্ছিল একেবারে। স্পষ্টই যামিনীকে বললাম—এভাবে ওর অভ্যেস খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বেবি অ্যাণ্ড চাইল্ড কেয়ার পড়ে দেখেছি, ওকে আবার একা শুইয়ে নিজে নিজে ঘুমনোর অভ্যেস করাতে চাই। একটু কাঁদে, কাঁদুক। শেষ পর্যন্ত তিন-চারদিনের চেষ্টাতেই কাজ হল। যামিনী সেই কদিন রেগে নীচে এল না।

সুপার বাজারে গিয়ে আমার আর যামিনীর মধ্যে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা চলত। দুপুরে দুজনে প্রায়ই বাজার হাট করতে বেরতাম। বাঙালির সংসারের মাছ, মাংস, তরিতরকারি থেকে উনকোটি চৌষট্টি বাজার, ছোট বাচ্চার ডিসপোজেবল ডায়াপারের বড় বড় বাক্স থেকে শুরু করে বেবি ফুডের শিশি আর কৌটোর পাহাড় কেনা, তারই মধ্যে মাথায় রয়েছে সময় মতো বাড়ি গিয়ে মেয়েটাকে চান করানো, খাওয়ানো, শোয়ানোর চিন্তা। রাতের জন্যে অন্তত তিন পদ রান্না করা, প্রায় দিনই কাপড় কাচা, ব্যাংক, পোস্ট অফিসে যাওয়া ইত্যাদি হাজার পর্ব। অথচ যামিনী যেন সেন্ট্রাল পার্কে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। গুনগুন করে দক্ষিণী কালোয়াতি সুর ভাঁজছে আর এক একটা আইলে দাঁড়িয়ে পড়ে বিমুগ্ধ নয়নে কী সব নিরীক্ষণ করছে। হাতে গোটা কতক খুচরো পয়সা বাঁচানোর কুপন। লক্ষ করতাম ফ্রোজেন শাক সবজি, দইয়ের ঘোল, চিজ, গোটা নারকেল, আলু, চাল—এসব ছাড়া বিশেষ কিছু যে কিনত

তা নয়। কিন্তু দোকানের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ানোর ক্লান্তি নেই।

একদিন আকাশ মেঘে কালো হয়ে গেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি বিশাল সুপার মার্কেটে ছুটে ছুটে বাজার সারছি, যাতে কোনওমতে বেরিয়ে ঝড়বৃষ্টি নামার আগে বাড়ি পৌঁছতে পারি। কিন্তু যামিনীর পাত্তা নেই। শপিং কার্টে বাজারের জিনিস, আর মেয়েকে নিয়ে সারা দোকান ঢুঁড়ে দেখি—যামিনী কাঠ ঠোকরা কাঠ ঠোকরা করে এক জায়গায় দোকানের দুজন কর্মচারীকে উদ্ব্যস্ত করে মারছে। আমার তখন মাথা গরম হয়ে গেছে। ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি যামিনী? অবেলায় দুর্যোগের মুখে সুপার মার্কেটে দাঁড়িয়ে কাঠ ঠোকরার খোঁজ নিচ্ছে? পাখি যদি পুষবি তো 'পেট শপে' যা না। আর দুনিয়ায় এত পাখি থাকতে কাঠ ঠোকরাই বা পুষবি কেন? তাও যদি ইংরেজিতে 'উড পেকার' বলতিস। হঠাৎ খেয়াল হল যামিনী বাংলায় কাঠ ঠোকরাই বা বলছে কী করে? শেষে অনেক কষ্টে বোঝা গেল ও ফ্রোজেন শাক সব্জির ঠাণ্ডা আলমারিতে প্যাকেটবন্দি কাটা ঢেঁড়স খুঁজে পাচ্ছে না। এদেশে তো লেডিজ ফিংগারের বদলে ওকরা বলে ঢেঁড়সকে। সেই 'কাট ওকরার' জন্যেই ওর এত খানাতল্লাশির চেষ্টা!

ততক্ষণ আকাশ ভেঙে তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। পার্কিং লটে এসে দেখি ঝড়বৃষ্টিতে চতুর্দিক অন্ধকার। কোনওমতে গাড়ি অবধি পৌঁছলাম। তখন সদ্য ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছি। অনবরত গাড়ি লড়িয়ে দেবার ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করত। লটবহর, যামিনী, মেয়েকে সুদ্ধু গাড়িতে চাপিয়ে হিল সাইড অ্যাভিনিউ ধরে চলেছি। প্রচণ্ড জলের ঝাপটে সামনে ভাল করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। লেন ঠিক রাখতে গিয়ে অন্য গাড়ির প্যাঁক প্যাঁক শুনছি। খালি ভয় হচ্ছে, এই বুঝি গাড়ি স্কিড করে যাবে। তার মধ্যে হঠাৎ যামিনী গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে জোরে এক কালোয়াতি ধরল—গজেন্দ্র মেঘা···আ···আ···রাজেন্দ্র শোভা···বিদ্যুতা কেলি···ই···ই···জলদা গম্ভীরা···আ···আ। আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। একটা দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে ছাড়বে না দেখছি। ওদিকে পেছনে কার সিটে বসে মেয়ে চুইং গাম খাবে বলে চেঁচাচ্ছে। বাজারের ঠোঙা থেকে হাঁটকে হাঁটকে সব জিনিস বের করে সিটের নীচে ফেলছে। যামিনী সমানে গলা খেলিয়ে খেলিয়ে "গজেন্দ্র মেঘা" গাইছে। আর আমি নার্ভাস হয়ে রাস্তার অন্যান্য গাড়ি থেকে হর্ন ও কাচ নামিয়ে দেওয়া ধমকানি হজম করে এলোপাথাড়ি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছি।

ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে যামিনীর গান শেষ হল। বলল মেঘ দেখলে নাকি ওর মেঘদূত মনে পড়ে। ও কালিদাস আওড়াবার আগেই আমি দাঁত কিড়মিড় করে বললাম—তোমার ঠোঙাগুলো তাড়াতাড়ি নামাও। যামিনী সেদিনও নারকোলের ব্যাগ বগলে যেতে যেতে বলেছিল—দোকানে বাজারে আমার অকারণ তাড়াহুড়ো করা, গাড়িতে অত নার্ভাস হওয়া—এসব নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ। আমার উচিত 'যোগা' অভ্যেস করা, ইত্যাদি নানা কথা।

আমাদের দু বাড়িতেই মাঝে মাঝে শনিবারে পার্টি হত। যামিনীদের বাড়িতে ইউনাইটেড নেশনস-এর লোকজনই বেশি আসত, আর কিছু কিছু নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনস্যুলেটের লোকজন। এছাড়া ছিল ওদের নিজেদের ক্লাব 'ভারতী সোসাইটি'। হয়তো একই শনিবারে দক্ষিণ ভারতীয় অতিথিরা দোতলায়, আর একতলায় আমাদের অ্যাপার্টমেণ্টে বাঙালিদের আড্ডা বসত। সেদিন সন্ধেবেলার চেহারাটা হত মোটামুটি একই রকম। কিন্তু নেমন্তন্নের আগের দিন থেকে আমার যত ব্যস্ততা শুরু হত, যামিনীর দেখতাম তার অর্ধেকও নয়। ছোট মেয়েকে সামলে কী করে একা হাতে সব রান্না শেষ করব, বাড়ি গোছাব—এ জন্যে একটু উদ্বেগ থাকত। দু-একদিন আগে থেকে তখনকার সদ্য শেখা একমাত্র মিষ্টি জয়হিন্দ সন্দেশ (মিলক্ পাউডার, জলছানার মতো কেনা চিজ, আর রং মিলিয়ে) আর কনডেনসড মিলক, এভাপোরেটেড মিলকের সঙ্গে টক দই গুলে, আভেনে বেক করে 'লাল দই' বানিয়ে রাখতাম। রান্নার আরও প্রতিভা দেখাতে ছানার ডালনা, সুক্তো, নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল, ট্রাউট নয়তো টুনা ফিশের চপ, চিংড়ির মালাইকারি, প্রাণপণে চর্বি ছাড়িয়ে পাঞ্জাবি কায়দায় ভেঁড়ার মাংস রান্নার চেষ্টা, সবুজ আপেলের চাটনি—এত সব বড় বড় প্রজেক্ট নিয়ে যখন শুক্রবারে রান্নাঘরে ছুটে বেড়াচ্ছি, তখন এক একদিন যামিনী চলে আসত। সদ্য স্নান সেরে এসেছে। গায়ে ভুরভুর করছে মাইসোর চন্দন সাবানের গন্ধ, কপালে মাদ্রাজি সিঁদুরের টিপ, পরনে ঝলমলে একখানা কাঞ্জিভরম। বলত—ওর নাকি পরের দিনের পার্টির সব কাজ শেষ। বেলা তখন হয়তো বারোটাও বাজেনি। আমাকে বলত—কেন এত পর্ব কর তোমরা ? এতে তো লোক ডাকলে শুধু খাটুনি আর টেনশন বাড়ে। আনন্দ হয় না। যামিনীর মতে আয়োজন সংক্ষিপ্ত হোক, আন্তরিকতাটাই বড় কথা। আমি ওকে কী করে বোঝাই যে ভালমন্দ খাওয়া এবং খাওয়ানো আমাদের বাঙালিদের মজ্জাগত স্বভাব। যতই মুখে বলি ডাল ভাত খেতে আসুন, কার্যক্ষেত্রে সেটা হয় না। তাই সে মুহূর্তে আমি যামিনীর উপদেশে কর্ণপাত না করে আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে মাছ ভাজতে শুরু করতাম, খচাখচ মাংসের জন্যে পেঁয়াজ, রসুন কাটতাম। হতাশ যামিনী চন্দনের গন্ধ ছড়িয়ে দোতলায় ফিরে যেত।

গরমের ছুটিতে ওর চার ছেলেমেয়ে মাদ্রাজ থেকে বেড়াতে এসেছিল। আমার মেয়ে তখন অনবরত দোতলায় পালিয়ে যেত। দেড় বছর বয়সে বাংলা ছাড়া আর যদি কিছু বুঝত, তো সে বোধহয় ওদের ভাষার ছিটেফোঁটা। ছুটির শেষে ওরা যখন মাদ্রাজে ফিরে গেল, মেয়েটা কদিন খুব মনমরা হয়ে রইল।

একটা ব্যাপার লক্ষ করতাম—যামিনী কখনও হিন্দি বলে না। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি মাদ্রাজে রিকশাওয়ালারাও নাকি ইংরেজি জানে। তাই যামিনীর ইংরেজি ভাষা প্রীতিতে অবাক হইনি। মাঝে মাঝে বাঙালি অবাঙালি মিলিয়ে যে সব পার্টি হত, সেখানে গিয়েও দেখেছি, যামিনী হিন্দি শুনলে

বুঝতে পারত বলে মনে হত না।

আমাদের বাড়িঅলা ছিল ইহুদি আমেরিকান, নাম ডেভিড ক্লাইন। ভীষণ পিটপিটে লোক। নানা ছুতোয় হানা দিয়ে দেখত আমরা বাড়িঘর, বিশেষ করে রান্নাঘর ঝকঝকে করে রেখেছি কিনা। একদিন বাগানের ঘাস কাটতে এসে বুড়ো ডেভিড 'হ্যালো' বলার ছুতো করে আমাদের একতলার অ্যাপার্টমেণ্টে এল। শ্যেন দৃষ্টিতে কুকিং রেঞ্জ, আভেন, রেফ্রিজারেটর, কাউণ্টার সব লক্ষ করল। মনে হল পাস করে গেছি। তারপর দোতলায় উঠে গেল। একটু পরে বিষ মুখে নীচে নেমে এসে সামনের বাগান পরিষ্কার করতে বসল। হঠাৎ যামিনী চিঠির বাক্স দেখতে নীচে নেমে এসেই ডেভিডের মুখোমুখি পড়ে ভুরু কুঁচকে রইল। আমিও চিঠির আশায় ডাকবাক্স দেখতে এসেছিলাম। যামিনী বুড়ো ডেভিড ক্লাইনের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে গড় গড় করে হিন্দিতে বলতে লাগল—'ইয়ে বুড্ঢা বড়া বদমাশ হ্যায়। হমারা ঘর কো গনদা বোলা। হম কিচেন ফ্লোর মে নারিয়েল তোড়েগা, নেহি তো কেয়া ইয়ে বুড্ঢাকা শির কা উপর তোড়েগা ?'—বলে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

বুঝলাম রান্নাঘরে মেঝের ওপর নারকোল ফাটাবার মোক্ষম মুহূর্তে হাতে-নাতে ধরা পড়েছিল যামিনী।

আমরা দুটি পরিবার মিলেমিশে ভালই ছিলাম। আমার স্বামীর সঙ্গে শ্রীগোপাল পার্থসারথিরও বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। বছর দেড়েকের মাথায় ওদের জেনিভাতে বদলির অর্ডার এল। বিদেশের পরিচয়, বহু ক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী হয়। তবু ওরা চলে যাবে ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। নির্বিবাদী, শান্তি-প্রিয় মানুষ দুটি ছিল কাছাকাছি। মেয়েটাকে ভালবাসত খুব। চলে যাবার আগে ওরা কিছু কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করতে লাগল। প্রায়ই লোকজন আসতে দেখতাম। কয়েক ব্লক দূরে পারসনস বুলেভার্ডে ওদের কিছু বন্ধু-বান্ধব ছিল। তারা এসে কী সব কিনে নিয়ে গেল। 'ভারতী সোসাইটি'র মেয়েরাও এসে কয়েকটা ঠোঙা হাতে বেরিয়ে গেল। আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল কিছু কিনি। কিন্তু আমার স্বামী অ্যাপার্টমেণ্টে আর জিনিসের বোঝা বাড়াতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত তাও একটা বালতি কিনে নিলাম।

রওনা হবার আগের দিন যামিনীকে বাড়িওলার দেওয়া ফ্রিজ খালি করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে হবে। ওকে সাহায্য করতে গেলাম। ও আমাকে কয়েকটা ফ্রোজেন সবজির প্যাকেট গছাল অর্ধেক দামে। বিন, 'কাঠ ঠোকরা' আর ক্যারট আমি খুশি মনেই নিয়েছিলাম। কিন্তু ভুট্টার দানা আর সিমের বীচি মেশানো দু প্যাকেট মিকসড ভেজিটেবল আমি কিছুতেই নিতে চাইলাম না। অতি অখাদ্য লাগে। যামিনী তো নাছোড়বান্দা।ওই তরকারি আর তেঁতুল গোলা দিয়ে কী অপূর্ব পোলাও হয়, সে সব বুঝিয়ে গছিয়ে দিল শেষপর্যন্ত।

যখন দাম দিতে ওপরে গেছি, হঠাৎ শ্রীগোপাল দেখে ফেললেন। দু পয়সার সবজি বিক্রি করতে গিয়ে যামিনীর দফারফা। কিন্তু সেও দমবার পাত্রী নয়।

শুরু হল ওদের ভাষায় তুমুল ঝগড়া। আমি অপ্রস্তুত হয়ে নীচে নেমে আসার চেষ্টা করছি, হঠাৎ শ্রীগোপাল হনহন করে এসে আমাকে একটা আধভারি ক্রিসকো ভেজিটেবল অয়েলের টিন ধরিয়ে দিয়ে বললেন—এটাও নিয়ে যাও। আমি বুঝতে পারছি না এটা কেন নেব ? ভয়ে ভয়ে নামিয়ে রেখে দিতেই মনে হল যামিনী টিনটা দেখে বেশ বিরক্ত। দুজনে মিলে নিজেদের ভাষায় সমানে তর্কাতর্কি করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই শ্রীগোপাল ইংরেজিতে আমাকে বলছেন—কী হল ? তেলটা নাও ? আর যামিনী নিজের ভাষায় তাঁকে কী সব বলছে। শুধু উদ্ধার করতে পারলাম—পার্সানা বুলেভার্ড, রামামূর্তি, কেন্নেডি এয়ারপোর্ট। আর ক্রিস্‌কো অয়েলা—এই কটা কথা।

বেগতিক বুঝে আমি তেলের টিন ফেলে রেখেই নীচে পালিয়ে এলাম। ওপরে তখন ভীষণ চেঁচামেচি চলেছে। ধৈর্যময়ী যামিনী একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে। মনে হল, যাবার সময় নানা ঝামেলায় ওর মন মেজাজ ভাল নেই। তার ওপর আমার সামনে বরের ধমকধামক একদম হজম করতে পারেনি।

আধঘণ্টা বাদে শ্রীগোপাল নেমে এলেন। হাতে সেই তেলের টিন। বললেন—এটা যামিনী তোমাকেই দিয়েছে। আসলে রামমূর্তি আমাদের কাল কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে বলে তেলটা যামিনী ওদের দিয়ে যাবে ভেবেছিল। তা এখন যা প্রচণ্ড মাল হয়েছে দেখছি, মিস্টার মুখার্জিকেও একটা রাইড দিতে হবে। তবে কেন তোমরা তেলটা নেবে না ?

আমি বারবার আপত্তি করলাম। আমার স্বামীও বলে উঠলেন—এয়ারপোর্টে নিশ্চয়ই রাইড দেব। কিন্তু তাঁর জন্যে ক্রিসকো অয়েল নেব কেন ? যামিনী আগে যাকে কথা দিয়েছিলেন, তাকেই দিন না। শ্রীগোপাল হাত ধরে বললেন—না, না নিতেই হবে তেলটা।

তখনও তো আমরা ভুট্টার তেল খেলে যে আয়ুবৃদ্ধি (?) হয় জানতাম না। সব তেলই খেতাম। কিন্তু ফোকটে পৌনে এক টিন তেল পেয়েও মনটা বিশ্রী লাগছিল। বিশেষ করে যামিনীর আগে দেবার ইচ্ছে ছিল না বুঝতে পেরেই। সত্যি ! ক্রিসকো অয়েল আর এয়ারপোর্ট যাওয়া মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াল এমন যেন শোধবোধের মতো।

সন্ধেবেলাও ওদের বাড়িতে লোকজন আসছে টের পাচ্ছিলাম। কে জানে সেই রামামূর্তি না শ্যামামূর্তি তেলের টিন নিতে এসে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল কিনা। যাক্‌ গে, কাল যদি সে ডুব মারে, আমরাই দুবার এয়ারপোর্টে ট্রিপ মেরে দেব। আমাদের বাড়ি থেকে এমন কিছু দূরও নয়।

পরদিন সকালবেলা যামিনী এল। হাতে গোলপাকানো একখানা কাগজ। মুখখানা থমথম করছে। আমার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। আমারও গলার কাছটা ব্যথা ব্যথা করছিল। শান্তশিষ্ট মিশুকে মানুষটা বিদেশে আমাকে সময় অসময়ে কত সাহায্য করেছে। তুচ্ছ ফ্রোজেন ভেজিটেবল বেচতে গিয়ে আর ক্রিসকো অয়েল না দিতে চাওয়ার অপরাধে কাল ওর কী অশান্তি

গেল। যামিনী ভাঙা ভাঙা স্বরে সেই গোটানো কাগজখানা খুলে আমার হাতে ধরিয়ে বলল—দিস্ ইজ মাই ভগবানা। আই কুড ওনলি গিভ ইউ দিস ম্যাচ···।

দেখলাম ক্যালেণ্ডারে লক্ষ্মীমূর্তি। ওর ঘরে টাঙানো থাকত। আহা! ঠাকুরের ছবি দিয়ে ভুল বোঝাবুঝি মেটাতে এসেছে। তখন আমাদের মধ্যে ভাবাবেগের বন্যা বইছে। যামিনী কাঁদছে, আমি কাঁদছি, মেয়েটা কিছু না বুঝেই কাঁদছে। দুজনের বর এয়ারপোর্টে যাবার তোড়জোড় করতে এসে আমাদের দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর কত বছর চলে গেছে। কতবার বাড়ি বদল হল। সেই ক্যালেণ্ডার কবে হারিয়ে গেছে। মনটা মাঝে মাঝে খুঁত খুঁত করে। ভাবি কুড়ি বছর এত কিছু জঞ্জাল বয়ে নিয়ে এলাম এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি অথচ যামিনীর দেওয়া ছবিটার কথা মনে পড়ল না।

যামিনী আমাকে বলত—সারা জীবন ধরে মানুষকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। ধৈর্য ধরতে শেখো। আর বেশি আত্মাভিমান রেখো না। তাতে নিজেরই কষ্ট বাড়ে।

আমি ওর কোনও উপদেশই মনে রাখিনি। দুর্যোগের মধ্যে গাড়ি চালাতে গিয়ে আমার কখনও মেঘদূত মনে পড়ে না। আজও সুপার মার্কেটে লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে গরিব বৃদ্ধার কাঁপা কাঁপা হাতে ডিসকাউণ্ট কুপন জড় করার ধীর স্থির ধরন দেখে অধৈর্য হয়ে উঠি। কলেজে পড়া মেয়ে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি করলে মানসচক্ষে দেখতে পাই পুলিস আর অ্যাম্বুলেন্স তার বিধ্বস্ত গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। এ তো গেল উদ্বেগের কথা। আর আত্মাভিমান? কাউকে কতকাল বলিনি—আমার ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন।

॥ ৮ ॥ রিনির ভাবনায় একটি সোমবার

আজ সোমবার। প্রতিদিনের মত রেডিও-ঘড়িতে সকাল সাতটার অ্যালার্ম বাজলো। সারা পৃথিবীর খবরের হেডলাইন শুনতে শুনতে রিনির ঘুম ভাঙছে, আবার ঘুম আসছে। এ সময় এক এক মিনিট নষ্ট করা মানে পরে সময় নিয়ে টানাটানি। ঘুমচোখে কোনোমতে ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে নিয়ে প্রথমে বাবুই-এর ঘরে, তারপর টিনার ঘরে ঢুকলো। ওদের কম্বল সরিয়ে জাগিয়ে দেবার পরেও ওরা গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকলো। শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে অমলকে দুএকবার ডেকে তাড়াতাড়ি রিনি একতলায় নেমে গেলো।

রান্নাঘরের জানলার কাঁচের বাইরে হিম জমে আছে। ঘর এখনও আধো অন্ধকার। থার্মোস্ট্যাটে নিচের তলার হিটিং বাড়িয়ে দিয়ে, আলো জেবলে ও কাজ করছে। টিনা ইংলিশ মাফিন আর স্ক্র্যাম্বল্ড এগ খাবে, বাবুই দুধ, কলা, সিরিয়াল, অমলের কফি, টোস্ট, অরেঞ্জ জুস আর নিজের জন্যে চা।

সব কিছু তৈরি করতে করতে সিঁড়িতে ওদের নেমে আসার শব্দ পেলো।

বেলা সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি ফাঁকা। ওরা সবাই স্কুলে, অফিসে চলে গেছে। রিনির দু কাপ চা খাওয়া শেষ। ঘরে ঘরে বিছানা গোছাচ্ছে, ছাড়া জামাকাপড় কাচার জন্যে লন্ড্রী বাস্কেটে তুলে রাখছে। ফার্নিচার ঝাড়পোঁছ করে ব্রেকফাস্টের বাসন ধুতে ধুতে সোয়া নটা বেজে গেলো। সোমবারে সারা বাড়ির গাছে জল দেয়। রবার গাছের পাতায় বেশ ধুলো জমেছে। টিসুপেপার ভিজিয়ে তার পাতাগুলো মুছছে, হঠাৎ ফোন বাজলো।

"হাই রিনি! টেড বলছি। কেমন আছো?"

"হাই টেড! ভালো আছি। ধন্যবাদ। তুমি কেমন আছো?"

"ভালো। তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত?"

"না, না, ব্যস্ত নই। বলো।"

"আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে? বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি। এগারটায় অ্যালেকজান্ডার দোকানের সামনে অপেক্ষা করবো।"

"দাঁড়াও, আগে ক্যালেণ্ডার দেখি। না, আজ বারোটায় ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে। আজ আর হবে না টেড।"

"প্লিজ রিনি, ডেন্টিস্টের কাছে অন্য দিন যেও। তোমার দাঁত মোটেই কিছু খারাপ হয়নি যে আজই ছুটতে হবে।"

"এখন ডেন্টিস্টের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক্যানসেল্ করলে সহজে আর ডেট পাবো না।"

"তা সত্যি। আমায় তো তুমি সহজেই পাবে, যে কোনো দিন।"

"রাগ কোরো না। শোনো যদি কাল দেখা করি?"

"যাক গে, তাহলে আর আসতে হবে না। আমি আবার আজই বোকার মত হাফ ডে নিলাম···

"উঃ টেড, ভীষণ জ্বালাচ্ছো! দেখি এখন অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক্যানসেল করতে পারি কিনা।"

"পারি কিনা নয়। ক্যানসেল্ করো। তারপর চলে এসো এগারটার মধ্যে। আমি কিন্তু অপেক্ষা করবো।"

টেড এইরকমই। ওর যখন যা ইচ্ছে হবে ও তাই করবে। অতএব রিনির আজ আর দাঁত পরিষ্কার করানো হল না। ডেণ্টিস্টের অফিসে ফোন করে আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে আবার নতুন ডেট নিলো। গাছে জল দেওয়া, পাখির খাঁচা পরিষ্কার, তার জল, খাবার, ভিটামিনের ড্রপ দেওয়া সারতে সারতে এক ফাঁকে ডীপ ফ্রীজ থেকে রাতের রান্নার জন্যে মাংস বের করে রাখলো। বিকেলে ফিরে এসে রান্না করে নেবে।

স্নান করতে করতে আবার ফোন বাজলো। কোনোমতে তোয়ালে জড়িয়ে ছুটে এসে ফোন ধরলো। আবার টেড তাগাদা দিচ্ছে।

"হ্যালো রিনি! আসছো তো?"

"উঃ টেড! তুমি কি আমাকে শান্তিতে চান করতে দেবে না?"

"সরি ডার্লিং। যাই হোক, লাঞ্চে আসছো মনে হচ্ছে। প্ল্যান বদলাবার জন্যে ধন্যবাদ।"

"আচ্ছা এখন রাখছি।"

ক্লোসেট খুলে রিনি শাড়িগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলো। টেড শাড়ি পছন্দ করে। কিন্তু ১৮° ফারেনহাইটে গরম প্যান্ট, সোয়েটার আর জ্যাকেট না চাপালে রাস্তায় হাঁটতে খুব কষ্ট হবে। গাড়ি পার্ক করে ঐ জায়গায় কম হাঁটতে হয় না। তৈরি হয়ে বেরোতে বেরোতে সওয়া দশটা বাজলো। গাড়িতে বিশেষ তেল ছিলো না। গ্যাস স্টেশনে তেল ভরে নিতেও কিছুটা সময় গেলো।

ব্রডওয়ের ওপর গাড়ির মিছিল চলেছে। ক্রীসমাসের জন্যে দোকানে, বাজারে, পথে-ঘাটে এখন অসম্ভব ভিড়। গাড়ির রেডিওতে আবহাওয়ার খবরে জানাচ্ছে —বিকেলের দিকে বরফ পড়বে। এবেলার মধ্যে কাজকর্ম সেরে ফেলার চেষ্টায় লোকজন কাতারে কাতারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

পার্কিং লটে গাড়ি রাখার পর রিনিকে বেশ হাঁটতে হলো। শীতের ভয়ে টুপি, মাফলার পরেও রেহাই নেই। কনকনে হাওয়ায় ওর গাল, নাক, ঠোঁট সব কিছু অসাড় হয়ে যাচ্ছে। কুইন্‌স্‌ বুলেভার্ড ধরে অ্যালেকজান্ডারের কাছাকাছি পৌঁছোবার পর টেডকে দেখতে পেলো। কোমরে হাত দিয়ে নিবিষ্ট মনে লোকজন লক্ষ করছে। রিনিকে দেখতে পেয়ে গম্ভীর মুখে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে বললো, এই ক্রীসমাসেই তোমাকে একটা ভালো ঘড়ি দেব।"

"কেন? দেরী করেছি বলে?"

"রাইট! কখনোই তোমার সময় ঠিক থাকে না।" টেড এবার হাসলো। রিনিকে এক হাতে জড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। ওরা কুইন্‌স্‌ বুলে-ভার্ডের ওপরে একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকলো। খাবারের অর্ডার দেওয়ার পর টেড বললো, "আজ অফিসে কেউ কাজ করছে না। সকলেরই এখন ছুটির মেজাজ। আমিও আর লাঞ্চের পরে অফিসে ফিরছি না।"

"আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। তিনটের সময় টিনা, বাবুই স্কুল থেকে ফিরবে।"

টেডের নীল চোখ সবসময় হাসে। রিনির চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললো—"তাহলে একটু কেনাকাটা সেরে নিয়ে, চলো তোমার বাড়িতে যাই।"

"না আমার বাড়িতে নয়।"

"কেন? নয় কেন ডার্লিং?"

"সে তুমিই ভালো জানো টেড।"

টেড হাসতে হাসতে রিনিকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে গাল ঘষতে লাগলো। টেডের এই হঠাৎ হঠাৎ আদর করা রিনি কিছুতেই ঠেকাতে পারে না। এখানে কেউ দেখার নেই। এ সমাজে সেরকম কোনো বিধিনিষেধও নেই। তবু টেড যখন ওকে পথেঘাটে, সাবওয়ে স্টেশনে, কফি শপে জড়িয়ে ধরে আদর করে, ওর

মনে হয় অদৃশ্য অথচ পরিচিত কতগুলো চোখ অনেকদূর থেকে ওদের লক্ষ করছে। এতদিন ধরে আমেরিকায় যে ধরনের খোলামেলা শারীরিক ঘনিষ্ঠতা দেখেছে, তারপর এই সব অস্বস্তি ওর আর থাকার কথা নয়। তবে কি পুরোনো মূল্যবোধ? যদি তাই-ই হয়, তবে টেডের সঙ্গে ওর এখনকার সম্পর্কটাই তো পুরোনো মূল্যবোধকে অস্বীকার ছাড়া কিছু নয়। অথচ লোকজনের সামনে টেড ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে ও বাধা দেবার চেষ্টা করে। টেড প্রায়ই বলে, "আমার অ্যাপার্টমেণ্টে চলো, নয়ত তোমার বাড়িতে যাই।" টেড বিয়ে করেনি। ম্যান-হাটনের বিশাল আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে। ওখানে গেলে রিনির ফিরতে খুব দেরী হয়ে যায়। দু-দুবার ট্রাফিকের ভিড়ে আটকে পড়ে সময় মত বাড়ি ফিরতে পারেনি। ততোক্ষণে টিনা, বাবুইদের স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। তখন যে কি ভীষণ টেনশন হয়েছিল ওর। তার চেয়ে অনেক কম সময়ে এ পাড়ার কাছাকাছি ওর নিজের বাড়িতে টেডকে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে টেডের কথায় ও রাজী হতে চায় না। বাড়িতে গেলে দেখেছে অনেক ঘটনা বড় সহজে ঘটে যায়। সেই সব মুহূর্তে কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। টেডের উদ্দাম আবেগ, অপরিসীম উত্তেজনা আর ওর নিজের সুতীব্র অনুভূতির কাছে হার মানার পর বেশ কয়েকদিন দেহমনে অদ্ভুত এক অবসাদ আসে। সংসার, অমলের সান্নিধ্য আরও ক্লান্তিকর মনে হয়। ইদানীং এই টানাপোড়েনে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। আসলে ও যে কি চাইছে, নিজেই বুঝে উঠতে পারছে না।

রিনিকে অন্যমনস্ক দেখে টেড জিজ্ঞেস করলো—"কি এত ভাবছো? তোমার বাড়িতে যাবো বলে ভয় পাচ্ছ?"

"মোটেই ভয় পাচ্ছি না। তোমাকে লিভিং রুমে বসে থাকতে হবে। সেই শর্তে যাবে তো চলো।"

"এরকম অদ্ভুত শর্ত আমি মানি না।" টেড ন্যাপকিন দিয়ে রিনির ঠোঁট থেকে স্যাণ্ডউইচের গুঁড়ো মুছতে মুছতে হাসলো। ওরা রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে অ্যালেকজান্ডারে ঢুকলো। দোকানটা এমনিতেই বেশ সাজানো গোছানো। ক্রীসমাসের মরশুমে সাজসজ্জার বহর আরও বেড়েছে। আলো ঝলমলে শো কেসে নতুন ডিজাইনের সাজ-পোশাক পরানো সাদা, কালো ম্যানি-কুইন্। এস্কেলেটর বেয়ে অজস্র লোকজন উঠছে, নামছে। স্টিরিওর জোর-দার ঝমঝমে বাজনা, ভাজা বাদাম, মাখনের সঙ্গে ভাজা পপকর্ন আর চকলেটের গন্ধ,—গমগম করছে সারা দোকান। চারদিন পরে ক্রীসমাস। রিনির নিজের আজ আর কিছু কেনার নেই। টিনা, বাবুই-এর উপহার, ওদের স্কুলের টিচার, পিয়ানো টিচার আর পাড়াপড়শীদের জন্যেও যা কেনবার, কেনা হয়ে গেছে। অমল আর ও কেউ নিজের জন্যে কিছু কেনে না। অমল ক্রীসমাসে উপহার দেওয়াটা ভীষণ হাস্যকর মনে করে। রিনির ওকে কোনো কিছু কিনে দেবার শখ বহুদিন আগেই মিটে গেছে।

"দ্যাখো তো রিনি এই ঘড়িটা কেমন ?" সোনালী ছোট্ট গোল ডায়াল ঘিরে ছোট ছোট হীরে বসানো ঘড়িটা শো কেসে দেখিয়ে জানতে চাইলো টেড।

"ভালো। কিন্তু আমার চাই না।"

টেড উত্তর না দিয়ে সেল্‌স্ গার্ল-এর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলো। এত ভিড়ে দাঁড়িয়ে না থেকে রিনি একটু এগিয়ে গেলো। টেড যেরকম নাছোড়বান্দা, ঘড়ি কিনতে বারণ করা, না করা দুই-ই সমান। শুধু পছন্দ করার জন্যে এক ঝলক দেখিয়ে নিলো ওকে।

দূরে মেরিয়ানকে দেখতে পেল রিনি। মেরিয়ান ওদের প্রতিবেশী। এই পাড়াতেই চাকরি করে। আজ নিশ্চয়ই অফিস পালিয়েছে। এ পাড়াটা রিনির খুব চেনা। গত এক বছর টেডের ব্যাংকে একজনের বদলিতে পার্টটাইম চাকরি করেছিল ও। তারপর সেই চাকরির মেয়াদ ফুরোতে এখন বেকার বসে আছে। বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম সেরে, টিনা বাবুই-এর দেখাশোনা করে ফুলটাইম চাকরি করতে যা পরিশ্রম হয়, ওর শরীরে কুলোয় না। এখন তাই আবার পার্টটাইম চাকরির সন্ধানে আছে।

দূরে লাইনের প্রথম দিকে টেডের সোনালী চুলওলা মাথা দেখা যাচ্ছে। প্রায় কাউণ্টারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মাঝে মাঝে রিনিকে ঘুরে দেখার চেষ্টা করছে। চোখে চোখ পড়লে সামান্য হাসছে। ঘড়িটা কিনে তবে ছাড়বে। যখন ওর মাথায় যা ঝোঁক চাপে। মাঝে মাঝে রিনি ভাবে কেন যে টেডের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। কেনই বা এভাবে জড়িয়ে পড়ল ? এই যদি হবার, তবে আরও আগে কেন দেখা হলো না, যখন ওর জীবনে অমল ছিল না, টিনা বাবুই আসেনি।

ব্যাংকে কাজ করতে ঢুকে প্রথম প্রথম কিছু বুঝতে পারতো না। কোনে জব ট্রেনিং নেই, কোর্স নেওয়া ছিল না। ট্রেনিং-এর পরে অবশ্য আর অসুবিধে হতো না। টেড ওকে প্রথম থেকেই বেশ লক্ষ করতো। কোনো অসুবিধে হলে সাহায্য করতো। সেই সময় অফিসের কাজে তিন মাসের জন্যে অমলকে ক্যালি-ফোর্নিয়া চলে যেতে হলো। সংসার, চাকরি, ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নিয়ে রিনি বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। মাঝে মাঝেই এক একটা সমস্যা দেখা দিত। একদিন অফিসের কাছাকাছি গাড়ি বরফে স্কিড্ করে অ্যাকসিডেণ্ট বাধালো। খবর পেয়ে টেড এসে পুলিস ডাকলো, গাড়ি সারাতে পাঠালো, রিনিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করালো। ওর নার্ভাস অবস্থা দেখে সেদিন কাজে ছুটি নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলো।

আর একদিন রাত একটার সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রিনির বাড়ির বেসমেণ্টে জলের পাইপে বরফ জমে গিয়ে পাইপ ফেটে গেল। গভীর রাতে বেসমেণ্টের সিলিং থেকে, দেওয়াল থেকে হুহু করে জল পড়তে লাগলো। সেখানকার কার্পেট, ফার্নিচার সব ভিজে যাচ্ছে। বাড়িতে গরম জল, হিটিং বন্ধ হবার উপক্রম। দুঃসহ শীতে টিনা, বাবুইকে নিয়ে রিনি খুব বিপদে পড়েছিল।

ফোনে প্লাম্বারকে ধরার চেষ্টা করে করে হয়রান। সে তখন অন্য বাড়িতে পাইপ সারাতে গেছে। সে বছর অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়ায় বহু বাড়ির পাইপ ফেটে গিয়েছিল। কাছাকাছি বাঙালীও তেমন চেনাশোনা কেউ ছিল না যে ও সাহায্য চাইতে পারে। যারা ছিল, অমল তাদের পছন্দ করতো না বলে মেলামেশা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ফোন পেয়ে টেড চলে এলো। বাকি রাত জেগে পাইপে সাময়িক জোড়াতালি দিয়ে জলপড়া বন্ধ করলো। সকালে প্লাম্বার জোগাড় করে পাইপ সারালো। ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে ক্ষতির হিসেব দিলো, যাতে ঠিকমত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। তারপর কদিন ধরে বেসমেণ্টের ভেজা কার্পেট, ফার্নিচার শুকোবার ব্যবস্থা করলো। পরে অমল ফিরে এসে সব শুনে বলেছিল—"একটু-আধটু প্রেম করে বোকা সাহেবটাকে হাতে রাখো। তাতে দুজনেরই সুবিধে হবে।"

"দুজনের মানে ? টেডের কি সুবিধে দেখলে তুমি ?"

"সুবিধে ? সে যা নেবার ও নিয়েছে। এখনও নিচ্ছে। তুমি নিজে ন্যাকা সেজে আমাকে আর বোকা বানাবার চেষ্টা কোরো না।".

এরপর আরও অনেকক্ষণ কথাকাটাকাটি চলতে পারতো। অমল অনেক আজেবাজে মন্তব্য করেছিল। কিন্তু তর্ক করতে গিয়ে রিনি ক্রমশ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। ততোদিনে ও টেডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেছিল। টেডের দায়িত্ববোধ, আন্তরিকতা আর অসামান্য সুন্দর চেহারা ওকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

টেড এতক্ষণে আসছে। হাতে রঙীন কাগজে মোড়া ঘড়ির বাক্স। রিনি বললো, "কি হোলো, বাজার শেষ ?"

"হ্যাঁ। বড্ড সময় লাগলো। যা লাইন, দেখছিলে তো।"

"কেন এত দামী একটা জিনিস কিনলে ?"

টেড উত্তর দিলো না। আলতোভাবে রিনির হাতে একটু চাপ দিলো।

পার্কিং লটে পৌঁছতে দুটো বেজে গেল। রাস্তার ওপারে কিছু দূরে পোস্ট অফিস। রিনির হঠাৎ খেয়াল হলো কিছু স্ট্যাম্প কেনা দরকার। টেডকে বলতে বললো—"তবে আর দুটো গাড়ি নেব না। পোস্ট অফিসের সামনে পার্কিং পাবে না। চলো আমার গাড়িতে যাই।"

পোস্ট অফিসের সামনে পৌঁছে টেড নিজেই নেমে গেলো। ওরও স্ট্যাম্প কেনা দরকার। রিনি স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে রইলো, যে কোনো মুহূর্তে পুলিস এলে গাড়ি সরাতে হতে পারে। নয়তো পার্কিং টিকিট দিয়ে যাবে।

আকাশে মেঘ জমেছে। শুকনো গাছগুলোর ডালাপালা কাঁপিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মত হালকা বরফ পড়তে শুরু করলো। রিনির হঠাৎ অমলের কথা মনে হলো। অমল এখন কি করছে ? বোধহয় অফিসের ফোনে একে তাকে ধরবার চেষ্টা করে রিহার্সালের তোড়জোড়

করছে। পাঁচ দিন চাকরি আর সপ্তাহ শেষে দুদিন ধরে ওদের শখের নাটকের দলের সঙ্গে রিহার্সাল, আড্ডা আর মদ খেয়ে হুল্লোড়—এই তো অমলের এখনকার জীবন। প্রায়ই ওরা দল বেঁধে অন্যান্য স্টেটে বাংলা নাটক করতে চলে যায়। প্রথম প্রথম আমেরিকায় এসে রিনিরও এসব ভালো লাগতো। কিন্তু টিনা, বাবুই জন্মানোর পর আর অত হুজুগে তাল দিতে পারতো না। অনিয়মে বাচ্চাদের কষ্ট হতো। একশ তিন ডিগ্রী জ্বরে বাবুইকে নিয়ে ও মেরীল্যান্ডে নাটক করার সময় যেতে রাজী হয়নি। অমল গ্রাহ্য করল না। ওরা সবাই চলে গেলো। তখনও ওরা বাড়ি কেনেনি, অ্যাপার্টমেণ্টে থাকতো। ছুটির দিনে বাড়িতে রিহার্সালের চিৎকার, হইহল্লাতে বাচ্চারা অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারতো না। বলতে গেলে অমল কানে নিতো না। ওর ধারণা হয়েছিল এই ধরনের নাটকীয় পরিবেশ, আলাপ-আলোচনার মধ্যে বড় হলে ওদের ছেলেমেয়েরা বাংলা সংস্কৃতির ছোঁয়া পাবে, যা নাকি অনেক বাঙালী আমেরিকাতে বসে চিন্তাই করে না। রিনির বিরক্তি টের পেয়ে অমল নিজের দলের মধ্যে প্রায়ই বলতো, "আমার বউটা ক্রমশ জাগতিক হয়ে যাচ্ছে।"

রিনি গাড়িতে বসে ভেতরে ভেতরে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। সত্যিই ও আজকাল আর অমলের নাটকে কোনো সহযোগিতা করে না। এককালে অনেক খেটেছে। এখন আর ভালো লাগে না। হয়ত শনিবারে ওদের মিটিং থাকবে। বেসমেন্টের বিশাল কার্পেটে কুশন নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবে সবাই। পাকিস্তানী দোকান 'শাহীন্' থেকে কিনে আনা তন্দুরী চিকেন আর কাবাবের সঙ্গে শিভাজ্ রিগ্যালের বোতল সামনে নিয়ে শুরু হবে আমেরিকার বাংলা নাট্য আন্দোলন, জনজাগরণ, গণচেতনার কচকচি। এদেশে বছরের পর বছর ধরে অজস্র ডলার রোজগার করে, জাগতিক সুখ-সম্পদ চুটিয়ে উপভোগ করতে করতে ওরা যখন দেশের সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে বড় বড় বুলি কপচানো বাংলা নাটকের মহড়া দেয়, পুজো মণ্ডপে চাষী, জেলে আর বাস্তুহারা সেজে সেজে আঞ্চলিক ভাষায় গরম গরম বিপ্লবের বাণী শোনায়—রিনির কাছে সবটাই ভণ্ডং মনে হয়। সবাই যেন গ্রামবাংলাকে ভালোবাসার মুখোশ পরে বসে আছে। পারিবারিক জীবনেও অমলের একটা মুখোশ আছে, সেটা আপসের মুখোশ। ও জানে, সংসারের বাইরে রিনির একটা নিজস্ব জীবন আছে। সে জীবন ওদের সম্পর্কের মাঝখানে ধীরে ধীরে পাঁচিল তুলতে শুরু করেছে। অথচ তার জন্যে অমলের বিশেষ কোনো আপত্তি বা অভিযোগ নেই। আসলে ওর নিজের জীবনযাত্রায় রিনির জন্যে কোনো অভাববোধই নেই। নিজের চাকরি আর নাটকের দল নিয়ে ও বেশ আছে। ওর উদাসীনতা, সব কিছু জেনে বুঝে চুপ করে থাকা—এই মুখোশটাকেই রিনি আর সহ্য করতে পারে না।

টেড পোস্ট অফিস থেকে ফিরে এলো। সোয়া দুটো বেজে গেছে। ও পাশে এসে বসতেই রিনি বললো—"এবার আমাকে ফিরতে হবে। দেখছো কি রকম

বরফ পড়ছে ! এরপর গাড়ি চালাতে কষ্ট হবে।"

টেড এক মুহূর্ত থমকে গেলো—"এক্ষুণি বাড়ি চলে যাবে ?"

"হ্যাঁ, তিনটের সময় বাচ্চারা ফিরবে জানো তো।"

পার্কিং লটের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে টেড বললো—"ক্রীসমাসের ছুটিতে একটা পুরোদিন আমার সঙ্গে কাটাবে ? ডিনার পর্যন্ত ?"

"পুরো দিন কি পারবো ? তখন তো বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ থাকবে।"

"বেশ, তবে সন্ধ্যেবেলা কোনো অফ্ ব্রডওয়ে শো দেখে ডিনারে যাবো ?" নাটকের ব্যাপারটা শুধু অমলদেরই একচেটে নয়, টেড নিজেও নাটক বোঝে, দেখতে ভালোবাসে। নিউইয়র্কের ব্রডওয়ে শোর জাঁকজমক রিনি বহুবার দেখেছে। কিন্তু তা ছাড়াও ছোট থিয়েটার পাড়ায় বা অফ্ ব্রডওয়েতে কত যে বিদগ্ধ ভাবনার, বিমূর্ত চিন্তার নাটক টেড ওকে দেখিয়েছে। মাঝে মাঝে ওরা উডি অ্যালেন বা নীল্ সাইমনের ছবি দেখে। অ্যাটেনবোরোর 'গান্ধী' রিলিজ করার প্রথম সপ্তাহে টেড লাইন দিয়ে টিকিট কেটে এনেছিল রিনি, বাবুই আর টিনার জন্যে।

পার্কিং লটে ফিরে এসে টেড রিনির গাড়ির কাছাকাছি পার্কিং না পেয়ে একটু দূরে পার্ক করলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো—"আর পাঁচ মিনিট আমার কাছে বোসো। দ্যাখো, এখন আর বরফ পড়ছে না।" দুজনে কাছাকাছি বসে রইলো। টেড রিনির হাওয়ায় এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে হঠাৎ বললো—"এই তাড়াহুড়ো করে আসা আর চলে যাওয়া কবে শেষ হবে রিনি ?"

"জানি না। হয়তো এই রকমই চলবে। তুমি তো আমার অবস্থা জানো।"

"আসলে তুমি ভীষণ দুর্বল। কিছুতেই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারো না। কেন পারো না বল তো ?" টেডের গলায় প্রচ্ছন্ন অভিমান।

রিনি এই প্রশ্ন নিজেই নিজেকে করে কত সময়। উত্তরও নিজেই মনে মনে সাজিয়ে নেয়। সংসার যতই একঘেয়ে হোক, অমলের শীতল সান্নিধ্য যতই অসহ্য মনে হোক—তবু তো নিরাপত্তা, তবু তো আশ্রয়। টিনা বাবুই-এর জন্যে ও কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। একবার রাগের মাথায় অমল বলেছিল—"তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। এর ফলাফল কিন্তু ভালো হবে না।"

"কেন ? ডিভোর্স করবে ?"

"হ্যাঁ, দরকার হলে তাই করবো। আর ছেলেমেয়ে ছাড়া তোমাকে চলে যেতে হবে।" শুনে রিনি কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর অবৈধ ভালোবাসার দোহাই দিয়ে অমল যদি ডিভোর্স নেয়, ছেলেমেয়ে ও নাও পেতে পারে। টেডকে আরও বড় একটা সংশয়ের কথা ও বলতে পারে না, যে, টেডের ভালোবাসার প্রতি ওর নিজের কোনো গভীর বিশ্বাস নেই। এই কারণেই পাকাপাকি ভাবে টেডের কাছে চলে যেতে সাহস হয় না। এখন যতই উত্তাপ থাক, আমেরিকানদের বিয়ে করা আর বিয়ে ভাঙার জের তো কম দেখছে না।

এখানকার সিঙ্গল্ মহিলাদের মত নিঃসঙ্গ জীবন ও ভাবতে পারে না। এত রকম হিসেব-নিকেশের পরেও ইদানীং মনের মধ্যে সব সময় কি এক অপরাধ-বোধ জেগে থাকে। বিবাহিত জীবনের অতিরিক্ত যে অন্য এক ঘনিষ্ঠ জীবন ওকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তার থেকে মুক্তি অথবা তার কাছে বাঁধা পড়া—এই দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে।

আড়াইটে বেজে গেছে। রিনি নিজের গাড়িতে বাড়ি ফিরছে। আবার বরফ পড়তে শুরু করলো। বড় বড় পেঁজা তুলোর মত বরফে পথঘাট সাদা হয়ে যাচ্ছে। দেখতে অসুবিধে হচ্ছে বলে ওয়াইপার চালিয়ে কাঁচ পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করছে। রাস্তা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। অসাবধানে গাড়ি চালালে যে কোনো সময় স্কিড করতে পারে, নয়তো অন্য গাড়ি এসে ধাক্কা মারতে পারে। লাল আলোর জন্যে বারবার থামতে হচ্ছে। পড়ন্ত বিকেলে সবুজ আলোর সামনে দিয়েও লোকেরা হুড়মুড় করে রাস্তা পার হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ব্রেক দিতে দিতে চলেছে। তিনটের মধ্যে বাড়ি ফেরা খুব দরকার। টিনা, বাবুই স্কুল বাস থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকতে না পারলে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবে। কেন যে এই বরফের দিনে টেড ডাকলো, এখন ওর ওপরেই রাগ হচ্ছে। টিনার কিছুদিন আগে ব্রংকাইটিস হয়েছিল। এখনও কাশি রয়েছে। আবার যদি আজ নতুন করে ঠাণ্ডা লাগে। হিলম্যানদের ছোট ছেলেটার এরকম ভাবেই হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। রিনি আর ভাবতে পারছে না। আরও দুটো ট্রাফিক লাইট পেরিয়ে গেলো। বরফের আস্তরণে পথঘাট ঢেকে গেছে। গাড়ি দুবার সামান্য স্কিড করলো, আর জোরে চালাতে সাহস হচ্ছে না।

পাড়ার মোড়ে পৌঁছে দেখলো, স্কুল বাস বড় রাস্তার দিকে চলে গেলো। তার মানে টিনা, বাবুই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখলো ড্রাইভওয়ের ওপর কোট টুপি পরা দুটো ছোট্ট মানুষ অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ডোর বেল বাজাচ্ছে। রিনির বুকের ভেতর হু হু করে উঠলো। টিনা কাঁদছিল। বাবুই গাড়ি দেখতে পেয়ে বরফের ভেতর ছুটে এলো। গাড়ি থেকে নেমে রিনি ওদের দুহাতে জড়িয়ে ধরলো।

রাত এগারটা। টিনা, বাবুই ঘুমিয়ে পড়েছে। অমল একতলার ফ্যামিলি রুমে বসে ওদের নাটকের জন্যে গান টেপ করছে। বাইরে বরফ পড়া থেমে গেছে। রিনি দোতলার জানলা দিয়ে দেখলো ওদের বরফে ঢাকা বাগানে মরা চাঁদের বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে আছে। ও বহুক্ষণ ধরে মনে মনে টেডকে একটা চিঠি লিখতে চাইছে। তার শুরু যেমনই হোক, শেষটা হয়ত হবে এরকম ঃ গত কয়েকমাস ধরে আমার ঠিকানাবদলের কথা অনেক ভেবেছি। অথচ ক্রমশ বুঝতে পারছি আসল ঠিকানা খুঁজে নেওয়া বড় শক্ত। মুক্তির স্বরূপ আজও আমার স্বচ্ছ নয়। তোমার কাছ থেকে চলে আসার সময় মনে হয়েছিল উজ্জ্বল আকাশের হাতছানি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। বরফের ঝড়ে গাড়ি চালাতে চালাতে বাড়ি ফেরার ভাবনায় কখন সেই আকাশের ছবিটা হারিয়ে গেলো।

যখন দেখলাম, শীতের বিকেলে বরফের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার ছেলেমেয়ে দুটো কাঁদছে, আমাকে পেয়ে আশ্রয় জেনে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন মনে হল আজও আমার নতুন করে ঠিকানা খোঁজার অধিকার নেই ; সময় নেই···জানি না ওরা আমার আশ্রয়, না আমি ওদের। অমলকে যদি ছেড়ে যাই, ও ওদের ছাড়বে না। তুমি আমাকে চেয়েছো, কিন্তু ওদের কতখানি চাও—স্পষ্ট করে কখনো বলোনি। হিসেব খুব জটিল হয়ে আসছে। সহজে কোনো সমাধান হবে বলে আশা করি না। অথচ এই পার্টটাইম ভালোবাসাবাসির খেলায় তোমার ক্লান্তি, আমার পাপবোধ, অমলের সন্দেহ···সিঁড়িতে অমলের পায়ের শব্দ উঠে আসছে। রিনির চিঠিটা আর শেষ হলো না।

॥ ৯ ॥

সানকার লোসের স্বপ্ন

আমরা যে আমেরিকা ফেরত মানুষ, আমাদের ঠাকুরপুকুরের লোকজন একদম বিশ্বাস করে না। ওদের মুখ দেখে বোঝা যায় মার কথাগুলো বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছে না। বানানো বলেই ভাবে বোধহয়। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের জীবনযাত্রায় কোথাও কোনো প্রাচুর্যের চিহ্ন নেই। এখনও কত লোকের ধারণা, আমেরিকা মানে খোদ বড়লোকের দেশ। হাতে ডলার থাকলে সারা পৃথিবী হাতের মুঠোয়। হয়ত খুব ভুল ধারণাও নয়। দেখি তো এক-আধজন মানুষকে। একেবারে ছাপোষা বাড়ি থেকে নিউইয়র্কে গিয়ে হাজির। তারপর যখন কলকাতায় বেড়াতে এল টাকাপয়সা আর ফরেনের জিনিসপত্র নিয়ে কি হেলাফেলা! তাসের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে সিগারেটের প্যাকেট। ভালো ভালো সাবান আর সেণ্ট দিয়ে হরির লুঠ। শিপ্রাদির বোনকেই দেখছি। গতবার দুটো উলি জর্জেট শাড়ি এনে একটা দিল শিপ্রাদিকে। ঠিক ফিরে যাবার মুখে অন্যটা দিয়ে গেল বাড়ির কাজের মেয়েটাকে। শিপ্রাদি রেগে আগুন। তখনও নতুন শাড়িটার ফল্‌স বসানো হয়নি, ব্লাউজ কেনা বাকি, তার মধ্যে জবা নামে কাজের মেয়েটাও হুবহু এক শাড়ি বগলে ঘুরছে। শিপ্রাদির শাশুড়ি হেসে খুন—"তোমার বোন দেখি আমেরিকায় বইস্যাই কমিউনিস্ট হইয়া গ্যাছে। তার কাছে তুমিও যা. জবাও তা।"

আমার অবশ্য সে দেশ সম্পর্কে কোনো স্মৃতি নেই। শুধু মার একটা সাতকালের পুরনো পাসপোর্টে প্রমাণ আছে আমরা সে দেশের ছাপ নিয়ে এসেছিলাম। মার একটু ইচ্ছে, আশেপাশের লোকজনদের সেটা বের করে দেখায়। আমরা যে নেহাত হেঁজিপেজি লোক ছিলাম না, এখন অদৃষ্টের ফেরে এমন মামুলি জীবন কাটাচ্ছি, পাসপোর্ট দেখিয়ে সে সবই বোধহয় বোঝাতে চায়। দেবু ধমকে রাখে বলে শেষ পর্যন্ত সেটা আর হয়ে ওঠে না। আমিও ভাবি, কি লাভ ? থাকি একটা হতশ্রী পুরোনো ভাড়া বাড়িতে। দেবুর ব্যাঙ্কের

চাকরি আর আমার রামকৃষ্ণ মিশনের কাজটা মিলিয়েও সংসারের যা হাল, এরপর আর আমেরিকার সাতকাহন শোনানো যায় না। আমাদের কাছে বর্তমানই সব। আমেরিকায় জন্মেছিলাম, তবু ঠাকুরপুকুরের এই ভাঙাচোরা বাড়িতেই তো জীবনের চব্বিশ-পঁচিশ বছর কাটলো। মাথার ওপর বাবা নেই। মা সংসার নিয়ে জেরবার। আমি দেবু বুলা খোকন—আমাদের সামনে কিই বা সুখের দিন অপেক্ষা করে আছে ?

তবু আমি অনুভব করছি, আমার ভাবনার রাজ্যে কোথাও একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কখনো মনে হয়, এক জীবনে জন্মান্তর ঘটে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়ায় দেখি অন্য দেশের অন্য কোনো মানুষের মুখ। আমি, অথচ যেন আমি নয়, আর একজন এই চেনা জীবনের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে গেছে। দীর্ঘশ্বাসের মতো স্বর শুনি। যেন তার আর আমার মাঝখানে বিশাল জলরাশির দূরত্ব। সেই মহাসমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আমার অবচেতনের বেলাভূমি স্পর্শ করে ফিরে যায়। নিরন্তর ছলছল শব্দ তুলে ভেসে যেতে থাকে।

কখনো রাতে ঘুমের ঘোরে দেখি সারা আকাশ জুড়ে অন্য এক মহাদেশের মানচিত্র। সেখানে পাইন বনের মাথায় সোনালি রংএর চাঁদ। আমার স্বপ্নের জলযান ভেসে ভেসে বহুদূরে মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে সংকেতের প্রতিধ্বনি রেখে যায়। চেতনার মধ্যে কার যেন অবিশ্রাম ডাক শুনি। আমি শুধু কথা দিয়ে রাখি—যাবো কোনোদিন যাবো।

এবং আশ্চর্য রাতের এই সব অভিজ্ঞতা ক্রমশ ক্রমশ আমার দিনের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছে। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি কোথাও আমার যাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। এই ঘর, মধ্যবিত্ত সংসারের খুঁড়িয়ে চলা, প্রাত্যহিকতার ক্লান্তিকর যুদ্ধ আমার জন্যে নয়। বহু দূরে সেই অনন্ত জলরাশির অন্য প্রান্তে আমার জন্মভূমি সানকারলোস্ আমারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

পাসপোর্টে আমার নাম লেখা আছে ঊর্মিমালা। অত বড় নাম ধরে কেউ ডাকে না। ঊর্মিটাই চলে আসছে বরাবর। শংকর মামার দেওয়া নাম। তাঁকে কখনো দেখিনি। অথচ আমার জন্মের সময়ে শংকর মামাই ছিলেন বিদেশে মার একমাত্র আপনজন। সে সময় উনি ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতেন। নিজে ডাক্তার, বউ রিসার্চ সায়েন্টিস্ট। দুজনের উদয়াস্ত পড়াশোনা আর কাজের চাপ। ছেলে-মেয়েকে সঙ্গ দেবার সময় নেই। স্কুল খোলা থাকলে তবু একরকম। বাচ্চাদের অনেকখানি সময় স্কুলে কাটে। মুশকিল হয় গরমের ছুটিতে। সে সময় ওঁরা শংকর মামার মা নয়তো শাশুড়িকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতেন। একবার কেউই যেতে পারলেন না। ওঁরাও ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। যদি কয়েক মাসের জন্যে কাউকে পাওয়া যায়, তো প্লেনের টিকিট কাটাবেন। পাকাপাকি থাকতে রাজী হলে আরও ভালো। ওঁদের সংসার

দেখার জন্যে দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন কাউকে পেলে থাকা খাওয়া ছাড়াও ভালো মাইনে দেবেন।

বাবার তখন বদলির চাকরি। আজ এখানে, কাল সেখানে। মাকে সঙ্গে নিতে পারেন না। ঠাকুমার সংসারে পিসিদের দাপটে মার মন মেজাজ খারাপ থাকতো। বাবার ওপর গোটা সংসারের চাপ। আলাদা সংসার করার ইচ্ছে থাকলেও সঙ্গতি বা সাহস কোনোটাই হয়ত ছিল না। এ রকম সময়েই শংকর মামার মার কাছে সব শুনে মা কয়েক মাসের জন্যে আমেরিকায় যাবে বলে জেদ ধরে বসলো। ঠাকুমা অশান্তি করলেও বাবা শেষ পর্যন্ত বাধা দেননি। কথা ছিল চার মাসের মধ্যে মা ফিরে আসবে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছেও মা বোঝেনি সে সময় মার পেটে সন্তান এসেছে। যখন বুঝলো, তখন দেশে ফেরার জন্যে অস্থির। ঐ অবস্থায় শংকর মামাও কোনো দায়িত্ব নিতে চাননি। কিন্তু ওঁর বউ কিছুতেই মাকে ছাড়তে চাইছিলেন না। ওঁদের সংসারের সুরাহা হয়েছে, ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে মা সর্বক্ষণ দেখাশোনা করছে, বাংলা শেখাচ্ছে, এসব সুবিধের জন্যেই হয়ত। কিন্তু মা বলে, উনি ভালো পরামর্শই দিয়েছিলেন। নিজে চেনাশোনা হাসপাতালে ডেলিভারির ব্যবস্থা করে দেবেন বলে ভরসা দিয়েছিলেন মাকে। বুঝিয়েছিলেন মার বাচ্চা যদি আমেরিকায় জন্মায়, সে জন্মসূত্রেই আমেরিকান সিটিজেন হয়ে যাবে। তার জন্যে আমেরিকার দরজা চিরকাল খোলা থাকবে। মার যা কিছু টানাপোড়েন ছিল বাবার জন্যে। বাবাকে লিখে জানানোর পর পরিস্থিতি বুঝে বাবাও মেনে নিয়েছিলেন।

চিঠিতে এই সব মতামত নিতে নিতেই আমার জন্মের সময় হয়ে গিয়েছিল। সানফ্রানসিসকোর কাছে সান্‌কারলোস শহরে ছিল শংকর মামার হাসপাতাল। প্রশান্ত মহাসাগরের পটভূমিতে আমার জন্ম। শংকর মামা নাম রেখেছিলেন— ঊর্মিমালা। আমি মার্কিন নাগরিক হয়েছিলাম জন্মমুহূর্তে। কিন্তু মা আর আমার জন্যে আলাদা পাসপোর্ট করায়নি। তিন মাস বাদে নিজের ভারতীয় পাসপোর্টের মধ্যে আমার নাম লিখিয়ে নিয়ে বরাবরের মতো দেশে ফিরে এসেছিল।

তারপর এ সংসারের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় দুঃখ, অসময়ে বাবা চলে গেছেন। আমরা চার ভাই বোন সেই দুঃসময়ে মাকে আশ্রয় করে আজ এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। আমি আর বুলা দুজনে বি. এ. পাস করেছি। দেবু এম. কম. আর খোকন এখনও স্কুলে। সামান্য পুঁজি নিয়ে কিভাবে যে মা সংসার চালিয়েছে এতকাল, যত বড় হয়েছি, ততই ভেবে ভেবে আশ্চর্য হয়েছি।

আমেরিকার ভূত আমার ঘাড়ে চাপানোর জন্যে রাণার ওপর মার বেশ রাগ। অথচ নিজেই আবার হঠাৎ হঠাৎ বাক্স হাঁটকে পাসপোর্টটা বের করে পাতা উলটে দেখতে বসে। রাণাকে চিনি অনেকদিন। আমাদের মিশনের

কাছেই একটা কেমিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করে। বিয়ের কথা যে আমরা ভাবি না এমন নয়, কিন্তু ভরসা পাই না। তা ছাড়া আমি তো আর এ মুহূর্তে এ বাড়ির সব দায়িত্ব দেবুর ঘাড়ে চাপিয়ে পালিয়ে যেতে পারি না। কবে পারবো, সেও জানি না। এই সব জটিল সমস্যাকে সাময়িকভাবে দূরে রেখে আমরা দুজনে মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। অবান্তর কথা আর অসম্ভব পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে রাণাই একদিন বলেছিল—

—"আমেরিকায় জন্মে কেন যে পড়ে আছো এখানে। আমি হলে কোন্‌কালে চলে যেতাম!"

—"বলা খুব সোজা। যেতে গেলে দেখবে প্রচুর ঝামেলা।"

—"কিসের ঝামেলা? পাসপোর্ট আছে তো?"

—"না, মার সঙ্গে এনডোরস্‌ করা ছিল।"

—"এনডোর্সমেণ্ট তো ওদেশেই করেছিল, তুমি জন্মানোর পর? সেটাই একটা প্রমাণ। তা ছাড়া বার্থ সার্টিফিকেট নেই তোমার।?"

—"মা কিছুই দেখাতে পারে না। হারিয়ে ফেলেছিল হয়ত।"

রাণা ঠিক হাল ছাড়ার মানুষ নয়। আবার কদিন বাদে আমাকে ধরে পড়লো—"কোথাকার হাসপাতালে জন্মেছিলে জানো কিছু?"

—"ক্যালিফোর্নিয়াতে। সান্‌কারলোস্‌ নামে একটা জায়গায়। হাসপাতালের নাম মার ঠিক মনে নেই। একবার বলছে সেণ্ট ভিনসেণ্ট, একবার বলছে সেণ্ট মাইকেল।"

সেদিন রাণা আমার জন্মের তারিখ টুকে নিলো। শংকর মামার ঠিকানা চাইছিলো। শংকর মামা মারা গেছেন অনেকদিন। তাঁর বউ কোথায় কে জানে? ছেলেমেয়েরা আমাদের চিনবেও না। ঠিকানা হয়ত এখানে শংকর মামার ভাইপোদের কাছে থাকতে পারে। এতকাল বাদে ওঁর ছেলেমেয়েদের কাছেও কোনো খোঁজই পাওয়া যাবে না।

রাণা কিন্তু কদিনের মধ্যে হাসপাতালের নাম যোগাড় করে ফেললো। একটা অ্যাপ্লিকেশন এনে বললো—"পড়ে নিয়ে সই করে দাও।" দেখলাম সেণ্ট ভিনসেণ্ট হাসপাতালের ঠিকানায় চিঠি লেখা হয়েছে। পঁয়ষট্টি সালের ১৮ ডিসেম্বরে জন্মানো উর্মিমালা রায় তার বার্থ সার্টিফিকেটএর কপি চেয়ে পাঠাচ্ছে। একগাদা স্ট্যাম্প সেঁটে চিঠিটা পাঠানো হলো।

দিন যায়, উত্তর আসে না। ভেতরে ভেতরে বেশ বুঝতে পারছি—আমার অপেক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ঘটনাটা নিয়ে আর আমি উদাসীন থাকতে পারছি না। বাড়িতেও বেশ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছি। মার অবশ্য সেই এক কথা—"হয়ত হাসপাতালটাই উঠে গেছে এতদিনে। আজকের কথা নাকি? আর থাকলেও অতদিনের রেকর্ড রাখা সম্ভব? কত গাদা গাদা বাচ্চা হচ্ছে রোজ।"

খোকন বিজ্ঞের মতো বলল—"হাসপাতাল অত সহজে উঠে যায় না। তার ওপর আমেরিকার হাসপাতাল। দেখবে সব রেকর্ড ঠিকঠাক আছে। নেংটি

ইঁদুররা এখনও এখানে ভীষণ বিজি। সাঁতরে যাবার সময় পায়নি।"

কয়েকদিন পরে ডাকবাক্সে লম্বা সাদা খাম দেখে আমার উত্তেজনায় বুক কাঁপছিল। স্ট্যাম্পের ওপর এব্রাহাম লিংকনের দাড়িওলা ছবি। সাবধানে খুললাম। পাছে সার্টিফিকেট ছিঁড়ে যায়। কিন্তু ভেতরে শুধু একটা চিঠি। হাসপাতালে বার্থ সার্টিফিকেটের কপি আছে। কিন্তু আমাকে আইডেণ্টিফিকেশনের জন্যে কলকাতার আমেরিকান কনসুলেটে দেখা করতে হবে। তারপর সার্টিফিকেট হাতে পাবো।

আমেরিকান কনসুলেটে মা আর রাণাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। মার পাসপোর্ট, আমার স্কুল কলেজের সার্টিফিকেট, দরকারী যা যা মনে পড়লো সঙ্গে সে সবও নেওয়া হলো। কিন্তু সেদিন বিশেষ কাজ হলো না। মা যে আমার মা, এ কথা প্রমাণ করতেও কাগজপত্র দরকার। মার বিয়ের সার্টিফিকেট কোথায় পাবো? আমার জন্মের সার্টিফিকেট থাকলে তো ভাবনাই ছিল না। শেষ পর্যন্ত পাসপোর্টই প্রমাণ করলো মা হচ্ছে সুরমা রায়, দেবীপ্রসাদ রায়ের স্ত্রী। সেই পাসপোর্টে এনডোর্স করা মেয়ের নাম ঊর্মিমালা রায়। আমার হায়ার সেকেণ্ডারী সার্টিফিকেট প্রমাণ করলো আমিই দেবীপ্রসাদ রায়ের মেয়ে ঊর্মিমালা রায়। ছবি তোলা, নোটারি পাবলিকের সই, অ্যাটেস্টেশন—সব পর্ব শেষ করে আমার হাতে বার্থ সার্টিফিকেট এল। রাণার পরামর্শে তখনই আমেরিকান পাসপোর্টের জন্যেও অ্যাপ্লাই করে দিলাম।

মা বুঝতে পারছে দেশ ছাড়ার জন্যে আমি তৈরি হয়েছি। ভাইবোনদের মধ্যেও একই আলোচনা। শুধু দেবু সামান্য গম্ভীর। একদিন রাতে আমার বিছানার ধারে এসে বসলো—"তুই কি সত্যি সত্যি যাবার কথা ভাবছিস?"

—"ভাবছি। এদেশে থেকেই বা কি হবে?"

—"তবু চলে তো যাচ্ছে একরকম। ওদেশে একা একা কোথায় থাকবি, কি চাকরি পাবি, তোর তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই?"

—"কার আর কত এক্সপিরিয়েন্স থাকে? অত ভাবলে আর যাওয়া যায় না। যা হোক একটা কিছু পেয়ে যাবো। আমেরিকায় সবাই শুনি কিছু না কিছু করছে।"

—"প্যাসেজ মানির কথা ভেবেছিস? চোদ্দ পনের হাজার টাকা যোগাড় করবি কি করে?"

—"ভাবিস না। রাণা একটা ব্যবস্থা করছে।"

দেবু কেমন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো—"রাণাদার কাছে টাকা নিচ্ছিস?"

—"দুর! রাণা কোথা থেকে দেবে? অন্য একটা সোর্সে টিকিট ম্যানেজ করতে চেষ্টা করছে।"

—"সোর্সটা কি? কে দিচ্ছে অতগুলো টাকা?" মা কখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

সময় হলে আমি সবই বলতাম। কোনো গোপন ব্যাপারও নয়। মা আর

দেবুর কাছে খুলে বললাম। রাণার চেনা এক ভদ্রলোকের দাদা নিউইয়র্কে ব্যবসা করেন। তাঁর গুজরাতি পার্টনার হরিশ প্যাটেল নিজেদের সংসারের জন্যে হাউস কীপার চাইছেন। দরকার হলে প্লেনের টিকিট পাঠাবেন। তবে এগ্রিমেণ্ট থাকবে, এক বছর সে বাড়িতে কাজ করতে হবে। থাকা খাওয়ার খরচ লাগবে না। মাইনেও মন্দ না।

মা কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বললো—"সিটিজেন হয়ে কেন তুই অন্যের সংসারে খাটতে যাবি? বি. এ. পাস করেছিস। অন্য কত কাজ পেয়ে যেতিস।"

—"টিকিটের টাকাটা পেয়ে যাচ্ছি যে। তা ছাড়া একদিক থেকে বরং ভালোই হলো। প্লেন থেকে নেমে কোথায় যাবো, কার কাছে উঠবো সে সব ভাবনাও থাকবে না। আর মাত্র একটা বছরের তো ব্যাপার। ততদিনে কিছু জমিয়েও নেব। তারপর ভালো চাকরি যোগাড় করে তোমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো।"

দেবু ম্লান হাসলো—"আমাদের জন্যে তুই অত ভাবিস না। আমি তো আছি। নিজে আগে ভালো মতো সেটল কর।"

মা কিন্তু আমার শেষের কথাটায় কেমন ভরসা পেল। নিজের শীর্ণ হাত-খানা আমার পিঠের ওপর রেখে বড় অনুনয়ের মতো করে বলল—"সময় হলে ওদের নিয়েই যাস। এ পোড়া দেশে থেকে কি-ই বা করবে? সংসারের হাল তো দেখে গেলি।"

সে রাতে আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত জেগেছিলাম। দেবুর কথাই মনে হচ্ছিল। আমরা পিঠোপিঠি ভাইবোন। সুখেদুঃখে পাশাপাশি বড় হয়েছি। ভেতরে ভেতরে এমন যে গভীর ভালোবাসা ছিল, দূরে যাবার সময় হয়েছে বলেই বোধহয় উপলব্ধি করতে পারছি। খোকন, বুলাও আমার প্রিয়। তবু যেন ছোট ভাই হয়েও দেবু অনেকটা বন্ধুর মতো।

সংসারের জন্যে এরকম উদ্বেগ, মায়া মমতা এত কম বয়স থেকে ওর বয়সী ছেলেদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। এই যে আমার যাওয়া নিয়ে ওর দুর্ভাবনা, তার কারণও সেই দায়িত্ববোধ। দেবু ভাবছে এ বাড়ির অভাব মেটানোর জন্যে আমি এমন ঝুঁকি নিচ্ছি। এতটুকু চাহিদা নেই, প্রত্যাশা নেই। একবারও বলছে না ওর নিজের জন্যে আমেরিকা থেকে কোনো কিছু চাই কিনা।

হরিশ প্যাটেল আমাকে কণ্ট্র্যাক্ট পাঠালেন। এক বছরের সাংসারিক কাজের দায়িত্বে সই করে দিলাম। মাইনে যা দেবেন, আমার কোয়ালিফিকেশনে এদেশের হিসেবে কল্পনা করাও যায় না। হিসেবপত্র করে দেখলাম মাসে আড়াইশো ডলার। মানে বেশ কয়েক হাজার টাকা। ভদ্রলোক স্পষ্ট লিখেও-ছেন—টাকাটা ওদেশের 'মিনিমাম ওয়েজের' চেয়ে অবশ্যই কম। কিন্তু প্লেন ভাড়া, থাকা খাওয়ার খরচ দিচ্ছেন বলে এর বেশি দেওয়া সম্ভব হবে না। আমার অত হিসেবে কাজ কি? জীবনে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা কুড়োতে

পারছি, এই তো অনেক।

রাণার কাছে আমার কিছু ঋণ জমে আছে। কৃতজ্ঞতার ঋণ। ওর উৎসাহ আর সাহায্য না পেলে হয়ত আমার যাওয়াই হত না। ঋণ শোধ দেবার জন্যে আমি যা করতে পারি, সে কি এখনই সম্ভব? বিদেশ যাত্রার তোড়জোড় করতেই কতদিন চলে গেল। খরচপত্রও কম হল না। এরপর ছোট্ট একটা সই করেও যদি রাণাকে বিয়ে করতে চাই, দুজনের বাড়িতেই কিছু বোঝাপড়ার ব্যাপার আসবে। আমি জানি, কোনো পক্ষই ঠিক প্রস্তুত নয় এখনও। অথচ এ যাত্রা, এই যে যাবো, সহজে আমার আর দেশে ফেরা হবে না। বিয়ে থা সেরে গেলে আমার স্বামী হিসেবে বছর খানেকের মধ্যে রাণা ইমিগ্রেশন পেয়ে নিজেই ওখানে পৌঁছে যেতে পারতো। হয়ত মনে মনে এরকমই আশা করছে। কিন্তু নিজে থেকে কোনো প্রসঙ্গ তুলছে না।

হরিশ প্যাটেলের পাঠানো টিকিট আসার পর হাতে আর বিশেষ সময় থাকল না। মাস খানেক বাদে রওনা দিতে হবে। পাড়াতে খুব রটিয়েছে খোকন। কয়েকটা নেমন্তন্নও খাওয়া হয়ে গেল আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। দেবু আমাকে নতুন সুটকেশ কিনে দিয়েছে। আমি যে কি চাকরি নিয়ে যাচ্ছি, খোকন অবশ্য সে সব মোটেই বলার দরকার মনে করছে না। আমেরিকার মেয়ে আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছে, যেন এটাই স্বাভাবিক। আমি ঠাট্টা করছিলাম—"গ্লোরিফায়েড ঝি-র প্রোফেশনটা নিয়ে তোদের এত কমপ্লেক্স কেন? আমি তো নিশ্চিন্ত, গিয়েই একটা ফ্যামিলির মধ্যে থাকব।"

খোকন হেসে উঠল—"এক বছর বাদে অবশ্য হরিশ প্যাটেলের হরিষে বিষাদ হবে। তুই একটা ভালো চাকরি ঠিক পেয়ে যাবি। তারপর আমরা ঠাকুরপুকুর পার্টি লাইন দিয়ে প্লেনে চড়ছি।" বুলার আর তর সইছে না। ওর ধারণা ছিল আমেরিকান সিটিজেন হলে ভাই-বোনদেরও তখনই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়। দেবু বোঝাল—"সিটিজেন আগে সিটিতে যাক। তারপর অ্যাপ্লাই করে ভাইবোনদের ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা করবে।"

মার রাতে এমনিতেই ঘুম হয় না ভালো। এখন নার্ভ একেবারে চড়িয়ে বসে আছে। অনবরত কথা, উপদেশ আর কান্না। তবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চেয়ে একটা ভারতীয় বাড়িতে সাময়িক আশ্রয় পাবো ভেবে খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছে।

এয়ারপোর্টে রাণা আমাদের সঙ্গেই এল। আলাদা করে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। আমার মনে হল ঋণ শোধের জন্যে নয়, রাণার জন্যেই আবার আসতে হবে আমাকে। এতকাল কাছাকাছি থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না, হয়ত দূরে গিয়ে লিখে জানানো সহজ হবে। ও তো নিজে থেকেও কথাটা তুলতে পারত একবার। বোধহয় ভেবেছে ওকে সুযোগ সন্ধানী বলে ভেবে বসতে পারি আমরা।

ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছে। সিকিউরিটি চেকিং-এর লম্বা লাইন দেখতে

পাচ্ছি। রওনা হবার আগে রানাকে বলেছিলাম—"একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে কি বলো ?"

—"তারপর কি করবে ?"

—"তোমাকে নিয়ে যাবো।"

—"আমাকে ? আমার মতো সামান্য লোককে ভিসা দেবে কেন ? আমার গলার কাছে ব্যথা ব্যথা করছিল। চারপাশে মা, দেবু, খোকন, বুলার ঝপেসা মুখ। মাকে প্রণাম করে সিকিউরিটি এনক্লোজারে ঢুকে গিয়েছিলাম।

নিউইয়র্কে হরিশ প্যাটেলের বাড়িতে আসার পর প্রথম কয়েকদিন কাজ শিখতেই কেটে গেল। আমাদের দেশের মতো সংসার করা নয়। ভ্যাকিয়ুম ক্লীনার চালাতে জানি না। ওয়াশিং মেসিন, ড্রায়ার, বাসনমাজার ডিশ-ওয়াশার, এসব যন্ত্রপাতির রহস্য বুঝতে কদিন লাগল। বাড়িতে লোক কম নয়। হরিশ, তার বউ রজনী, দুই মেয়ে, রজনীর বৃদ্ধ বাবা, হরিশের এক ভাই, সব এক বাড়িতে। ভোর ছটায় অ্যালার্ম দিয়ে উঠি। চা থেকে ব্রেকফাস্ট দেওয়া। তাড়াহুড়োর মধ্যে নিজের সকালের চা-টা ভাল করে খাওয়া হয়ে ওঠে না। সকাল আটটার মধ্যে হরিশ, রজনী আর ভাই কাজে বেরিয়ে যান। তারপর সারা দিন ধরে বাচ্চা মেয়ে দুটোর দেখাশোনা, বৃদ্ধের ফাইফরমাস খাটা, লাঞ্চের ব্যবস্থা, রাতের রান্না, সপ্তাহে দু-তিন বার বড় বড় বাস্কেট ভর্তি ছাড়া জামা-কাপড় আর বিছানাপত্র, তোয়ালে কাচার পর্ব। রান্নাঘর, তিনটে বাথরুম পরিষ্কার করা, সারা বাড়ির ফার্নিচার ঝাড়ামোছা, দুটো রাগী চেহারার বেড়ালকে টিন ফুড খেতে দেওয়া, তাদের বালির ট্রেতে সেরে রাখা নিত্যকর্ম বাইরের বাগানে ফেলে আসা—একের পর এক কাজের পরিশ্রমে আমার হাঁফ ধরে যায়। খাওয়া থাকার শর্তে এসেছি বটে, কিন্তু কি যে খাই, নিজের রান্না নিজেরই মুখে বিস্বাদ লাগে। এ বাড়িতে নিরামিষ রান্না, তার ওপর গুজরাটি রান্না তো কখনই খাইনি। অভ্যেস হচ্ছে না কিছুতেই। এক বছর মাছ, মাংস, ডিম খাওয়া বন্ধ থাকবে ভেবে আরও বিরক্ত লাগে।

সারাদিন বাচ্চা দুটোকে দেখাশোনার ফাঁকে ফাঁকে টি ভি দেখার সুযোগ হয়। ওরা মজার মজার কার্টুন শো দেখে। বৃদ্ধ দাদু দেখেন ভি সি আর-এ 'মহাভারত'। মাঝে মাঝে রজনী হিন্দী নয়তো গুজরাটি মুভি এনে দেন। আমি একটু একটু সে সবও দেখি।

বিকেল থেকে আবার সংসারের কাজ। ডিনার দেওয়া, বাসন ধোয়া, হরিশ. রজনী আর সুরেশের অফিসের জন্যে পরের দিনের লাঞ্চ তৈরি করে প্যাকেটে প্যাকেটে ভরে ফ্রীজে রাখি। তবে উইক ডে-তে শুতে খুব রাত হয় না। রজনী বেন আমাকে দশটার মধ্যে বেসমেণ্টে শুতে পাঠিয়ে দেন। ওপর থেকে টি ভি চলার আওয়াজ পাই খানিকক্ষণ। তারপর ওঁদের কথাবার্তা, পায়ের আওয়াজ বেশিক্ষণ শুনতে পাই না। রাত এগারোটার মধ্যে বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

আমার উইক এন্ড বলে কিছু নেই। ছুটির দিনে সবাই বাড়িতে থাকাতে

কাজ আরও বাড়ে। এঁদের বাড়িতে পার্টি লেগেই আছে। তখন যেমন রান্নার চাপ পড়ে, তেমনি বাড়ে অন্যান্য কাজ। বাসনের স্তূপ দেখলে ভয় করে। মেশিন থেকেই বা কি লাভ? বড় বড় রান্নার বাসন তো আর ঢোকানো যায় না! তার ওপর কাঁচের বাসনগুলোও মেশিনে দেবার আগে এঁটোকাঁটা মুছে নিতে হবে। গাদা গাদা কাঁটা চামচ প্লেট বাটি কাপ গেলাস ধুয়ে ধুয়ে হয়রান। রাশি রাশি প্লাস্টিকের ব্যাগে গারবেজ টেনে টেনে বাইরের বাগানে নিয়ে যাওয়া। গারবেজ ক্যানে ঠেসে ঠেসে ঢুকিয়ে ভালো করে ডালা বন্ধ করা। নইলে বুনো জন্তু রেকুন নয়তো রাস্তার বেড়াল এসে ড্রাম উল্টে ছত্রাকার করবে। তখন সেই আবর্জনা উদ্ধারও আমার দায়! প্রতিবাদ করতে পারি না। দাসখত সই করেছি নিজের হাতে। ব্যবহার এঁরা ভালোই করেন। রজনী বেন এয়ার লেটার থেকে শুরু করে ছোটখাটো দরকারী জিনিস নিজে থেকে এনে দেন। মাইনের ডলার আমার খরচ করার দরকার হয় না। কিছুটা বাড়িতে পাঠাচ্ছি।

রজনী বেন জিজ্ঞেস করেছেন এক বছর পরেও এ বাড়িতে থাকতে চাই কি না। আমেরিকা সম্পর্কে ভালোমত কিছুই তো এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না। বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই নেই। অথচ আমি তো এক গুজরাটি পরিবারের মধ্যে জীবন কাটাবো ভেবে এদেশে আসিনি। সাময়িক একটা ব্যবস্থা দরকার ছিল। তবে আর কেন এখানে পড়ে থাকব? রজনী বেন অবশ্য বলেছেন আমার কাজে ওঁদের নির্ভরতা এসে গেছে। বাইরে চাকরি পেলে মাইনে বেশি পাবো ঠিকই, কিন্তু আলাদা অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া নিয়ে থাকা, খাওয়া খরচ, যাতায়াতের জন্যে সাবওয়ে নয়ত বাসভাড়া সব মিলিয়ে রোজগারের অনেকটাই বেরিয়ে যাবে। তার ওপর নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। নিউইয়র্ক তো জায়গা ভালো নয়। আজেবাজে পাড়ায় শস্তার অ্যাপার্টমেণ্টে থাকাও ভয়ের ব্যাপার।

আমি জানি রজনী বেনের ইচ্ছে এখানেই থাকি। এবার একটু ভেবেচিন্তে দেখতে হবে। চার দেওয়ালের মধ্যে ক্রমশ প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। আমি অনেক দায় নিয়ে এসেছি, আর একটি দুটি প্রতিশ্রুতি। আমার এখানে থেকে গেলে চলবে না।

নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়া কত দূর কোনো ধারণা ছিল না। ঠাকুর-পুকুরে বসে ভাবতাম একবার আমেরিকায় এসে পৌঁছলে সানকারলোসে সহজেই চলে যেতে পারব। এখন বুঝতে পেরেছি দূরত্ব কতখানি। এখান থেকে প্লেনে সানফ্রানসিসকো যেতে লাগে ছ'ঘণ্টা। ভাড়াও নিশ্চয়ই অনেক। তারপর বাস ধরে সানকারলোস। যাবো মনে করলেই যাওয়া যায় না।

হরিশ প্যাটেলদের বাড়িতে প্রায় এক বছর হয়ে এল। জীবন ক্রমশ ছকে বাঁধা পড়ে গেছে। রাতে সব কাজ শেষ হলে মাটির নীচে বেসমেণ্টের ঘরে শুয়ে থাকি। নীচু নীচু জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যায় না। আশেপাশের বাড়ি-গুলোর ইঁট কাঠ চোখে পড়ে।

কখনো ঘরের ছাদ দেওয়াল মিলে মিশে অন্য এক দৃশ্য রচনা করে। রাতের নিবিড় কালো আকাশের নীচে সেই হারিয়ে যাওয়া সমুদ্র দেখতে পাই। বালিয়াড়ি থেকে বহু দূরে অনেক ওপরে পাহাড়ে ঘেরা শহর সানকারলোস।

এখনও বহু পথ বাকি। অনেক দায়বদ্ধতা, একটি দুটি আন্তরিক প্রতিশ্রুতি। রজনী বেনকে কথা দেবার আগে এবার সাহস করে এখানে পথে নামব। এত বড় নিউইয়র্ক শহরে একটা চাকরি পাওয়া যাবে না? আমি তো লুকিয়ে বেআইনি ভাবে চলে আসিনি। দস্তুর মতো জন্মের অধিকার নিয়ে এসেছি। আমার যেটুকু শিক্ষা, কাজ জানা আছে, কোথাও ঠিক সুযোগ পেয়ে যাবো।

ভাবতে ভাবতে বিছানায় উঠে বসি। কবে আমি পুরনো আয়নায় আর একজনকে দেখেছিলাম। সে আমাকে এক জীবন থেকে অন্য জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে যেতো। এ মুহূর্তে সেই দ্বিতীয় সত্ত্বাই কি আমাকে এমন করে সাহস দিচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ করছে?

রাণাকে কথা দিয়ে এসেছি, একবার যাবো। দেবু, বুলা, খোকন আর মার প্লেনভাড়া। পরিশ্রম আর সঞ্চয়। সঞ্চয়ের জন্য আরো পরিশ্রম। তার পরে পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলের জন্যে দীর্ঘ পাড়ি দেওয়া। একদিন সানকারলোসে পৌঁছে যাবো। আমার জন্মের শহরকে স্বপ্নের মধ্যে কথা দেওয়া আছে।

॥ ১০ ॥ অজাতক

ফিউন্যারাল হোমে সোমনাথকে দেখতে যাওয়ার জন্যে সুতপা আর রবিবারের বাংলা স্কুলে গেল না। দীপেনেরও হেল্‌থ্‌স্পাতে এক্সারসাইজ করতে যাওয়া হল না। সকালে নিউইয়র্ক থেকে আসা একটা ফোন্ ওদের সারাদিনের ছক পাল্‌টে দিয়ে গেল।

এদেশে আসার পর সাবওয়ে স্টেশনে সোমনাথের সঙ্গে দীপেনের প্রথম আলাপ। নিউইয়র্কে এক হোটেলে ওর সঙ্গে থেকেও ছিল ক'বছর। ক্রমশ দেখা সাক্ষাৎ কমে গিয়েছিল। ইদানীং আসা যাওয়াও হয়নি সেরকম। তবু সোমনাথের খবরটা শুনে সুতপা বলল—'একবার যাওয়া উচিত। এক সময় তো ভালই চিনতে।'

সাংসারিক বা সামাজিক ব্যাপারে দীপেনের বিশেষ পরিকল্পনা থাকে না। সুতপার ক্যালেনডারে লেখা থাকে সারা মাসের ছুটির দিনগুলোর লৌকিকতা আর সামাজিকতার রুটিন। তার প্রত্যেকটাতে যেতে ইচ্ছে না করলেও মেনে নেয়। সুতপার ধারণা—বিদেশে এ সব বজায় না রাখলে অসময়ে পাশে দাঁড়ানোর কেউ থাকবে না। বন্ধুত্ব নয়, পরিচিতের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা। দীপেন ঠাট্টা করে বলে—ক্যালকুলেটিভ সোশ্যাল লাইফ।

কালো স্যুটের সঙ্গে ম্যাচিং টাই পরতে পরতে দীপেন ভাবছিল—অসুস্থ অবস্থায় সোমনাথকে একবারও দেখতে যাওয়া হল না। আজ শুধু নিয়ম রাখার জন্য সুট টাই পরে ফুলের তোড়া নিয়ে যাওয়া নিজের কাছেই কেমন লজ্জার মতো মনে হচ্ছে।

সুতপা যে কীভাবে সবকিছু বুঝে নেয়। সাদা শাড়ির আঁচল কাঁধে পাট করতে করতে বলল—'অসুখে দেখতে যাওয়া হয়নি বলেই আজ একবার যাওয়া উচিত। তবু অনিতার মনে থাকবে ওর দুঃখের দিনে আমরা পাশে ছিলাম। এরপরও একটু খোঁজ খবর করব। বিদেশে কার যে কখন এ অবস্থা হয়···।'

আজকাল এ সব কথা প্রায়ই বলে সুতপা। ক্রমশ মনে একটা ভয় জন্মাচ্ছে। গত কয়েক বছরে চেনাশোনা কজনই তো মারা গেল। বিদেশে এক একটি মৃত্যু বড় বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে যায়।

ফিউন্যারাল হোমের পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করতে করতে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিরাট বাড়িটার মধ্যে এক একখানা ঘরে এক একটি দেহ সাজিয়ে রাখা আছে। ঢোকার মুখে লবিতে খাতায় নাম সই করতে গিয়ে দীপেন লক্ষ্য করল সুতপার হাত কাঁপছে। ওর পিঠে হাত রেখে হলওয়ে দিয়ে ভেতরে এগিয়ে গেল। ডানদিকের ঘরে কোনও আমেরিকান মহিলার কাসকেড রাখা। ঘর ভর্তি চেয়ারে লোকজন বসে আছে। শব্দহীন নিথর নিস্তব্ধ পরিবেশ।

সোমনাথের কাসকেডের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই দীপেনের মনে হল কত ছোট দেখাচ্ছে ওকে। কাঠের বাক্সে সিলকের বিছানায় ধুতি পাঞ্জাবি পরে শুয়ে আছে যেন একটি কিশোর। চুল সযত্নে আঁচড়ানো। পাউডার দেওয়া মুখে সামান্য চন্দনের ফোঁটা ফিউন্যারাল হোমের লোকেরা ওর দেহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবার পর কোনও বাঙালি সাজানোর সময় সাহায্য করেছে। দুই হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখা। বন্ধ চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। সোমনাথ তাকিয়ে থাকলে হাসিতে চোখ ভরে থাকত।

সামনের সারির চেয়ারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো অনিতা বসে আছে। সুতপা ওর হাত ধরে নিঃশব্দে কাঁদছে। বাচ্চা মেয়ে দুটো অবাক হয়ে লোকজন দেখছে। সারা জীবনের জন্যে কী যে হারাল সে কথা বোঝারই বয়স হয়নি ওদের।

দরজার কাছে কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে দীপেন ঘুরে দাঁড়াল। সোমনাথের বাবাকে ধরে ধরে আনছে বিমান। ভদ্রলোক কালকের ফ্লাইটে এসেছেন। শোকে ক্লান্তিতে বিহ্বল অবস্থা। কাস্‌কেডের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। দু'হাত দিয়ে ছেলের গালে মাথায় স্পর্শ করে ফিস ফিস করে কী যেন বলছেন। কান্না জড়ানো সেই অস্পষ্ট স্বর শুধু ভাঙা ভাঙা ভেসে আসছে—বাবু, আমি এসেছি···

দীপেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল না। বাড়িটার মৃত্যুশীতল পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে বৃদ্ধের চাপা কান্নার শব্দ। লবিতে বেরিয়ে এসে দেখল সুমন্ত্রদা

চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দীপেনকে দেখে বললেন—'বুড়ো মানুষ! এখনও জেট্ ল্যাগ যায়নি। তার ওপর এরকম শক।'

অমিতাভদা বললেন—'এই এক ব্যাপার দেখেছিলাম ভাস্কর মারা যাওয়ার সময়েও। ছেলের অসুখের খবর পেয়ে মার দেশ থেকে আসতে আসতে সব শেষ হয়ে গেল।'

দীপেন ক্লান্ত ভাবে বলল—'আমরা কতদূরে থাকি সুমন্ত্রদা। কিছু হলে আত্মীয় স্বজন এসে পৌঁছতেই পারে না।'

সুমন্ত্রদা কেমন অদ্ভুত হেসে বললেন—আমেরিকায় সব কি পাওয়া যায়। অ্যামবিশনের জন্যে একটু দাম দিতে হবে না?'

ফেরার পথে গাড়িতে সুতপা চুপচাপ। সোমনাথের কফিন আজ রাতে ফিউন্যারাল হোমেই থাকবে। কাল ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রিক ফার্নেসে দেবে। অশোক হিন্দু পুরুত পট্টবর্ধনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আরও অনেকেই যাবে নিশ্চয়ই। দীপেন আর যাবে না। বড় কষ্ট হয় ওখানে। এখনও পর্যন্ত কাছে থেকে কোনও মৃত্যু দেখা হয়নি। সুতপা বলে—'তুমি ভাগ্যবান লোক। তোমার আপনজন এখনও প্রায় সবাই বেঁচে আছেন। আর আমরা ছোটবেলাতেই কত জনকে হারালাম।'

দীপেন শুনেছে সুতপার বাবা গাড়ি অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গিয়েছিলেন। এক দাদা অল্প বয়সে ম্যানিনজাইটিসে গেছে। ওদের বাড়িতে অসময়ে আরও কেউ কেউ চলে গেছে। দীপেন, দেশে থাকতে কোনদিন শ্মশানে যায়নি শুনে ও আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—'এরকম কখনও শুনিনি। দূর সম্পর্কের আত্মীয়, নয়তো পাড়ার কেউ মারা গেলেও শ্মশানে যাওনি কখনও?'

দীপেন বলেছিল—'দাদারা যেত। আমার অ্যাজমার জন্যে মা একটা মাদুলি পরিয়ে রেখেছিল। সেটা পরে নাকি শ্মশানে যাওয়া বারণ ছিল। কারুর মারা যাবার খবর এলে মা দাদাদের পাঠাতো।'

সুতপা হেসে ফেলেছিল—'সত্যি! তোমরা ঘটিরা এত কুসংস্কার মানো কেন বলো তো?'

দীপেন একটু চটে গিয়েছিল। মাকে নিয়ে ঠাট্টা ওর পছন্দ নয়। বলেছিল—'এর মধ্যে আবার ঘটি-বাঙালের কী আছে? ছেলের একটা অসুখ থাকলে মার পক্ষে মাদুলি পরানোটাও হাসির ব্যাপার নাকি? আর দরকার না পড়লে হঠাৎ শ্মশানেই বা যাব কেন?'

সুতপা সামান্য হেসে বলেছিল—'কিন্তু দরকার তো একদিন হবে দীপেন। ধরো আমিই হঠাৎ মরে গেলাম। জায়গাটা চিনে রাখলে কষ্টটা একটু কম হত।'

আমেরিকায় এসে সেই জায়গাটাও চেনা হল। আগে আগে এত মৃত্যু-সংবাদ পেত না। প্রথম ফিলাডেলফিয়াতে সৌমেন্দু যখন ক্যানসারে মারা গেল, কী অসম্ভব প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ওদের মধ্যে। বিদেশে এসে মরে গেল ছেলেটা।

বাবা, মা, ভাই, বোন কোথায় পড়ে রইল। দেশের মাটি ছেড়ে এত হাজার মাইল পাড়ি দিতে এসেছিল শুধু মরবার জন্যে? তারপর একে একে অনিমেষদা গেলেন, বন্দনাদি গেলেন, ডাঃ মিত্র, দীপ্তেন্দুদা, এষা, কত লোকের জন্যে ফিউন্যারাল হোমে আসতে হল দীপেনকে। তবু ক্রিমেটোরিয়ামে ওর যেতে ইচ্ছে করে না।

গাড়ি চালাতে চালাতে দীপেনের একটু খিদে তেষ্টা পাচ্ছিল। কোন্ সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক খেয়াল ছিল না। এখন মনে হচ্ছে অন্তত একটু কফি খেলেও হত। কুইনসে সাউথ ইণ্ডিয়ান দোকানে কিছু খেয়ে নিলে হয়। সুতপা দোসা ভালবাসে। কিন্তু এখন ওকে জিজ্ঞেস করতেও খারাপ লাগছে। কতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। অন্যমনস্কের মতো রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু ওরও তো খিদে পাওয়ার কথা। প্রায়ই পেটে ব্যথা পেটে ব্যথা বলে। বোধহয় গ্যাসট্রিকের ব্যথার সূত্রপাত। রোগা থাকার জন্যে খালি ডায়েট করার চেষ্টা। হয়তো ঐ জন্যেই পেটে ব্যথা হচ্ছে।

—'তোমার খিদে পায়নি? বেশ টায়ার্ড দেখাচ্ছে কিন্তু। কোথাও একটু থামব?'

সুতপা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। রুমাল দিয়ে মুখখানা ভাল করে মুছে নিয়ে বলল—'তুমিও তো কিছু খাওনি সারাদিন। অত সকালে ইচ্ছেও করছিল না। থামতে পারো একটা কফি শপে। যা হোক কিছু খেয়ে নিই।'

—'দোসা খাবে? কফিও পেয়ে যাব একই সঙ্গে। এখন আর স্যান্ডউইচ-টুইচ্ ইচ্ছে করছে না।'

সুতপা রাজি হয়ে গেল। ম্যাড্রাস্ প্যালেসের সামনে বেশ ভিড়। কুইনসে গাড়ি পার্ক করা এক ঝকমারি ব্যাপার। জায়গাটা ভারতীয় শাড়ি, গয়না আর মশলার দোকানে ছয়লাপ! সঙ্গে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ইলেক-ট্রনিক গুডস-এর দোকান আর ট্র্যাভেল এজেন্সি। পার্কিং পাওয়ার জন্যে পাক খেয়ে আসছে অজস্র গাড়ি। বহুকষ্টে পার্কিং করে ওরা ভেতরে গেল। রবি-বার সকালে দলে দলে মাদ্রাজিরা বসে দোসা, ইডলি খাচ্ছে। ওরা মশলা দোসার অর্ডার দিয়ে কফি নিয়ে বসল একটা কোণের টেবিলে।

—'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো? সাউথ ইণ্ডিয়ান মহিলারা কিন্তু আমেরিকায় এসে একদম পালটায় না। সাজগোজ, হাবভাব একেবারে লেক-মার্কেটের মাদ্রাজিদের মতো নয়?'

দীপেনের কথায় সুতপা হাসল—'কেন বলো তো? অথচ আমরা বাঙালি মেয়েরা বছর না ঘুরতেই মেমসাহেব হয়ে যাই। ভাবতেই পারি না চুলে তেল মাখছি, সিঁদুর পরছি, অকারণে দামি দামি শাড়ি পরে দোকানে বাজারে ঘুরছি।'

—'শুধু তোমাদের ইংরেজিটা পালটায় না।'

দীপেনের ঠাট্টায় প্রতিবাদের ভান সুতপার গলায়—'যাঃ, ছন্দাদি সমানে

গাজরকে খ্যারট্ বলতে লাগল তোমার মনে নেই ?'

—'আসলে বাঙালির অ্যাডাপ্টিবিলিটি খুব বেশি। তার জন্যে বিদেশে আসারও দরকার নেই। আমরা ছাত্রজীবনে প্রেমা ভিলাতে দোসা খেতে খেতে প্রেম করলাম। কলকাতায় কে আমাদের দোসা খেতে শেখাল ? আবার এখানেও ম্যাড্রাস প্যালেসে ঢুকেছি। অথচ এদের কখনও 'রয়েল বেঙ্গল রেস্টুরেণ্ট' দেখবে না কিন্তু। বাঙালি হচ্ছে সর্বভুক, আগুনের মতো।'

এইসব হাসি গল্পের মধ্যে দিয়ে লাঞ্চ সারতে সারতে দীপেন বুঝতে পারছিল শুধু কথার জন্যেই কথা বলা। মন ভারী হয়ে আছে অন্য চিন্তায়। গাড়িতে উঠে অনুপ জলোটার ক্যাসেট বাজাতে গিয়েছিল। সুতপা মাথা নেড়ে বারণ করল।

অনেকখানি পথ প্রায় নিঃশব্দে কেটে গেল। দীপেন ভাবছিল সোমনাথের বৈষয়িক ভাবনা। অনিতা কী কী বেনিফিট পাবে ওর অফিস থেকে, ইনসিওরেন্স, বাচ্চা দুটোর ভবিষ্যৎ, এমনি নানা ভাবনা।

হাডসন্ নদীর ওপর জর্জ ওয়াশিংটন ব্রিজ দিয়ে যাবার সময় দূরে নদীর দিকে চেয়ে সুতপা বলল—'আমাদের সব রিচুয়্যালস্ বিদেশে মানার কোনও মানে হয় না। ঐ বাচ্চা মেয়েটা কাল ধূপকাঠি জেবলে মুখাগ্নি করবে ?'

দীপেন ভাবছিল রিচুয়্যালস্-এর আর দেশ বিদেশ কী ? ধূপকাঠি আর পাটকাঠিতেই বা কী এসে যায় ? শিশুর স্মৃতিতে এই নিষ্ঠুর ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের মতো ফিরে ফিরে আসে না কি ?

পরদিন সকালে অফিস যাবার সময় দীপেন দেখল সুতপা আবার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। কাল থেকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। হঠাৎ হঠাৎ এমন সব ঘটনা ওকে বড় বেশি নাড়া দিয়ে যায়। কাল রাতে শুয়ে বলেছিল—'আমি শুধু অনিতার কথাই ভাবছি। ভেবে দ্যাখো, আমাদের দুজনের মধ্যে একজন নেই। কী অসম্ভব একাকীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা···'

অনেক রাত অবধি দুজনের ঘুম আসেনি। সোমনাথের মৃত্যুকে ঘিরে এই জীবনের নশ্বরতা, তারই মাঝে মানুষের সংকীর্ণতা, ঈর্ষা, অহংকারের কথা—ওদের সাময়িক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এরপর কয়েক সপ্তাহ দীপেন কাজে কাজে খুব ব্যস্ত থাকল। পরের মাসে প্রথমে হিউস্টন্ গেল এক সপ্তাহের জন্যে। ফিরে এসে দেখল সুতপা মাঝে মাঝেই অফিসে যাচ্ছে না। কাছাকাছি একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে। এমনিতে যথেষ্ট সিরিয়াস ওর কাজকর্মের ব্যাপারে। কিন্তু ইদানীং টুকটাক ছুটি নিচ্ছে। পেটে একটা ঘিনঘিনে ব্যথা। পেনকিলার খেলে কমছে। আবার একটু একটু শুরু হচ্ছে। অথচ ডাক্তারের কাছে যাবার সময় নেই। শেষে দীপেন রেগেই গেল। একদিন অফিস থেকে ফিরে বলল—'রোজ রোজ পেটব্যথা বলছ, তোমার ও বি গাইনির ডাক্তারের কাছে যাও না একবার। চেক্ আপ্ করিয়ে নাও।'

—'এই তো ক মাস আগে প্যাপ টেস্ট আর চেক্ আপ্ করালাম। মনে হয় না ওসব কিছু প্রবলেম হচ্ছে—'।

'তাহলে ডাঃ রায়ানের কাছে যাও। হয়তো পেটের ট্রাবল হচ্ছে। দরকার হলে কিছু টেস্টও করিয়ে নাও। সব সময় পেটে ব্যথা হবে কেন?'

আবার কিছুদিন ধামাচাপা থাকল ব্যাপারটা। সুতপা ব্যথার কথা বলে না। হঠাৎ বিছানায় পেটে হিটিং প্যাড চেপে শুয়ে আছে দেখে ধরল দীপেন। দু-চারদিনের মধ্যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

ডাঃ রায়ান সুতপার পেটের বাঁদিকে যন্ত্রণা হয় শুনে জায়গাটা পরীক্ষা করলেন। বললেন—'কোলাইটিসের মতো মনে হচ্ছে। স্পাইসি রান্না, গ্রিজি ফুড ছাড়তে হবে আপাতত। একটা মিল চার্ট করে দিচ্ছি। সঙ্গে ওষুধ খাও। বেশি টেনশন, অনিয়ম কোর না। ব্যথার জন্যে পেনকিলার লিখে দিচ্ছি।' একগাদা ওষুধের স্যাম্পল্ আর প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরল।

কদিন ভালই ছিল সুতপা। বাড়িতে ঝাল মসলা ছাড়া রান্না খাচ্ছে দুজনেই। পেটের ব্যথা একেবারে কমেনি। তবে শুরু হলেই পেনকিলার খেয়ে নেয়।

শনিবার বিকেলে গৌতমের ছেলের অন্নপ্রাশন। যাবে না যাবে না ভেবেও শেষমুহূর্তে যাবার তাল তুলল সুতপা। দীপেনের একদম ইচ্ছে নেই। একটা উইক এন্ডের সন্ধ্যেবেলা ফাঁকা যেতে দেবে না এই মেয়ে। পেট নিয়ে ভুগছে। তবু পার্টিতে যাওয়া চাই। গিফট্ কিনে শাড়ি গয়না পরে একেবারে তৈরি। অথচ গিয়ে যে কী খাবে সুতপা। সেই ভেবে দীপেনের রাগ হচ্ছে—'।

—'ঐ রিচ রান্না খেয়ে আবার পেট চেপে শুয়ে থেকো রাত্তিরে। এত হুজুগ কেন করো? একটা শনিবার সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে বাড়িতে কাটানো যায় না? এই অবস্থা আমাদের?'

সুতপা হেসে ফেলল—'তোমার সঙ্গে তো সব সময় আছি। চলো না, আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না এখন। বাড়ি থেকে দুধ সিরিয়াল খেয়ে যাচ্ছি। পার্টিতে বাচ্চাদের যে আলাদা স্টু থাকবে তাই খেয়ে নেব।'

পার্টিতে ঝেঁটিয়ে লোকজন বলেছে গৌতমরা। হল ভাড়া করে কেটারিং-এ খাবারের অর্ডার দিয়ে বেশ ঘটা করে অন্নপ্রাশন দিচ্ছে। আগে আগে তো ইণ্ডিয়ান কেটারিং-এর এরকম ব্যবস্থাই ছিল না। কোথায়ই বা এত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট তখন? আর সদ্য সদ্য আমেরিকায় এসে বাঙালিরা এত খরচ করতেও পারত না। 'এক একটা জন্মদিন, মুখেভাত, বিয়ের রিসেপশন হোতো আর মেয়েরা অনেকে মিলে দুশো তিনশো জনের রান্না নামিয়ে দিত। বারো-য়ারি পুজোর রান্না করে করে এক্সপার্ট সব। গীতা বৌদির তো এমন খাতির বেড়েছিল যে সাহায্য চাইলে বলতেন—'পাঁচশোর কম চমচম দরকার হলে আর কাউকে বলো। আমি আবার অত কম বানাতে পারি না। মাপের গণ্ডগোল হয়ে যায়।'

কিন্তু এখন ভাল ভাল ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় অর্ডার দেওয়াই রেওয়াজ হয়েছে। মেয়েরাও রেঁধে রেঁধে ক্লান্ত। আর রাঁধতে চায় না। গৌতমরা চাঁদ প্যালেসে অর্ডার দিয়েছে।

অ্যাপেটাইজারের সিঙ্গাড়া আর শিককাবাব-এর প্লেট নিতে গিয়ে দীপেন দেখল সুতপা কিছুই নিল না। গৌতমের বউ কেয়া এসে সুতপাকে একটা প্লেট ধরাবার চেষ্টা করছিল। সুতপা কাকে যেন সেটাই ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

হলের মধ্যে লম্বা লম্বা টেবিল জুড়ে বিরাট আড্ডা জমেছে। ক্যাসেটে লাগাতর বিস্‌মিল্লার সঙ্গে ভি জি যোগ। রেকর্ডটা খুব হাতবদল হয় এখানে। সারা হলঘর সাদা স্ট্রিমার দিয়ে সাজানো। দরজার সামনে লেখা—'শুভ অন্নপ্রাশন'। গৌতমের ছেলেটা সমানে কেঁদে যাচ্ছে। অসম্ভব সেজেগুজে ক্ষেপে গেছে বোধহয়। থেকে থেকেই ছোট্ট টোপরটা মাথা থেকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। কদিন আগে আসল মুখেভাত হয়ে গেছে। আজ পার্টির ভিডিও তোলার জন্যে আবার বেচারিকে ধড়াচুড়ো পরিয়েছে।

অনেকক্ষণ সুতপার দেখা নেই। ডাইনিং হলে মেয়েদের মহলে ভিড়ে গেছে নিশ্চয়ই। হঠাৎ দীপেন দেখল ইন্দিরা বেশ ব্যস্ত হয়ে ওকে কী যেন বলতে আসছে। দীপেন এগিয়ে যেতেই ইন্দিরা বলল—'সুতপার শরীরটা ভাল লাগছে না বলছে। আপনি লেডিজ রুমের ওদিকে যান। আমি ডাঃ সেনগুপ্তকে ডেকে আনছি।'

দীপেন তাড়াতাড়ি লেডিজ রুমের কাছাকাছি লবিতে পৌঁছে দেখল সুতপাকে মেয়েরা সোফায় শুইয়ে রেখেছে। মুখখানা যন্ত্রণায় বিবর্ণ। পা দুটো সোজা রাখতে পারছে না। ওকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল—'আমায় বাড়ি নিয়ে চলো। বড্ড ব্যথা করছে। আর পারছি না।'

অবস্থা দেখে দীপেন বেশ ভয় পেয়ে গেল। এত যন্ত্রণা তো কোনদিন হয়নি। ততক্ষণে ডাঃ সেনগুপ্ত এসে গেছেন। সেনগুপ্ত কার্ডিওলজিস্ট। খানিকক্ষণ দেখে বললেন, 'অ্যাম্বুলেন্স কল্ করো! এক্ষুণি হাসপাতালে নেওয়া দরকার। পালস্ রেট ভাল নয়। তার ওপর এরকম অ্যাকিউট অ্যাবড-মিন্যাল পেইন। সময় নষ্ট করা যাবে না।' কিন্তু কিসের ব্যথা কিছুই বললেন না।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। সুতপাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে ভেতরে তোলার পর দীপেন পাশে বসে দেখতে পেল ওদের গাড়িটা নিয়ে সঙ্গে আসবে বলে ইন্দ্র চাবি চাইছে। না হলে গাড়িটা এখানেই পড়ে থাকত। দীপেনের মনেও পড়েনি গাড়ির কথা। ইন্দ্রকে চাবি দিয়ে দিল। ঝড়ের গতিতে সাইরেন বাজাতে বাজাতে অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালের দিকে ছুটে চলল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। এমার্জেন্সিতে বসে আছেন সর্বাণীদি, ইন্দ্র, ডাঃ সেনগুপ্তর সঙ্গে আরও কজন। গৌতমের পার্টি ফেলে শুভেন ইন্দিরাও চলে এসেছে। খুব টেনশানে আছে ওরা। কী হল সুতপার? এমন যন্ত্রণা যে এখনও কিছু ধরাই যাচ্ছে না?

দীপেন বলছিল—'ব্যথাটা কিছুদিন ধরে শুরু হয়েছিল। ওষুধপত্র খেয়ে একটু কমেও এসেছিল। কিন্তু এত পেন কোনদিন হতে দেখিনি।'

সর্বাণীদি ভুরু কুঁচকে বললেন—'কোলাইটিসে এরকম যন্ত্রণা হয় নাকি? এখন তো সারা পেট জুড়েই ব্যথা বলছে। গল্ ব্লাডার নয় তো?'

ডাঃ সেনগুপ্ত চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেন—'ঠিক বুঝতে পারছি না। ওরা আলট্রা সাউণ্ড করছে। দেখি, একবার খবর নিয়ে আসি।'

দীপেনের অস্থিরতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কী ধরা পড়বে কে জানে? গল ব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স যাই-ই হোক, হয়তো এখনই সার্জারি করতে হবে। তবু তো চেনা রোগ। অন্য কিছু হল না তো? সেই অচেনা রোগের কথা ভাবলেই ভয় হয়।

কখন নিঃশব্দে বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ছে। রাত প্রায় এগারোটা। লবিতে রেডিওর খবরে বলছে বরফের ঝড় আসছে। এ অঞ্চলে শেষ রাতে এক ফুটের বেশি বরফ জমে যাবে। বেশি রাতে গাড়ি চালানো বিপদজনক হয়ে উঠবে বলে সাবধান করছে। হঠাৎ দীপেনের মনে হল এতগুলো মানুষ বরফের ঝড় মাথায় করে হাসপাতালে বসে থাকবে? বাড়িতে ছেলেমেয়ে পড়ে আছে, এভাবে সকলের অপেক্ষা করে থাকার কোনও মানে হয় না। ও সবাইকে বাড়ি পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই যাবে না। সর্বাণীদিও থাকতে চাইছেন।

ডাঃ সেনগুপ্ত ফিরে এসে বললেন—'এরা তো বলছে সিভিয়র পেলভিক ইনফেকশন। কিন্তু জ্বর নেই বলেই আশ্চর্য লাগছে। রাতের ডিউটির এই বাচ্চা বাচ্চা ইনটার্নদের ইনভেস্টিগেশনে সব সময় ডিপেন্ড করাও মুশকিল। তবে সুতপার গাইনির ডাক্তার এক্ষুনি আসছেন। চিন্তা কোরো না।'

দীপেনের কথায় যদি বা বাড়ি ফিরতে ইতস্তত করছিল ওরা, ডাঃ সেনগুপ্ত বলতে রাজি হল। হাসপাতালের স্টাফরাও বারবার ঘোষণা করছিল, আবহাওয়ার কথা ভেবে নেহাত নিকট আত্মীয় ছাড়া বাকিরা যেন পার্কিং লট থেকে গাড়ি সরিয়ে নিয়ে যায়। তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। দীপেনের খুব ইচ্ছে করছিল একবার সুতপাকে দেখে আসে। কিন্তু তখনও আলট্রা সাউণ্ড চলছে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

একটু পরেই সুতপার ডাক্তার গ্রিন এলেন। বৃদ্ধ মানুষ, বরফের ঝড় মাথায় করেই প্রায় পৌঁছলেন। বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে অবিশ্রাম বরফ পড়ে যাচ্ছে। বড় বড় গাছের সাদা কঙ্কাল যেন হাওয়ায় নেচে বেড়াচ্ছে।

দীপেন ডাঃ গ্রিনের সঙ্গে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ভেতরে গেল। সুতপা

নিশ্চেষ্ট ভাবে শুয়ে আছে। ওকে দেখে ফিস ফিস করে বলল—'খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরও ব্যথা করে দিয়েছে। বাথরুমে গেলাম। ইউরিন বন্ধ হয়ে গেছে। খুব ব্যথা করছে গো।' দীপেনের এত মায়া হচ্ছিল! ওর কপালে হাত রেখে স্পর্শ দেবার মতো করে বলল—'এই তো ডাঃ গ্রিন এসে গেছেন। আর বেশি কষ্ট পাবে না।'

ডাঃ গ্রিন সব রিপোর্ট দেখলেন। সুতপার তলপেটে হাত দিতেই ও অসহ্য যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। গ্রিনের মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে আসছে। একটা সিরিঞ্জ নিয়ে এলেন। ডাঃ সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার কী মনে হচ্ছে সিভিয়র পেলভিক ইনফেকশন?'

ডাঃ গ্রিন মাথা নাড়লেন—'আমার তা মনে হয় না। একটা পরীক্ষা করছি। তারপর যেটা সন্দেহ করছি, সে সম্পর্কে শিওর হতে পারব।' সিরিঞ্জ নিয়ে সুতপার তলপেটের চাদর সরিয়ে দাঁড়ালেন।

একটু পরে সিরিঞ্জটা বের করে এনে তুলে ধরতেই দীপেন দেখল ভেতরে রক্ত ভর্তি হয়ে গেছে। গ্রিন বললেন—'এটাই সন্দেহ করেছিলাম। লেফ্‌ট ফেলোপিয়ন টিউব রাপচারড্‌ হয়ে অ্যাবডমিন্যাল ক্যাভিটি রক্তে ভরে গেছে।'

ডাঃ সেনগুপ্ত দীপেনের দিকে তাকালেন—'কী হয়েছে বুঝেছো? এক্‌টপিক প্রেগন্যান্সি। ওর টিউব বাস্ট করে গেছে অনেক আগেই।'

দীপেন বিভ্রান্তের মতো চেয়ে আছে। প্রেগন্যান্সি, কই সুতপা তো কিছু বুঝতে পারেনি! সুতপাও এই মুহূর্তে ব্যথার ঘোর ভেঙে জেগে উঠল—'টিউব্যাল প্রেগন্যান্সি? কিন্তু আমি তো কিছু বুঝিনি। প্রেগন্যান্সির কোনও সিমটমই হয়নি আমার।'

ডাঃ গ্রিন সুতপার হাত ধরে বললেন—'এটা তো নর্মাল প্রেগন্যান্সি নয়। ফিটাস ফেলোপিয়ন টিউবের ভেতরে থেকে গেছে। ইউটেরাসে পৌঁছতে পারেনি। সেই জন্যেই তোমার টিউবে এত যন্ত্রণা হচ্ছিল। তুমি আগে আমার কাছে আসোনি কেন বলো তো?'

সুতপার গলা কান্নায় ভেঙে যাচ্ছে—'আমি ভাবতেই পারিনি। ভুল করে কত কোলাইটিসের ওষুধ খেলাম। ডাঃ গ্রিন, আমার আবার তো একটা কন-সেপশন নষ্ট হয়ে গেল।' সুতপার শরীরে এত যন্ত্রণা। তবু সহ্য করছিল কতক্ষণ। কিন্তু আর যেন সে ব্যথার কোনও অনুভব নেই। এ মুহূর্তে ওর কান্না উঠে আসছে অন্য এক গভীর অভাববোধ থেকে। শুধু দীপেন জানে তার উৎস। ডাঃ গ্রিনও জানেন। তবু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'তোমার জীবন পড়ে আছে। ধৈর্য ধরো। কেঁদো না।'

দুই ডাক্তার সার্জারি নিয়ে আলোচনা করছেন। দীপেন শুনল একটু পরেই সুতপার পেটে অপারেশন হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাঁদিকের ফেলোপিয়ন টিউব বাদ দিতে হবে। ইণ্টারন্যাল ব্লিডিং-এ রুগী নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হলে আর বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সুতপার শরীরে

রক্ত এত কম যে রক্ত না দেওয়া পর্যন্ত অপারেশনও করা সম্ভব নয়। সব ব্যবস্থা করে সার্জারি শুরু হতে রাত তিনটে বাজবে।

সুতপার ইনট্রাভেনাস চলছে। রক্ত দেওয়াও শুরু হল। তারই মাঝে কথাবার্তা বলছে। অনবরত একই কথা—'লেফট টিউবটা কি কিছুতেই রাখা যাবে না? এখনও আমার কোনও বাচ্চা হল না, তুমি এরই মধ্যে একটা টিউব বাদ দিয়ে দেবে?'

ডাঃ সেনগুপ্ত ডাঃ গ্রিনের মতোই বোঝাচ্ছেন ওকে—'তোমাকে বাঁচাতে গেলে টিউব বাদ দিতেই হবে। ফিটাস সুদ্ধ ঐ টিউবটা একেবারে রাপচার্ড হয়ে গেছে। এত ভাবছ কেন? ডানদিকের টিউব তো থাকবে। কত মেয়ের এক্টপিক্ সার্জারির পর আবার ছেলেমেয়ে হয়েছে। মা হতে গেলে আগে তো তোমাকে বাঁচতে হবে সুতপা।'

সুতপা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ছে। দীপেন এ সময় সুতপার অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। মাথার ভেতর একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। শুধু নিজের অবহেলায় কত সময় নষ্ট হয়ে গেল। মেয়েটা প্রায় মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে গিয়েছে। স্বামী হিসেবে ওর নিজের তো উচিত ছিল সময় থাকতে ওকে গাইনোকলজিস্ট দেখানো। আসলে মাস কয়েক আগে পুরো চেক-আপ করিয়ে সুতপাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিল যে। মা হবার জন্যে ইদানীং সুতপা যত অস্থির হয়ে উঠেছিল, দীপেনের সেরকম প্রতিক্রিয়া হয়নি। বিয়ের পর ছ-সাত বছর কেটে গেছে বলেই হতাশ হবার কিছু নেই। আজ এই মানসিক চাপের মধ্যে থেকে দীপেন অনুভব করল, সুতপার জন্য ওর যা কিছু উদ্বেগ। তারই নাম মায়া অথবা ভালবাসা নিশ্চয়, যা দিয়ে ওরা পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে।

ফর্মগুলোতে সই করে দীপেন এক সময় অপারেশন থিয়েটারের সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা পোশাক পরিয়ে সুতপাকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। সামান্য আচ্ছন্নের মতো হয়ে আছে। ওপরের ঘরে ওকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছিল। ও টি'র সামনে দীপেনকে স্ট্রেচারের পাশে দেখে ম্লান হেসে বলল—'খুব স্নো পড়ছে না? বাইরে যেও না কিন্তু।' দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দীপেন মনে মনে বলছিল—নিজের জন্যে বাঁচো তপু। আমার জন্যে বেঁচে থাকো।

কখন ওয়েটিং রুমে ভোর হয়ে গেল। জানলার বাইরে নিথর পৃথিবী বরফের আচ্ছাদনে ঘুমিয়ে আছে। যতদূর দেখা যায়, যেন ছোট ছোট বরফের টিলা। কোথাও কোনও রঙ নেই। পাখির ডাক শোনা যায় না। অস্পষ্ট ভোরের কুয়াশা জড়ানো এক অলৌকিক সকালে যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠল দীপেন। যন্ত্রণায় মাথা ভার হয়ে আছে। চোখে সামান্য জ্বালা। ঠিক ঘুম নয়, আবছা তন্দ্রার মতো নেমে এসেছিল কখন। মাঝে একবার উঠে গিয়ে জেনে এসেছিল অপারেশন হয়ে গেছে। সুতপা তখন অজ্ঞান অবস্থায় রিকভারি রুমে। ডাঃ সেনগুপ্ত বোধহয় বাড়ি ফিরে গেছেন। ইন্দ্রই ওঁর গাড়িটা চালাবে বলেছিল। ওয়েটিং রুমে নার্স এসে ডেকে নিয়ে গেল দীপেনকে। জ্ঞান ফেরার

পর সুতপাকে নিজের বেডে নিয়ে যাচ্ছে। ওর কোনও সাড়া নেই। আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝে যন্ত্রণায় কেঁপে উঠছে সারা শরীর। কখনও একটু গোঙানির মতো শোনা যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে দীপেন ওর বিছানার পাশে বসে থাকল কতক্ষণ। সুতপা একবার তাকিয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করল। জল চাইছে মনে হল। নার্স ওর শুকনো ঠোঁটে বরফ বুলিয়ে দিল। দীপেনকে একটা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে। বাড়ি গিয়ে সুতপার ড্রেসিং গাউন, চটি, চিরুনি, টুথব্রাশ আরও কী কী জিনিস আনতে হবে। এমার্জেন্সির রুগী কাল অন্নপ্রাশন ফেরত বেনারসী পরে চলে এসেছিল। সে সব ব্যাগে ভরে নার্স দিয়ে গেল দীপেনকে।

ফেরার পথে করিডোরে দেখা হল ডাঃ গ্রিনের সঙ্গে। ওর দু'হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ভরসা দিলেন—'আর কোনও ভয় নেই। তবে সাময়িক একটু ডিপ্রেশন হতে পারে। চেষ্টা কোরো ওর মনটা ভাল রাখতে।'

হঠাৎ দীপেন প্রশ্ন করল—'তুমি কি টিউব রিমুভ করার সময় ফিটাস্ দেখেছিলে?'

—'অফ কোর্স দেখেছিলাম। প্রায় তিনমাসের প্রেগন্যান্সি ছিল। তিনমাস ধরে ফিটাস টিউবের মধ্যে গ্রো করেছিল। তারপর সবটাই র‍্যাপচার করে গেল…'

তিনমাস? দীপেনের মনে হল এ তবে নিরবয়ব কোনও সত্তা নয়। এদেশের অ্যান্টি অ্যাবরশন দলের মিছিলে গর্ভস্থ ভ্রূণের যে ছবি দেখায়, তিনমাস অবস্থায় তাকেও তো মানুষের মতো বলে চেনা যায়। এ তবে কেমন ছিল? হয়তো অস্বাভাবিক অবস্থায় কত যন্ত্রণা পেয়েছে। মানুষের জন্মরহস্য যে এত জটিল তার জানা ছিল না। যে সম্ভাবনা মায়ের গর্ভের আশ্রয় জানল না, পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে তাকাল না, অনাগত সেই শিশুর জন্যে দীপেনের হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ শুরু হল।

—'ডাঃ গ্রিন, সে ছেলে ছিল, না মেয়ে?'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে ডাক্তার বললেন—'যে জন্মায়নি তার জন্যে দুঃখ কোরো না। হোপ ফর দ্য বেস্ট।'

হাসপাতালের পার্কিং লটে বরফে ঢাকা গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দীপেন। সামনের বড় গির্জায় ঘণ্টা বাজছে। কানে বাজছে ডাঃ গ্রিনের শেষ কথা—'যে আসেনি, তার জন্যে আক্ষেপ কোরো না।'

গির্জার মাথায় কোন্ দেবশিশু উড়ে যায়। দীপেন ভাবে ঐ শিশু আমাকেই মুক্তি দিয়ে গেছে। আমি কখনও শ্মশানে যাইনি। ফিউনারাল হোমে গেলে বিষাদের গাঢ় ছায়া আমাকে ঘিরে ধরে। দ্বিতীয়বার যেতে ইচ্ছে হয় না। সুতপা বলেছিল—'শোক কি তুমি কখনও এড়াতে পারো? প্রিয়জনকে একবার নিয়ে যেতে হবে না সেখানে?' অথচ সুতপা জানে না, জীবনের প্রথম শোকের বিষণ্ণ সকালে, দেহহীন আমারই আত্মজ আমাকে কঠিন শেষকৃত্যের দায় থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

ছুটির দিনে ঘুম ভাঙ্গার মুখে প্রসূন কতো সময় শব্দের উৎস খোঁজে। কে যে তাকে জাগিয়েছে, ঘড়ির অ্যালার্ম, ডোর বেল্ না টেলিফোন, সেই শব্দকে চেনার আগে শব্দ হারিয়ে যায়। ছায়া ছায়া অন্ধকার ঘর। বেলা বোঝা যায় না। এমন নিস্তরঙ্গ কিছু মুহূর্ত পার হলে প্রসূনের মনে হয় কোনো ধাতব শব্দে তার ঘুম ভাঙ্গেনি। ঘুমের 'কোটা' ফুরিয়ে যেতে নিজেই জেগে উঠেছে। উইক-এণ্ডের আট-ন ঘণ্টার রাত শেষ হয়েছে।

প্রসূনের ঘুমের রুটিন শুক্র, শনি প্রায় একই রকম। রাত একটা / দুটোয় শুতে যায়। পরদিন বেলা দশটা সাড়ে-দশটায় ঘুম ভাঙ্গে। কিন্তু অফিসের দিনে সাত ঘণ্টাও ঘুম হয় না। দুটো খবরের কাগজ, লেট-নাইট টি. ভি. আর রাজ্যের ম্যাগাজিন নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত লিভিং-রুমেই কেটে যায়। শুতে শুতে রাত বারোটা। আবার সকাল সোয়া ছটায় ক্লক-রেডিওর অ্যালার্ম বাজে। সাড়ে ছটায় বাজলেও অফিসে দেরী হবার কথা নয়। কিন্তু প্রসূনের ঐ পনের মিনিট খুব দরকার। জেগে ওঠার প্রস্তুতির জন্যে সে একটু সময় চায়। অ্যালার্ম শোনামাত্র এক ঝট্কায় বিছানা ছেড়ে উঠে ঘড়িকে সেলাম ঠুকে দিন শুরু করা—যন্ত্রের কাছে প্রতিদিনের এই দাসত্ব তার ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে সে নিজের ইচ্ছেয় জেগে উঠতে চায়। জাগরণের এই স্বাধীনতার জন্যে রোজ সোয়া ছটায় অ্যালার্ম দিয়ে রাখে। ঘড়ির বাজনা বেজে যায় যাক। একটু একটু করে চোখ খোলার জন্যে হাতে তার তখনও পনের মিনিট। শরীরে রিন্‌রিনে অনুভূতি। শেষ পনের মিনিটের এই আচ্ছন্নতায় প্রসূন মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখে। হঠাৎ রেডিওর আওয়াজেই ধড়মড়িয়ে ওঠে। ঘড়ি দেখে ঝট্ করে বাথরুমে ঢুকে যায়। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে—আজ থেকে রাত দশটায় শোবো। রাত দশটায় টি. ভি. চালিয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায়।

আজ সরস্বতী পুজোর জন্যে সকালে ওঠার তাড়া ছিল না। উইক্-এণ্ডের বারোয়ারী পুজো। প্রসূন সাড়ে দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। তারপর কফি খেয়ে চানটান সেরে বেরোনোর তোড়জোড় করছে। ক্লসেট খুলে হ্যাঙ্গারের বোঝা ঠেলতে তসরের পাঞ্জাবিটা চোখে পড়লো। জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ওয়েদার যা চলেছে, সরস্বতী পুজোয় পুরোপুরি বাঙ্গালী সেজে যাওয়া অসম্ভব। ধুতি প্রসূন অনেকদিনই পরে না। কবার থিয়েটার করে সব লাটঘাট হয়ে পড়ে আছে। চোস্ত পায়জামার ওপর পাঞ্জাবি আর শাল জড়িয়ে বছরে একদিন-দুদিন দুর্গাপুজোয় যায়। আজ টেম্পারেচার উনিশ ডিগ্রী। রাতের দিকে আরো নেমে যাবে। অবশ্য বরফের সম্ভাবনা নেই। প্রসূন

পাঞ্জাবি পরে ফেললো।

গরম প্যাণ্ট আর পাঞ্জাবির সঙ্গে ওভারকোট চাপিয়ে, টুপী, গ্লাভ্‌স্ পরে, প্রসূন যখন গাড়িতে উঠলো, তখনও হাওয়ার মাতামাতি শুরু হয়নি। রাস্তার কোণে স্টপ্-সাইনের গোল চাক্‌তি মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। মোড়ের মাথায় ট্র্যাফিক সিগ্‌ন্যালের আলো দুলছে না। দম্‌কা বাতাস নেই। উজ্জ্বল, শান্ত, মেঘহীন, কুয়াশাহীন এই দিন। পথের দুধারে একসার ন্যাড়া ন্যাড়া গাছ আকাশে হাত উঁচু করে যেন মুঠো মুঠো রোদ সংগ্রহ করে আনছে। কোথাও হাড়সার শরীর বাঁকিয়ে নাচের ভঙ্গীতে হাত ছড়িয়ে রেখেছে। শ্রীহীনতার জন্যে গাছেদের কোনো হীনমণ্যতাবোধ নেই—প্রসূন এই মুহূর্তে একটি বাক্য রচনা করলো। প্রসূনের ধারণা ভালো ভালো বাংলা শব্দ সে ক্রমশই ভুলে যাচ্ছে। আপাততঃ এই বাক্যরচনা তাকে আশ্বস্ত করলো।

ভালো আবহাওয়ার জন্যে অন্য দিনের চেয়ে রাস্তায় আজ ভীড় বেশী। পার্কের দোলনা উঠছে, নামছে। বাচ্চাগুলো দু'হাত মুঠো করে শেকল ধরে বসে আছে। বাতাসে পা দোলাচ্ছে। প্রসূন এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে শহর ছাড়িয়ে হাইওয়েতে পৌঁছোলো। আর তখনই খেয়াল হলো চেক্-বই টেবিলে ফেলে এসেছে। ওয়ালেটে ক্যাশ বেশী নেই। চাঁদার জন্যে গোটা পঁচিশেক ডলার অবশ্য হয়ে যাবে। তার বেশী ও দিতোও না। একদিনের পুজো। সঙ্গে ফ্যামিলি থাকলেও না হয় কথা ছিলো। কিন্তু চেক-বই না থাকাতে বাংলা বই আর ক্যাসেট কিনতে অসুবিধে হবে। প্রিয়ব্রতদার স্টল্ থেকে কয়েকটা বই কেনার ইচ্ছে ছিল। সে হয়ত উনি এমনিই দিয়ে দেবেন। প্রসূন পরে চেক্ পাঠিয়ে দেবে। স্বাতী থাকলে এইসব সমস্যা হতো না। সে আজ আসবে কিনা কে জানে? পরশু দিন ফোনে কথা বলে তো মনে হলো না তার আজ আসার কোনো ইচ্ছে আছে।

দেশে কি সরস্বতীপুজো হয়ে গেছে? এখানে এখন অনেক পুজো বাকী। প্রসূনই পাঁচ-ছখানা কার্ড পেয়েছে। চারটে উইক্-এণ্ড ধরে বাণী-বন্দনা চলবে। প্রথম প্রথম আমেরিকায় এসে ওর খুব অবাক লাগতো। বাঙ্গালীরা ঠিক ঠিক দিনে পুজো করে না কেন? ইদানীং সে সব আর মনে হয় না। আমেরিকায় বসে অত দিনক্ষণ মানা যায় না। ছুটির দিন ছাড়া লোক আসবে না। স্কুল, কলেজের হল ভাড়া নেওয়া যাবে না। বাঙ্গালীদের কোনো মন্দির-টন্দিরও নেই। তিথিটিথি মিলিয়ে যদিবা একটা হল্ যোগাড় হলো, হয়তো পরের বছরই হাতছাড়া। রান্নাঘরে খিচুড়ি, আলুরদম রাঁধতে গিয়ে সারা ঘরে তেল মশলা ছিটিয়ে পালিয়েছে বাঙ্গালী। ফ্রাই প্যান্ ভর্তি গরম তেলে ধাঁই ধাঁই করে বেগুন ছেড়েছে। পাঁচশো বেগুন ভাজার প্রজেক্ট। আড়াইশোতেই তেল-টেল্ জ্বলে লংকাকাণ্ড। সারা দেওয়ালে চটচটে হলুদের দাগ। ওদিকে বাথ-রুমও নরককুণ্ড। ভেজা টিস্যু পেপার আর বাচ্চাদের ডায়াপারে ছয়লাপ। প্রসূন "ক্লীনিং কমিটি"তে ঢুকে সবই দেখেছে। আশ্চর্য হয়ে ভেবেছে—

যারা নিজেদের বাড়িঘর সিনেমার মতো সাজিয়ে রাখে, তারা পাবলিক্ প্লেসে এসে কি করে এত নোংরা ফেলে যায়? এইসব অপরাধে দাগী হয়ে গিয়ে এখন ইণ্ডিয়ানদের চট্ করে হল্ পাওয়াই মুশকিল। শখের পুরোহিত বিমল লাহিড়ী, তপন গাঙ্গুলীরা আগে আগে শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ নিয়ে একটু গাঁই-গুঁই করতেন। এখন অবস্থা বুঝে বায়না করা ছেড়ে দিয়েছেন।

বেলা একটা নাগাদ গাড়ি পার্ক করে প্রসূন লিংক্ন্ হাইস্কুলে ঢুকলো। লবীতে চাঁদার টেবিল। বেশ ভীড় হয়ে গেছে। তারই মধ্যে মোটা মোটা খামে নিজের জীবনী বিলোচ্ছে জগা পাগলা। ছোটখাটো রোগা পাতলা চেহারা। মাথায় অবিন্যস্ত কাঁচাপাকা চুল। ঝল্মলে থ্রী-পীস্ সুটের সঙ্গে চেক্-চেক্ টাই। মস্ত এক ব্যাগ বগলে জগা ব্যস্ত হয়ে এধার ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাঁদার টেবিলের সামনে নতুন মুখ দেখলেই ব্যাগের ভেতর হাত চালিয়ে খাম উদ্ধার করে আনছে। হাতে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। মুখে অনাবিল হাসি আর অনর্গল কথা।

প্রসূন চাঁদা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আগেই জগার নজরে পড়ে গেলো।

—"আ···রে···ডক্টর চক্রবর্তী? এতো দেরী কেন? সব ভালো তো?"

প্রসূন ডাক্তার নয়। পি. এইচ. ডি. শেষ করেনি। তবু জগার বারবার অতি ভক্তি। ভুল শুধ্রে দিলেও কানে নেয় না। প্রসূন তাড়াতাড়ি "হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালো আছি। আপনি ভালো তো?"···বলে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ফাঁকতালে জগা খাম ধরিয়ে দিলো। আরো কথা বাড়ানোর তালে ছিল। চাঁদার টেবিলের সামনে নতুন নতুন লোক দেখে চট্ করে ফিরে গেলো।

দোতলার সিঁড়ির একধারে গারবেজ ক্যান্। তখনও খাওয়াদাওয়া শুরু হয়নি বলে ক্যানের ভেতর পেপার প্লেট জমে ওঠেনি। জগার জীবনী গারবেজে ফেলে দিয়ে প্রসূন অডিটোরিয়ামে ঢুকে গেলো। ভেতরে খুব ভীড়। অনিমেষদা, সোনালীর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। এই সেদিন অনিমেষদার বাই-পাস্-সার্জারী হয়েছে। এর মধ্যে সরস্বতী পুজোয় চলে এসেছেন। আবার সেই এক রসিকতা—"তা প্রসূন, আজ অডিয়েন্স্ কারা? আমার তো বেশীক্ষণ থাকা চলবে না। অন্ধকার হবার আগে কেটে পড়তে হবে।"

প্রসূন হাসছে—"আপনি চলে গেলে আমরা অডিয়েন্স্ পাবো না অনিমেষদা।"

—"পাবো না মানে? সর্বনাশ! তুমি আবার ভিড়েছো?"

—"আরে, না, না, আপনার সঙ্গে এবার আমিও অডিয়েন্স্।"

সোনালী চোখ ঘুরিয়ে বললো—"কেন? স্টেজে ওঠা নিয়ে হাসির কি আছে? একালে কিছু করছে ব'লেই তো আমরা দেখছি?"

—"ওঃ! সোনালীর যা চেঞ্জ হয়েছে না! ইউ ক্যান্ট্ ইম্যাজিন্! সব থিয়োরী পাল্টে ফেলেছে। আমার হার্ট অ্যাটাকের পরেই একেবারে অন্য মানুষ···!"

সোনালী বললো—"এত বক্ বক্ করলে এক্ষুনি বাড়ি নিয়ে যাবো। আচ্ছা প্রসূন বলো, এ সব কথা সবাইকে বলার দরকার কি ?"

—"বাঃ আমি তো ভালো কথাই বললাম। আমার অসুখের সময় থেকে তুমি বলে আসছো না মানুষ কত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায়…" প্রসূন দু-চার কথার পরে ঠাকুর দেখার জন্যে সামনে চলে গেলো।

এই সরস্বতীর বয়স পাঁচ বছর। এখনও নতুনের মতো দেখাচ্ছে। পেছনে আকাশী সিল্কের পর্দায় সারি সারি মেঘ, বলাকা। সরস্বতীর ব্যাক-গ্রাউণ্ড বদলায় না। ভক্তরা বড়ো হয় না। লিংকন্ হাইস্কুলে উঠে আসে যতীন দাস রোডের গ্যারাজ…নব কিশলয় সংঘ। রাত জেগে তুলো, ক্রেপ্-পেপার, ময়দার আঠা নিয়ে মেঘ, বলাকা, রঙীন শেকল…টেম্পো থেকে নেমে কিশোরী সরস্বতী বীণা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে…তিনজন কিশলয় কাপড়ের দেওয়ালে তুলো তুলো মেঘ সেঁটে যাচ্ছে…যতীন দাসের গ্যারাজের আকাশে সাতটি বলাকা…

—"প্রসূন—"

কোলাহলের মাঝে একটি কণ্ঠস্বর। মেঘ, বলাকা নিমেষে উধাও হলো। সরস্বতী থেকে স্বাতীতে পৌঁছোতে যেটুকু সময়, তার মধ্যে প্রসূন শব্দের উৎসের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। এতক্ষণ চেনা, মুখচেনা, অচেনার ভীড়ে যাকে আশা করবে না ভেবে ও খুঁজেছে, সে এখন ভীড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসছে।

—"কি হলো ? একটু ওয়েট্ করলে না! জগার কাছে ফেলে চলে এলে !"

—"কোথায় ? নীচে তোমায় দেখলাম না তো। কখন এলে ?"

—"অনেকক্ষণ। বুক্ স্টল থেকে তোমাকে সিঁড়িতে দেখলাম। ভাবলাম দেখতে পেয়েছো। ততোক্ষণে জগা সেকেণ্ড টাইম্ ধরে ফেলেছে।"

প্রসূন হাসলো—"কি বলে কি জগা ?"

—"অ্যাজ্ ইউশ্যুয়্যাল্ বোর্ করেছে। কিন্তু এগুলো কোথায় ডাম্প্ করি বলো তো ?"

—"ঐ তো, ওপাশে ক্যান্ আছে। আমি তো ওপরে এসেই ফেলে দিলাম।"

জগা এখন দোতলায় ঘুরছে। স্বাতী একগাদা হলদে খাম গারবেজ ক্যানে ঢুকিয়ে দিলো। প্রসূনরা কিন্তু এতগুলো জীবনী পায়নি। জগা স্বাতীকে নিশ্চয়ই অন্য কাগজপত্রও ধরিয়েছিল।

ওরা হলের মধ্যে চেয়ারে গিয়ে বসলো। সামনে, পেছনে চেনা মুখ। মাইকে মন্ত্রপাঠ শোনা যাচ্ছে। সর্বাণীদি অন্য একটা মাইক্রোফোনে সবাইকে ডাকছেন। এরপর অঞ্জলি হবে। স্বাতী অঞ্জলি দেবে কিনা বোঝা গেলো না। অনিরুদ্ধ, দীপাঞ্জনদের দেখে গল্প করতে চলে গেলো। পরশুদিন যখন বলেছিল সরস্বতী পুজোয় আমার ইচ্ছে নেই, তখন একটু নিরাশ হলেও প্রসূন কারণ জানতে চায়নি। বাঙ্গালীদের অধিকাংশ ব্যাপারে ওর যে কোনো আগ্রহ নেই, সে

ক্রমশই বুঝতে পারছে। অথচ বেশীদিন আগে দেশ থেকে আসেনি। দাদা স্পন্‌সর করে এনেছিল। এখন স্বাতী নিজে বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। আমেরিকান এক্‌স্‌প্রেসে কাজ করে। কোলকাতার একটা দুটো কাগজে লেখে। অবশ্য নিয়মিত কিছু নয়। প্রসূনের সঙ্গে বছর দেড়েক আগে আলাপ হয়েছে। আজকাল ওদের প্রায় প্রত্যেক উইক্‌-এণ্ডে দেখা হয়।

স্বাতী ফিরে এসে বললো—"তুমি কি অঞ্জলি দিচ্ছো? তাহলে দিয়ে এসো। আমি ম্যাগাজিন স্টলে আছি।"

প্রসূন সামনে গিয়ে অঞ্জলির ফুলের জন্যে হাত বাড়ালো। সকাল থেকে চা কফি ছাড়া কিছু খায়নি। জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে সে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করে। অথবা রুটিন ভাঙ্গতে চায় না। এই যে পুজোয় আসা, এও এক ধারাবাহিকতার অনুসরণ। শুধু লোক্যাল্‌-গেট্‌ টুগেদারের জন্যে পাঞ্জাবি প'রে পুজোবাড়িতে আসা আর গাদাগুচ্ছের খিচুড়ি খেয়ে গল্প করতে করতে অর্ধেক নাটক দেখে বাড়ি ফিরে যাওয়া—দিনটাকে এমন তাৎপর্য-হীন করে তুলতে ওর ইচ্ছে হয় না।

তিনবার অঞ্জলির সময় আবার যতীন দাস রোডের কিশলয় ঢুকে পড়ে। বিদ্যাস্থানে 'ভয়' নিয়ে হাসাহাসি, "কুচযুগ" নিয়ে শিহরণ। প্রসূনের বাবা বলতেন—কণ্ঠশোভিত মুক্তাহারে···।

নীচে প্রসাদের জন্যে লম্বা লাইন পড়েছে। ফল মিষ্টির ছোট ছোট প্লেট্‌। বড় প্লেটে খিচুড়ি, ঘ্যাঁট তরকারি, আলুরদম, চাটনী, পান্তুয়া। পরিবেশনের জন্যে মহিলারা কেউ কেউ ভালো শাড়ির ওপর প্ল্যাস্টিকের অ্যাপ্রন্‌ পরেছেন। খাবার নিতে নিতে গল্প চলছে। লাইন এগোচ্ছে। স্বাতী প্রসূনের সামনেই ছিল। হঠাৎ জগা এসে হাজির।

—"কি মিস্‌ সেন্‌, পড়ে দেখলেন, আমাদের গ্রুপের অ্যাক্‌টিভিটি সম্পর্কে রেগন্‌ সাহেব কি বলেছেন?"

স্বাতী ওকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। প্রসূন এক হাতে খাবারের প্লেট্‌, অন্য হাতে জলভর্তি পেপার গ্লাস্‌ উঁচু করে একটা টেবিল পেয়ে স্বাতীকে ডেকে নিলো। জগাও মহা উৎসাহে বসতে আসছিলো। হঠাৎ শোর্‌-গোল শুনে ঘুরে দেখলো পুরোনো দিনের অভিনেত্রী লীলা চিট্‌নীস্‌কে সঙ্গে নিয়ে পুজোর প্রেসিডেণ্ট অমিয় চৌধুরী ঢুকছেন। জগা ছুটে গেলো।

—"লোকটা পাগল নাকি? কোনোরকম সেল্‌ফ্‌-রেস্‌পেক্ট্‌ নেই! সবাই হাসে। বুঝতেও পারে না?"

স্বাতীর বিরক্তি দেখে লম্বা টেবিলের ওপাশ থেকে রমেনদা হাসছিলেন—"লোকটা নামের জন্যে পাগল। লোকজনের হাসিটাসি কেয়ার করে না।"

—"খুব ইন্‌সিকিওর্ড হলে বোধহয় এরকম হয়। সমাজে পাত্তা পাবার ভীষণ ইচ্ছে, অথচ পাচ্ছে না। খুবই ডেস্‌পারেট্‌ অবস্থা!"

প্রসূন স্বাতীর সঙ্গে আলোচনায় যোগ না দিয়ে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে।

আসলে এইসব মন্তব্য, বিচার-বিশ্লেষণ ইদানীং বেশ গতানুগতিক বলে মনে হয়। মানুষের ইন্‌সিকিওরিটির খবর এত সহজে জেনে ফেলা যায় না। হতে পারে জগদীশ মিত্র লোকটা বেশ হামবড়া গোছের। লেখাপড়াও বেশী নয়। ভায়ের দৌলতে বছর পনের-ষোলো আগে নিউইয়র্কে এসেছিল। সাধারণ চাকরি-বাকরি করে চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নমধ্যবিত্তের শহরে থাকে। ছেলে ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানীতে কাজ করে। মেয়ে আছে গুজরাটি ট্র্যাভেল্ এজেন্সীতে। ঠিক সেভাবে এরা আমেরিকার বাঙ্গালী সমাজের মূলধারায় মিশতে পারেনি। কৌলিন্যের অভাব এই দূরত্বের সৃষ্টি করে থাকবে। কিন্তু সেই কারণেই শুধু মানুষটা আত্মপ্রচার করে বেড়ায় কিনা বলা শক্ত। আসলে সবই হয়ত প্রবণতার ব্যাপার। বহু সফল মানুষকে ভীষণ আত্মস্তর মনে হয়েছে প্রসূনের। জগদীশ অবশ্য ইদানীং নিজে "অ্যাক্‌টিভিস্ট্" বলে প্রচার করছে। ভারতীয় স্বার্থরক্ষা কমিটি না কি যেন একটা দলে ঢুকেছে। ডট্-বাস্টারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুব গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছে কোথায়। ইংরিজিটা একটু নড়-বড়ে। কিন্তু জগা নাকি আবেগ দিয়ে দুর্দান্ত ম্যানেজ করেছে।

হঠাৎ ওরা দেখলো মুখে বিরাট চোঙ্গা লাগিয়ে জগা বক্তৃতা দিতে দিতে আসছে। স্বাতী খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—"প্লীজ প্রসূন! উঠে দ্যাখো জগা কি কাণ্ড লাগিয়েছে।"

প্রসূন ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক। বম্বের স্টার দিগ্‌বিজয়কে ঘিরে অজস্র লোক ঢুকছে। পাশে বেঁটে জগার গলা চোঙ্গার মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত শোনাচ্ছে। জগা প্রচণ্ড চিৎকার করছে—"লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টল্‌মেন্! হিয়ার ইজ সুপার স্টার ডিগ্‌ভিজয়! মাই বিলাভেড ফ্রেণ্ড অ্যাণ্ড ফেমাস্ বেঙ্গলী অ্যাক্‌টর ডিগ্‌ভিজয় ব্যানার্জী। হি কেম্ হিয়ার ওন্‌লি টু অ্যাকসেপ্ট্ মাই কাইণ্ড ইন্‌ভিটেশন··· ।"

অসম্ভব হল্লা আর হাসির আওয়াজে জগার উচ্ছ্বাস চাপা পড়ে গেলো। কে যেন চোঙ্গা কেড়ে নিয়েছে। দিগ্‌বিজয় কিন্তু জগাকে হেনস্থা করছেন না। মৃদু মৃদু হাসছেন। কিন্তু ভীড়ের চাপে জগাকে সরে যেতে হলো। লোকেরা বউ বাচ্ছা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অটোগ্রাফ নিচ্ছে। দিগ্‌বিজয়কে মাঝে রেখে বউ বাচ্ছার ছবি তুলছে। খাওয়াদাওয়া লাটে ওঠার জোগাড়। প্রসূন লক্ষ্য করছিল এখনও ভদ্রলোকের বয়স ধরা যায় না। আগের মতোই সুদর্শন চেহারা। স্বাতীর কাছে শুনেছিল দিগ্‌বিজয় কি শুটিংএর ব্যাপারে এসেছেন। পুজোতে আসার জন্যে সময় দিতে পারছিলেন না বলে পাণ্ডারা আগে থেকে কিছু রটায়নি। তাহলে শেষ পর্যন্ত এলেন। এর মধ্যে পাণ্ডারা জগাকে সরিয়ে সবকিছু টেক-ওভার করে নিয়েছে। দিগ্‌বিজয় ওদের সঙ্গে দোতলার অডিটোরিয়ামে চলে গেলেন। চোঙ্গা হারিয়ে অপ্রস্তুত জগা হাসতে হাসতে আবার ওপরে যাচ্ছে।

রমেনদার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। হট্টগোলের সময় ভীড়ের ভেতরে

ঢুকেছিলেন। ফিরে এসে বললেন—"প্রচণ্ড গুগ্‌লি ছেড়েছে আজ জগা। সাত সকালে নিউ জার্সির পুজো কমিটির কাছে ফোন মেরেছিল। খবর বের করেছিল কখন ওরা দিগ্‌বিজয়কে এখানে পৌঁছোতে আসছে। সেই মতো তক্কে তক্কে পার্কিং লটে ঘুরছিল। গাড়ি থেকে নামতেই পাকড়াও করেছে। কোত্থেকে একটা চোঙ্গাও জুটিয়ে এনেছে!"

হাসতে হাসতে সুদক্ষিণার কাশি শুরু হয়ে গেলো—"উঃ প্রসুন! আর পারছি না। মাই কাইণ্ড ইন্‌ভিটেশন! ডিগ্‌ভিজয়···জগার মতো লোকও আমেরিকায় চালিয়ে যাচ্ছে।"

প্লাস্টিকের চামচ দিয়ে পাতুয়া ভেঙ্গে স্বাতী বললো—"আমার তো লজ্জাই করছে প্রবাসীর বাঙ্গালীর কি ইমেজ!"

প্রসুন ঠাট্টা করলো—"দিগ্‌বিজয়ের কাছে লজ্জা করছে? তাহলে তোমার ম্যাগাজিনের জন্যে দুর্দান্ত ইংরিজীতে একটা ইনটারভিউ নিয়ে ফ্যালো। ইমেজ পাল্‌টে দাও।"

স্বাতী যেন আহত হলো। এক ঝলক তাকিয়ে থেকে বিরক্ত ভাবে বললো —"লোকটার সঙ্গে তো ডিল্‌ করো না। মাথায় শুধু মতলব ঘুরছে। আজ দিগ্‌বিজয়ের হাত জড়িয়ে ছবি তুলিয়ে নিলো। এরপর রোজ রাতে ফোন্‌ করে জ্বালাতন করবে। কোলকাতার কাগজে কেন ওর ছবিটা পাঠাচ্ছি না বলে জেরা করবে।"

হঠাৎ অন্য টেবিল থেকে শিবানী রায় জিজ্ঞেস করলেন—"তোমাকে জগদীশ মিত্র ফোন করে, প্রিন্‌স্টনের ডঃ অর্ণব সেন ফোন করে, আরো কে যেন করেছে শুনলাম। কি ব্যাপার স্বাতী?"

স্বাতী আগেও লক্ষ্য করেছে ভদ্রমহিলা সুযোগ পেলেই ওকে অপমান করতে চেষ্টা করেন। অথচ কি যে কারণ, সেটাই বুঝতে পারে না। মেজাজ ক্রমশ চড়ছিল, চোয়ালে কঠিন ভাব। বেশ গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো—"হ্যাঁ অনেক ফোন পাই, কাগজে লিখি জানেন বোধহয়? আর এখানকার কিছু বাঙ্গালী নিজেদের প্রচারটা ভালোই চান।"

প্রসুনের তর্কাতর্কি ভালো লাগছে না। স্বাতী প্রথম থেকে এত রেগে গেলো কেন? এক একটা এমন স্টেটমেণ্ট করে বসে! এখানকার বাঙ্গালীরা মানে কি? হয়ত কেউ কেউ একটু নামটাম চায়। তাই বলে বাঙ্গালী বাঙ্গাল করে কমেণ্ট্‌ করার দরকার কী?

শিবানী রায় সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন—"এখানকার বাঙ্গালীরা মানে? তুমি তো মাত্র দু-চার বছর হলো এসেছো। কোনো ফ্যামিলির সঙ্গে থাকো না। কোনো গেট-টু-গেদারে আসো না। এত অল্প দিনে সারা আমেরিকার বাঙ্গালীদের চিনে ফেললে কি করে?"

রমেনদা প্রসঙ্গ থামাতে এগিয়ে এলেন—"আরে! এত তর্ক কিসের? ওপরে চলো। প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাচ্ছে। এরপর আর ভালো জায়গা

পাবে না।"

অরিন্দম, সুদক্ষিণা ওপরে চলে গেছে। শিবানী রায় ব্যাগ, ওভারকোট গুছিয়ে নিচ্ছেন। স্বাতীর মুখ রাগে থমথম করছে। উত্তরে ও অনেক কিছু বলতে পারতো। কিন্তু এই পরিবেশে আর কথা বাড়াবে না। তবু উত্তরটা দেওয়া দরকার। শিবানী রায়ের কাছে গেলো। শান্ত গলায় বললো—"আমি কিন্তু সব বাঙ্গালীদের জেনারেলাইজ্ করিনি। শুধু আপনার খুব চেনা লোকেদের কথা বলেছিলাম।"

—"আমার চেনা! স্ট্রেঞ্জ! আমি তো নামের জন্যে পাগল কোনো বন্ধুদেরই আইডেনটিফাই করতে পারছি না। কিন্তু তোমরা আজকাল সবাইকে ক্রিটিসাইজ করছো তোমার ফেমিনিস্ট্ বন্ধু করবী যেমন ইম্প্রেশন দিতে চেষ্টা করে আমেরিকার বেশীর ভাগ ইন্ডিয়ানরা বউদের অ্যাবিউজ্ করে। এগুলো তো বায়াস্ড্ অ্যাটিটিউড্…।"

—"করবীকে টানছেন কেন? ও তো এখানে নেই। আসলে আমি যাদের কথা বলেছি আপনি তাদের ভালোই চেনেন। প্রবাসী আনন্দবাজারে শীর্ষেন্দুর লেখা নিজেদের নাম নেই দেখে যাঁরা ওকে সাহিত্যিক হিসাবে বাতিল করে দিয়েছে তাঁদের চেনেন না? সুনীল গাঙ্গুলীর কাছে এই নিয়ে নালিশ করতে উঠে দারুণ অপ্রস্তুত মুখে বসে পড়েছিলেন যিনি, বঙ্গ সম্মেলনে তাঁকে দেখেননি? একদম পাশেই তো বসেছিলেন। এনি ওয়ে, খুব এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছি দুজনেই। আই থিংক্ উই শুড্ লীভ্।"

স্বাতী চলে গেলো। প্রসূনের সামনেই শিবানী রায় মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে। ওঁর স্বামী এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। এখন যেন প্রসূনকেই বললেন—"শী মাস্ট্ হ্যাভ্ বীন্ প্রিটি আপ্সেট।" প্রসূন আর কি বলবে? দুই মহিলার উত্তেজনা দেখে ও নিজেও মাঝে পড়ে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলো না। এত বিশ্রী লাগছে। সারা সপ্তাহ বাঁধাধরা জীবন। ছুটির দিনে একটু লোকজন, আড্ডা ভালো লাগে। আর সেই জন্যেই পুজোতে এলো। কিন্তু স্বাতী চলে যাচ্ছে। ওকে এই ঠাণ্ডার মধ্যে একা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। প্রসূন ওভারকোট হাতে নিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগোলো। স্বাতী নিশ্চয়ই গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে।

সন্ধ্যের পর ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে। নির্জন শীতের রাত গভীর হওয়ার আগে ওদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল না। লিংকন্ হাইস্কুলের পেছনের পার্কিং লটে সার সার বাঙ্গালীর গাড়ি পার হয়ে প্রসূন নিজের বিউইক্-এর দরজা খুললো। নাটক দেখার ইচ্ছে ছিল। হলো না। তুচ্ছ কারণে এক একটা সন্ধ্যে বরবাদ হয়ে যায়। স্বাতীর যে চলে আসার কি ছিল, তাও প্রসূন বুঝতে পারছে না। বোধহয় এমনিও থাকার ইচ্ছে ছিল না, কে জানে?

—"আমি সাব-ওয়ে দিয়ে যেতে পারি। তোমার পৌঁছে দেবার দরকার নেই।"

প্রসূন তা জানে। স্বাতীকে পৌঁছে দেবার জন্যে সঙ্গে থাকার দরকার নেই। কোনো ব্যাপারেই ও কারুর ওপর নির্ভর করতে চায় না। কুইন্সে যে অ্যাপার্টমেণ্ট থাকে, তার দু ব্লক দূরে সাব-ওয়ে স্টেশন। ইচ্ছে থাকলে এখন ও ট্রেন ধরতে পারতো। তবু প্রসূনের গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো।

গাড়ি স্টার্ট করে প্রসূন বললো—"টেম্পারেচার ফল্ করে যাচ্ছে। এত ঠাণ্ডায় হাঁটবে কেন? আমারও তো কিছু করার নেই।"

—"তুমি আমায় ড্রপ্ করে ফিরে আসতে পারো।"

—"আবার ফিরবো কেন?"

—"দীপনদের নাটকটা দেখবে বলেছিলে। সাড়ে নটার আগে শুরু হবে না।"

—"নাঃ, তাও কিছু ব্যাপার নয়।"

স্বাতী কি বলতে গিয়ে থেমে গেলো। গাড়ি উড্-সাইড্ অ্যাভিনিউ-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে যখন, প্রসূনের খেয়াল হলো আজ বই, ক্যাসেট কিছুই কেনা হলো না। প্রিয়ব্রতদাকে কয়েকটা বই আলাদা করে রাখতে বলে প্রসাদ খেতে গিয়েছিল। কাল ওঁকে একটা ফোন করে দেবে।

ওরা কুইন্স্ বুলেভার্ড ধরে যাচ্ছে। বেশী ট্র্যাফিক নেই। ক্রীসমাসের পরে এ সময় শহরটা ঝিমিয়ে পড়ে। দোকানপাট সবই খোলা। এখনও গাছে গাছে আলোর লতাপাতা জড়িয়ে আছে। তবু যেন উৎসবের শেষে ভাঙ্গা হাটের মতো চেহারা। আপ্-ডাউন্ স্ট্রীমে গাড়ির মিছিল নেই। ওপারের হেডলাইট এপারের টেল্লাইট সমান্তরাল রেখা ধরে আলোর তরঙ্গ সৃষ্টি করছে না। বুলেভার্ডে ধোঁয়া ওঠা প্রেট্জেনের গন্ধ, স্যাণ্টাক্লজের ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজ। শপিংএ ব্যস্ত লোকজন—নরম্যান্ রক্-ওয়েলের আঁকা ছবির মতো এইসব দৃশ্য এখন আর চোখের সামনে নেই। পথ ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। প্রসূন সাবধানে জাংশন বুলেভার্ডে টার্ন নিলো।

স্বাতীর অ্যাপার্টমেণ্টের সামনে পার্কিং নেই। ওকে নামিয়ে দিয়ে প্রসূন ভাবলো আর কোনো রাস্তায় পার্কিং খুঁজবে, না কি সোজা বাড়ি ফিরে যাবে? স্বাতী ওকে একবারও নামার কথা বলেনি। অথচ আজ সন্ধ্যের ঘটনাটা এত সামান্য যে, সে নিয়ে প্রসূনের ওপর রাগ করার কোনো মানে হয় না। স্বাতী পেভ্মেণ্টে উঠে ব্যাগ থেকে চাবি বের করতে করতে একবার এদিকে তাকালো। প্রসূন হাত তুলে গুড-নাইট বলছে। স্বাতী একটু অবাক হলো। প্রসূন হঠাৎ কেন ডিসাইড করলো যে আসবে না? ও তো ধরেই নিয়েছিল ওকে অ্যাপার্টমেণ্টে ঢুকে যেতে দেখে প্রসূন গাড়ি পার্ক করে ফিরে আসবে। হয়ত শেষ মুহূর্তে আর ইচ্ছে হয়নি। গাড়িটা লার্চমণ্ট অ্যাভিনিউ ধরে বাঁদিকে ঘুরলো।

মাঝে তিনদিন কেউ কাউকে ফোন করলো না। যতোবার ফোন বেজেছে, স্বাতী প্রসূনকে আশা করেছে। ওপাশে জগা কথা চালিয়ে গেছে। ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির মেম্বার হিসেবে ওর কোনো প্রচার হচ্ছে না

বলে খুব বিরক্ত। স্বাতীকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ—"আপনি যে ইন্ডিয়ার পেপারে ভুলাভাই দোসীর কথা ফলাও করে লিখেছেন, লোকটা কি কাজ করেছে শুনি? রোজ রোজ ইয়র্কসিটির মেয়রের জুতো পালিশ করে আবার ওয়াশিংটনে লেক্‌চার মারতে গেছে··· ।"

স্বাতী রিসিভারটা কান থেকে একটু দূরে রাখলেও শুনতে পেতো। চিৎকারে কান ফেটে যাচ্ছে। রাতবিরেতে জগার এই হামলা আর সহ্য হয় না। ও নিজেও তর্ক থামালো না—"ও সব জুতো পালিশটালিশ বলবেন না। ভুলাভাই সাউথ্‌ এশিয়ান কমিউনিটির জন্যে প্রচুর কাজ করেন। ডট্‌বাস্টার-দের প্রটেস্ট্‌ মিছিলে আপনি যাননি কেন? অ্যারেস্ট্‌ অর্ডার ছিল বলে? কটা বাঙালী ছিল সেদিন? এতগুলো গ্রুপ এলো। বৃষ্টি মাথায় করে সিটি হলের সামনে ডেমন্‌স্ট্রেশন দিলো। অথচ আপনাদের কাউকে দেখলাম না।"

—"আরে, প্রসেশনে গিয়ে হবেটা কি? কপালে লাল ফোঁটা দিয়ে হাত তুলে তুলে চিৎকার করাটাই আসল নাকি? রেগন্‌ সাহেবের কাছে সেনেটরের থ্রু দিয়ে, কংগ্রেস্‌ ম্যানের থ্রু দিয়ে যাবে কে? সেদিন কংগ্রেস ম্যান আমার পিঠ চাপড়ে বললেন—'মিত্তির সাহেব···' ।"

হো হো করে হেসে উঠে স্বাতী বললো—"সাহেবরা আপনাকে মিত্তির সাহেব বলে ডেকেছে? নাউ, আই মাস্ট্‌ রাইট অ্যাবাউট্‌ ইউ!"

'ওপাশে জগাও হাসছে—"না, মানে, আপনাকে ব্যাপারটা বাংলায় বলছি তো?···আচ্ছা ঐ খামগুলো খুলে দেখেছেন? সঙ্গে ছবি পেয়েছেন? ফাইন্‌! এবার একটা ভালো কভারেজ করে দিন। হ্যাঁ, প্রাণকেষ্টও বড়ো করে ছাপাবেন।"

—"প্রাণকেষ্ট?"

—"আরে ঐ 'মহানগরে'র মালিক। সরস্বতী পুজোয় দেখেননি দুজনে কতো গল্প করছিলাম।"

স্বাতীর খেয়াল হলো 'মহানগরে'র বৃদ্ধ মালিক প্রাণকৃষ্ণ বোসের ছেলে রামকৃষ্ণ সেদিন বউ নিয়ে এসেছিলেন। আমেরিকায় মেয়ের কাছে বেড়াতে এসেছেন খবর পেয়ে পুজো কমিটি নেমন্তন্ন করেছিল। জগা জেনারেশন গুলিয়ে ফেলেছে। আসলে নামই গুলিয়েছে।

—"ওঃ, সেদিন কি ছোটাছুটি গেছে! এদিকে প্রাণকেষ্ট, দিগ্‌বিজয়, ওদিকে লীলা চিটনীস্‌। আপনি কোথায় ছিলেন? তিনটে ইন্‌টারভিউ করিয়ে দিতাম।"

স্বাতী তো তখন ঝগড়ায় ব্যস্ত। আর ওই জগাকে নিয়েই ঝগড়াটা লেগেছিল। অবশ্য ডিফারেন্স্‌ অফ্‌ ওপিনিয়ন্‌'থেকে একটু তর্কাতর্কি হতেই পারে। আপাততঃ মেজাজ ঠিক হয়ে গেছে। জগার সঙ্গে কথা শেষ করে ফোন্‌ রেখে দিলো।

প্রসূন মাঝে দুদিন শহরে ছিল না। ওদের অফিস থেকে প্রায়ই টেক্‌নি-

ক্যাল কন্‌ফারেন্সে পাঠায়। সোমবারের ফ্লাইটে নর্থ ক্যারোলাইনা গিয়েছিল। "ইণ্ডাসট্রিয়াল অ্যাণ্ড্ কমর্শিয়াল পাওয়ার সীসটেম"-এর ওপর দুদিনের কন্‌-ফারেন্স্ ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পাওয়ার জেনারেশন, ডিস্‌ট্রি-বিউশন্ আর ইউটিলাইজেশনের কচকচি। ওর নিজের পেপার তৈরী করেছিল "সেফ্‌টি প্রাকটিসেস্ ইন্ পাওয়ার সীস্‌টেম ডিজাইন অ্যাণ্ড অপারেশন" নিয়ে। এর ওপর ডিনারের শেষে বাড়তি বক্তৃতা শোনা। সামনের মাসে প্রসূনকে যেতে হবে ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্‌স্ এঞ্জিনীয়ারিংএর সেমিনারে। তার জন্যে "অ্যাপ্লিকেশনস্ অফ্ সীস্‌টেম অ্যাণ্ড ইকুইপ্‌মেণ্ট্ গ্রাউণ্ডিং, ইন্‌ক্লুডিং সেন্‌সিটিভ ইলেকট্রনিক ইকুইপমেণ্ট্" নিয়ে পেপার লিখছে। অর্ধেক সপ্তাহ এই নিয়ে কাটলো। তারপর স্বাতীর সঙ্গে দেখা করার সময় পেলো। আগে ফোন করলো। ফোন পেয়ে স্বাতী প্রথমে বলেছিল উইক্-এণ্ডে ও খুব ব্যস্ত থাকবে। বোধহয় দেখা হবে না। প্রসূন বেশী প্রশ্ন করেনি। আবার স্বাতী নিজেই ফোন করলো—"শনিবার আমার সঙ্গে আপ্-স্টেট্ নিউইয়র্কে যাবে? জ্যাজ্ ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছি।"

—"এই শনিবার? আগে বললে পারতে। আমার একটা নেমন্তন্ন আছে।"

—"গোট মীট্ কন্‌ফারেন্স্? তারপর মাঝরাত অবধি হারমোনিয়াম আঁকড়ে অনুরোধের আসর?"

—"রাইট! জানোই তো মাঝে মাঝে আইডেন্‌টিটি খুঁজতে যাই।"

—"রেগে যাচ্ছো মনে হচ্ছে? ইমিগ্র্যাণ্ট সার্কলে তোমাদের এই আই-ডেন্‌টিটি কথাটা কিন্তু একদম স্টিরিওটাইপড্ হয়ে যাচ্ছে প্রসূন। আর সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার নামে এত নেমন্তন্ন খাওয়া যে কে চালু করে দিলো?"

—"সেটা ভুলে যাওয়ার জন্যেও তো কত লোক কত কি করে!"

—"বুঝলাম না।"

—"আর তর্ক ভালো লাগছে না। তুমি আপ্-স্টেটে যাও। আমি লং-আইল্যাণ্ডে যাই।"

—"একদিন রুটিন্ চেঞ্জ করতে পারো না?"

—"রুটিন নয় স্বাতী। আমাদের আড্ডাগুলো রিল্যাক্সেশনের ব্যাপার। আমেরিকায় থাকলেই কি অ্যাসোসিয়েশন চলে যায়? এতদিনে বুঝেও গেছি অনুষঙ্গের ভূত আর ঘাড় থেকে নামবে না।"

—"এত ভালো ভালো বাংলা শনিবারে এসে শুনিও। কন্‌সার্ট থেকে রাত এগারটা, সাড়ে-এগারটার ভেতর ফিরে আসবো। তুমিও ততোক্ষণে ছাগলের ডালনা, ছানার জিলিপি খেয়ে চলে এসো। অনেকক্ষণ ঝগড়া করে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ো। গুড্‌বাই···।"

শুক্রবারে প্রসূন অফিসে জেরীকে দেখতে পেলো না। আগের দিন লাঞ্চের সময় ক্যাফেটেরিয়াতে ও ছিল না। নর্থ ক্যারোলাইনা যাওয়ার আগে শুনেছিল জেরীর মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা, হজমের গোলমাল হচ্ছে। পিঠের যন্ত্রণার

কথাও বলেছিল। গল্‌ব্লাডার আল্‌ট্রাসাউণ্ড টেস্ট করানোর কথা ছিল। আজ অফিসে লিণ্ডা খবর দিলো জেরীর গল্‌ব্লাডার সার্জারি হয়েছে। ওদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে হস্‌পিট্যালে গেট-ওয়েল্‌ কার্ড আর ফুল পাঠাচ্ছে। লিণ্ডা প্রসূনের কাছে কার্ড সই করাতে এসেছিল। গতবছর পর্যন্ত প্রসূন জেরীদের ডিপার্টমেণ্টে ছিল। সিনিয়র এঞ্জিনীয়রদের মধ্যে জেরীর সঙ্গে ওর বেশ হৃদতা হয়েছে।

গেট-ওয়েল কার্ডে বব্‌ আর বার্নি লিখেছে—"কাম ব্যাক্‌ জেরী লিউইস্‌!" জেরী খুব রসিক। কমেডিয়ানদের মতো হাবভাব। এখন হাস-পাতালে শুয়ে কি করছে কে জানে? প্রসূন ভাবছিল বাড়ি ফেরার আগে এলম্‌হার্স্ট হসপিট্যালে জেরীকে একবার দেখে যাবে। আটটা পর্যন্ত ভিজিটিং আওয়ার। সাড়ে সাতটার ভেতর পৌঁছে যেতে পারবে।

এলম্‌হার্স্ট হস্‌পিট্যালে জেরীর ক্যাবিনে ঘনঘন ভিজিটর ঢুকছে বেরোচ্ছে, জেরীর আত্মীয়স্বজন বেশীর ভাগ এই কুইন্‌স্‌ অঞ্চলেই থাকে। রুগী এর মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠে বসেছে। বউয়ের হাত জড়িয়ে গল্প করছে। প্রসূনকে দেখে খুব খুশী। বললো—"ট্রাই নট্‌ টু গেট্‌ সীক্‌ বিফোর ইউ গেট্‌ ম্যারেড।" বউয়ের মতো নাকি সমব্যথী নেই। "সীক্‌নেস্‌ মীন্‌স্‌ লট্‌স্‌ অফ্‌ অ্যাটেন্‌শন্‌"—বলেই বউয়ের হাত জড়িয়ে খুক্‌ খুক্‌ করে হাসছিল। পেটে চাড় লাগতে মুখ কুঁচকে আ ও···ও···বলে হাসাহাসি বন্ধ করলো। জেরীর পক্ষে হিউমার ছাড়া থাকা শক্ত।

বাড়ি ফিরে প্রসূনের বেশ ক্লান্ত লাগছিল। পুরো সপ্তাহটা ছুটোছুটি করে কাটলো। কন্‌ফারেন্সের জন্যে বাইরে থাকায় ফিরে এসে অফিসে চাপ ছিল। আজ আর রান্না করার এনার্জি নেই। ফ্রীজ্‌ খুলে দেখলো আগের দিনের টেক-আউট্‌ চাইনীজের অল্পস্বল্প পড়ে আছে। খিদেও তেমন নেই। একটা ড্রিংক্‌ নেওয়া যেতে পারে। জিন্‌ অ্যাণ্ড টনিক নিয়ে লিভিং রুমে গিয়ে বসলো।

নিউজ্‌ উইক্‌এর পাতায় চোখ রেখে, টি. ভি. শুনতে শুনতে প্রসূনের ঘুম পাচ্ছিলো। রাত সাড়ে নটাও বাজেনি। উইক্‌-এণ্ডের পক্ষে সন্ধ্যেরাত। বাইরে ঝিরঝিরে বরফ পড়া শুরু হয়েছে। জানলায় দম্‌কা হাওয়ার শব্দ। ইস্টরিভারের ওপর ব্রীজের বিন্দু বিন্দু আলো ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। অন্ধকারে নদীর জল দেখা যায় না। প্রসূন জেরীর কথা ভাবছিল।··· সীক্‌নেস্‌ মীনস্‌ লট্‌স্‌ অফ্‌ অ্যাটেন্‌শন···।

প্রসূন টি ভি বন্ধ করে দিলো। মাইক্রো-ওয়েভে খাবার গরম করে রাতের পর্ব মিটিয়ে কিছুক্ষণ লিভিংরুমে বসেছিল। তারপর আর ভালো লাগছিল, না। বাড়ি অন্ধকার করে বেডরুমের বিছানায় গিয়ে শুলো। বাইরের বরফ বৃষ্টিধারা হয়ে নামছে। ভালোই হয়েছে আজ তার কোথাও যাবার ছিল না। এই ঊর্ধ্বশ্বাস জীবনযাত্রায় নিজেকে নিয়ে ভাবনার সময় নেই। মানুষের

অস্তিত্ব যে সহস্র ঘটনাবিন্যাসের প্রয়োজনে শত সহস্র উপাদানের মতো নগণ্য। এখানে আপাত সুস্থ মানুষের জন্যে কারুর উদ্বেগ নেই। অনুভূতির অপচয় নেই।

ক্রমশঃ প্রসূন বিষণ্ণ বোধ করছিল। অন্ধকার, নৈঃশব্দ, একাকিত্বের মাঝে সে স্বাতীর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা চিন্তা করছিল। এইসব দেখাশোনা, ঘনিষ্ঠতার মধ্যে এমন কোনো গভীর আকাঙ্ক্ষা নেই, প্রতিশ্রুতি নেই, যাকে তার সুনিশ্চিত পরিণতির সূচনা বলে মনে হতে পারে। স্বাতী দীর্ঘসময় তার নিজ জগতে সম্পূর্ণ একা থাকতে চায়। প্রাত্যহিক জীবনের অনেক ঘটনার সঙ্গে প্রসূনকে যুক্ত করে না। কতো বার বলেছে—'ব্রিদিং টাইম্' না পেলে যে কোনো সম্পর্কই ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। শ্বাস নেবার মতো দূরত্ব আর অবকাশের জন্যে মাঝে মাঝে স্বাতী এক শহরে থেকেও যোগাযোগ রাখে না। প্রসূন দেখা করার চেষ্টা করে, দেখা হয় না।

তখন স্বাতীর উদাসীনতায় আহত প্রসূন নিজের স্বভাবে এক আপাত নিস্পৃহভাব আরোপ করতে চেষ্টা করেছে। অথচ যখন শুনেছে স্বাতী কারু সঙ্গে "মিউজিয়ম অফ্ মডার্ন আর্ট"এ এক্জিবিশনে গেছে, নয়তো লিংক সেণ্টারে অপেরা দেখতে গেছে, তখনই মনে হয়েছে—আমাকে যাওয়ার জন্যে বলেনি। কেন স্বাতী ধরে নেয় ওখানে আমার ভালো লাগবে না?

প্রসূন বাঙ্গালী সমাজে মেশে। স্বাতীর ধারণা ঐ আড্ডাগুলোয় একঘেয়ে গল্প ছাড়া কিছু হয় না। এই সেদিন দেশ থেকে এসে কিভাবে যে ওর আমেরিকার সবকিছু এত ভালো লেগে গেলো। এদেশে দশ বছর আছে প্রসূন তবু অপেরায় বসে স্বাতীর মতো অসাধারণ আনন্দ পায় না। ওর নাটক ভালো লাগে। স্বাতীর সঙ্গে মিউজিক্যাল্ অফ্-ব্রড্-ওয়ে দেখার জন্যে টিকিট কাটে, গ্রীন্-উইচ্ ভিলেজে কবিতা শুনতে যায়। কিন্তু স্বাতী ওর সঙ্গে বাঙ্গালীর জলসায় যেতে চায় না, পুজোতে যেতে চায় না। আজকাল লেখালেখির জন্যে তবু বঙ্গ সম্মেলনে যেতে শুরু করেছে। প্রসূনের মনে হয় এ শুধু ছোটখাট রুচিভেদের কথা নয়। হয়ত মূল্যবোধের প্রশ্ন আছে। হয়ত আরো কোনো বাধা আছে। সান্নিধ্যের তীব্র আকর্ষণ সত্ত্বেও তাদের জীবন-যাপনের ছন্দ মিলছে না। স্বাতী কি অনায়াসে তার প্রত্যাশা, অধিকারবোধকে উপেক্ষা করে যায়। 'সেণ্টিমেণ্ট' নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। মানসিকতার এত প্রভেদ, মতান্তর, তবু যে কিভাবে তারা বন্ধু হয়ে গেলো? অনেক রাত পর্যন্ত প্রসূন এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল।

শনিবার রাত বারোটার পরে প্রসূন স্বাতীর অ্যাপার্টমেণ্টে এসে পৌঁছোলো। লং-আয়ল্যাণ্ড্-এক্সপ্রেস্-ওয়েতে অল্প ভীড় পেয়েছিল। স্বাতী আগেই ফিরেছে। রাতের পোশাক পরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিলি জোলের টেপ্ শুনছিল। একটু কথাবার্তার পরে প্রসূন বাথরুমে গিয়ে পোশাক বদলে বিছানায় এলো। স্বাতী বেড-সাইড ল্যাম্প নিভিয়ে দিয়েছে। বিছানায় তার

শরীরের উত্তাপ, পরিচিত সুগন্ধ। বাথরুমে ঝোলানো স্বাতীর রোব্ থেকে, তোয়ালে থেকে পারফিউমের যে মৃদু গন্ধ প্রসূনকে আকর্ষণ করেছিল, সেই সুবাস এখনও স্বাতীকে ঘিরে আছে। স্বাতী কাছে এলো। প্রসূনের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘ চুম্বনের শেষে বললো—এত দেরী করলে। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম।

প্রসূন খুব সন্তর্পণে স্বাতীকে আদর করছিল। যেন সামনে দীর্ঘ রাত অপেক্ষা করে আছে। প্রহরের প্রতিটি মুহূর্ত সে তিল তিল করে ভোগ করতে চাইছিল। এই মেয়ে তাকে কি যে অস্থির করে তোলে। দেখা না হওয়ার জন্যে, দেখা হওয়ার জন্যে, প্রসূন স্বাতীকে তীব্র আশ্লেষে জড়িয়ে ধরেছিল। এক সময় শরীরের অন্বেষণ শেষ হলে আবিষ্কার করেছিল কোনো অভিজ্ঞতা অন্য অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি নয়।

প্রসূনের ঘুম আসছিল। ছোট ছোট হাই তুলে স্বাতী বললো—"ইউ টুক্ সো মাচ্ টাইম্…।" প্রসূন ঘুমিয়ে পড়ার পরে আরও খানিকক্ষণ জেগে রইলো স্বাতী। মনে পড়লো আজ প্রসূনকে খবরটা দেওয়া হলো না।

রবিবার ব্রেকফাস্ট খেতে বসে স্বাতী বললো—"তোমাকে কাল বলা হয়নি। একটা গুড্ নিউজ আছে।"

একটুও কৌতূহল না দেখিয়ে প্রসূন বললো—"আমারও একটা আছে।"

—"তাহলে তোমারটাই আগে শুনি।"

প্রসূন সামান্য সময় স্বাতীর চোখের দিকে চেয়ে থাকলো—"ভাবছি শীগগির বিয়ে করবো।"

—"ডিসাইড্ করে ফেলেছো?"

—"অল্‌মোস্ট্।"

—"ভালো তো। কাকে করবে ভাবছো?"

—"বিয়েটা তো দু ভাবে হয় জানি। হয় আমার বিশেষ কাউকে পছন্দ, তাকে অ্যাপ্রোচ্ করবো। নয়তো সেরকম কেউই নেই। কিন্তু বউ খুব দরকার। তখন খুঁজতে বেরোবো।"

—"তুমি কি ভাবছো? খুঁজে আনতে দেশে যাবে? নাকি এখানেই কেউ আছে?"

প্রসূন বুঝতে পারছে স্বাতী ঠাট্টা করছে না। না বোঝার ভান করছে না। শুধু কোনো বোঝাপড়ায় আসবে না ভেবে কথা নিয়ে খেলা করছে। প্রচ্ছন্ন অভিমানে তার কণ্ঠস্বর ভারী শোনালো—"হয়ত কেউ আছে। তবু আমি তাকে বিয়ের কথা বলছি না স্বাতী।"

খুব সহজ ভাবে স্বাতী জিজ্ঞেস করলো—"কেন বলছো না প্রসূন?"

প্রত্যাশা এবং ক্রমশ সংশয় থেকে প্রসূন উত্তর দিলো—"শেষের কবিতা নয়তো রাজা ও মালিনীর মতো আর একটা গল্প হবে বলে।" কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষায় কেটে গেলো। প্রসূন সামান্য হাসলো—"আমি তোমাকে

বিয়ের কথা বলছি না।"

প্রসূন দেখলো স্বাতীর চোখে বিষণ্ণতার ছায়া। তবু যেন এটাই ছিল ওর কাছে স্বাভাবিক ঘটনা। স্বাতী কফির কাপ নামিয়ে রেখেছিল। ওর হাত কখন প্রসূনের হাত ছুঁয়েছিল, কণ্ঠস্বরে আবেগ—"বোলো না প্রসূন! কমিট্‌মেণ্ট্‌ ব্যাপারটাই আমাদের জন্যে নয়! দ্যাট্‌ ওণ্ট্‌ ওয়র্ক্‌…।"

প্রসূন প্রশ্ন করতে পারলো না—তবে ভালোবাসা নিয়ে কোথায় পৌঁছোনো যায়? জানতে চাইলো না—কেন প্রতি মুহূর্তের ভালোলাগা আর হৃদয়ের গভীর অনুভবকে শত সহস্র মুহূর্তের মালায় গেঁথে রাখতে চাওয়ার নাম কমিট্‌মেণ্ট্‌?

শেষ পর্যন্ত প্রসূনের চলে যাওয়াও নাটকীয় হলো না। রওনা হবার আগে ফোন্‌ বাজলো। স্বাতী ফোন্‌ তুলে ওকে অপেক্ষা করতে বললো। প্রসূন খানিকক্ষণ ধরে শুনলো টি ভি. প্রডাক্‌শন নিয়ে স্বাতী কার সঙ্গে কথা বলছে। বোধহয় সুরেশ চাওলার ফোন্‌। একটু অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়ালো—"আই মাস্ট্‌ লীভ্‌ স্বাতী। পরে কথা হবে।" স্বাতী বাধা দিলো না।

প্রসূনের বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। গাড়ি চালাতে চালাতে স্বাতীর কথাগুলো মাথায় ঘুরছিল। বেশ কিছুদিন থেকে স্বাতীর ব্যবহারে আরো যেন ছাড়া ছাড়া ভাব লক্ষ্য করছে। স্বাতী সুরেশ চাওলার প্রোডাক্‌-শনে শনিবারের ইণ্ডিয়ান টি ভি. প্রোগ্রামে কাজ নিয়েছে—খবরটা একবার জানায়নি। ওদের প্রোডাক্‌শনের নাভ্‌রোজ দস্তুরের কাছেই শুনেছে প্রসূন। লং আয়ল্যাণ্ডে মনীশরা শনিবারের টি. ভি. প্রোগ্রামে স্বাতীকে এক ঝলক দেখেছে। এখন থেকে শনিবার সকালে ও নিউজ পড়বে। কমিউনিটি অ্যানাউন্স্‌মেণ্ট আর ইণ্টারভিউ করবে। বেশ কয়েক বছর ধরে তিন-চারটে ইণ্ডিয়ান আর পাকিস্তানী প্রোগ্রামে নতুন নতুন মুখ আসছে, যাচ্ছে। এ সব কাজে প্রেজেণ্টেশনের পাশাপাশি গ্ল্যামারের ব্যাপারও থাকে। স্বাতীর ইচ্ছে হতেই পারে। প্রসূনকে না বলার কি ছিলো?

সেদিন নাভ্‌রোজের কথা থেকে মনে হলো স্টুডিওর কাজের জন্য স্বাতীর সঙ্গে ওর মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে। চাওলাকে নিয়ে হাসছিল। ওকে প্রোডাক্‌-শনের অন্য লোকেরা "মাচো ম্যান্‌" বলে ঠাট্টা করে। দুবার ডিভোর্স্‌ হয়েছে। আমেরিকান আর পাঞ্জাবী বউকে ছেলে মেয়ে সুদ্ধু অ্যালিমনি চালিয়ে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে ওর তিনটে রেস্টোরেণ্ট। নিউজার্সিতে ফোর্ড্‌ মোটরের ডিলারশীপ্‌। আপাততঃ বছর দুই হলো টি. ভি.তে ইণ্ডিয়ান চ্যানেলের হোস্ট্‌ হয়েছে। চাওলা ব্রডকাস্টিং নেট্‌ ওয়ার্ক।

নাভ্‌রোজ জানে প্রসূনের সঙ্গে স্বাতী ডেট্‌ করছে। তা ও হাসতে হাসতে বলে দিলো—"স্বাতী কি জানে এটা ওর টেম্‌পর‍্যারি অ্যাসাইনমেণ্ট। চাওলা কয়েক মাসের জন্যে এক এক জন বিউটিকে হায়ার করে। নিজে বোর্‌ হয়ে

গেলে আবার নতুন মুখ খোঁজে।"

প্রসূনের বিরক্ত লাগছিল। একেবারে গতানুগতিক মন্তব্য করছে লোকটা! যাকে বলে স্থূল ইঙ্গিত, তাই-ই করছে। ভুরু কুঁচকে বললো—"নাভ্‌রোজ, আই ডোণ্ট্ বাই দ্যাট্। এটা চাকরির ব্যাপার। ভালো পারফরমেন্স্ আর ভিউয়ারদের রেটিং নিয়ে শো চলে। চাওলা কি বিজ্‌নেস বোঝে না বলতে চাও?"

নাভ্‌রোজ দস্তুর তখনও হাসছিল—"ডোণ্ট্ অ্যাস্‌ক্ সো মেনী কোয়েশ্‌চেন্‌স্। এনি ওয়ে, তুমি বোধহয় জানো না স্বাতী আজকাল চাওলার ম্যান্‌হাটনের অ্যাপার্টমেণ্টে অনেকখানি সময় কাটাচ্ছে।" প্রসূন তিক্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলো—"তাতে কি প্রমাণ হচ্ছে?" নাভ্‌রোজ একটু চুপ করে বললো—"আই ডোণ্ট্ ওয়ণ্ট টু প্রুভ এনিথিং। মিড্-উইকে ছবি তুলতে পীট্‌স্‌বার্গের মন্দিরে গিয়েছিলাম। স্বাতী ওখানে প্রিস্ট্‌দের ইণ্টারভিউ নিলো। লোক্যাল্ আমেরিকানদের রি-অ্যাকশন্ নোট্ করলো। চাওলার পাশের ঘরেই ছিল দুদিন। দে ওয়্যার্ হ্যাভিং গুড্ টাইম্…নাভ্‌রোজ প্রসূনের মুখের রেখার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলো। ওর গলার স্বর বদলে গেলো—"তোমাকে আপ্-সেট মনে হচ্ছে? আমার ধারণা স্বাতী তোমার বন্ধু। গার্ল ফ্রেণ্ড নয়।"

প্রসূন স্বাতীকে গার্ল ফ্রেণ্ড বলে পরিচয় দেবার চেষ্টা করে না। তবু নাভরোজ সেদিন যেন এক সারি মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে গেলো। গভীর দুর্বলতা, সম্মোহনের আবেগ তাকে এই সম্পর্কের পরিণতি দেখার জন্যে অস্থির করে তুলেছিল। হয়ত বোঝাপড়ার সময় এসেছে। স্বাতীর সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার।

উইক-এণ্ডে প্রসূন স্বাতীকে চাওলার কথা জিজ্ঞেস করেনি। আশাকরি ও নিজে থেকে টি. ভি.র চাকরির কথা বলবে। স্বাতী সে কথা তোলেনি। সকালে প্রসূন সরাসরি বিয়ের কথা বলেছিল। যেন স্বাতীর সঙ্গে শেষবার নিজের স্বপ্ন নিয়ে খেলা করার ইচ্ছে হয়েছিল, যদিও সে খেলার হারজিৎ তার জানা ছিল। শুধু আর একবার নিঃসংশয় হওয়া। আর একবার প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়া।

রবিবার সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে কোথাও ভালো লাগছিল না। মুভী হলে "ভিডিও সেক্‌স্ অ্যাণ্ড লাইজ্" ছবিটা দেখে বাড়ি ফিরলো। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের অনিশ্চয়তা নিয়ে ঐ ছবির মধ্যেই এমন অনেক সংলাপ ছিল, যা প্রসূনের নিজের জীবনের কথা বলে মনে হচ্ছিলো। মানুষের সম্পর্কগুলো ক্রমশ আল্‌গা আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোনো সংবেদন নেই। শর্ত, অধিকারবোধ বলে কিছু নেই। "কমিটমেণ্ট্" শব্দটাকে মনে মনে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয় প্রসূনের। কি কঠিন এক বাস্তব শব্দ প্রতিদিন ভালোবাসার অপমৃত্যু ঘটিয়ে চলেছে।

রাত দশটার পরে স্বাতীর ফোন্ এলো।

—"সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরছো বলো তো? কতোবার কল্ করলাম, ফোন্ বেজে গেলো।"

—"কেন? কিছু দরকার ছিলো?"

—"দরকার ছাড়া ফোন্ করি না আমরা? তুমি তো আমার ভালো খবরটা না শুনেই চলে গেলে।"

—"বলো, কি খবর।"

—"চাওলা ব্রডকাস্টিংএ জয়েন্ করেছি। শনিবার শনিবার ঘুমলেই আমার মুখ দেখবে।"

—"সে তো এমনিও দেখি মাঝে মাঝে···কিন্তু অফিস ক'রে এত সময় পাচ্ছো কখন?"

স্বাতী হাসলো—"খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু এন্জয় করছি। নিউজ মিডিয়াতে এ ধরনের এক্সপোজার পাওয়া মানে···"

প্রসূন কথা শেষ করতে দিলো না—"হঠাৎ ইণ্ডিয়ান্ প্রোগ্রামে তোমার এত ইন্টেরেস্ট্? সাউণ্ড্স্ ভেরী আন্-ইউশুয়্যাল্!"

—"এভাবে বলছো কেন প্রসূন? খুশী হওনি মনে হচ্ছে?"

—"আমার খুশী হওয়া না হওয়া তোমার কাছে ইম্মেটিরিয়্যাল্। তুমি এক্স্পোজার চেয়েছো। পাচ্ছো। সেটাই বড় কথা।"

—"কি হয়েছে তোমার? সকালে কথা বলার পর থেকেই আপ্-সেট্ মনে হচ্ছে।"

—"তাই মনে হচ্ছে তোমার?"

—"তখনও মনে হয়েছিল···কিন্তু প্রসূন, তুমি তো জানো, আমি এখনই কোনো রিলেশন্শীপের মধ্যে যেতে চাই না।"

—"জানি। কমিট্মেণ্টের জন্যে অনেক কিছু হারাতে হবে বলে ভয় পাও।"

—"হয়ত তাই। আসলে, আমার একা থাকতে ভালো লাগে। এখনও পর্যন্ত এতটুকু অ্যাডজাস্ট্মেণ্ট্, ইম্পোজিশনের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করে না। সেই জন্যেই বলেছিলাম আমার কাছে কমিটমেণ্ট্ আশা কোরো না।"

—"আশা করছি না তো। আই হেট্ দ্যাট ওয়র্ড!"

—"খুব রি-অ্যাক্ট্ করছো। টি. ভি. প্রোগ্রামের কথা থেকে শুধু শুধু অন্য কথায় চলে যাচ্ছো।"

—"ওটাতে আমার কোনো ইন্টেরেস্ট্ নেই। রোজ রোজ নতুন চ্যানেল্, একঘেয়ে হিন্দি নাচ, গান! কটা লোক দেখে?"

স্বাতী বুঝতে পারছিল প্রসূন ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে। তার নিজেরও ধৈর্য চলে যাচ্ছিলো। তবু গলা নীচু রেখে বললো—"আমাকে যদি মিডিয়া ইউটিলাইজ্ করতে চায়, তাতে তোমার এত আপত্তি কেন?"

—"ইউটিলাইজ্ নয় স্বাতী, এটা এক্স্প্লয়টেশন্! মিডিয়া নয়, একটা বাজে লোক তোমাকে এক্স্প্লয়েট্ করছে। আই নো, চাওলা ইজ্ হ্যাভিং এ গুড্ টাইম্ উইথ্ ইউ!"

রাগে, অপমানে স্বাতী স্তব্ধ হয়ে গেলো। প্রসূন যে এরকম সন্দেহ করতে পারে, ওর ধারণাও ছিল না। বন্ধুত্ব মানেই কর্তৃত্ব নয়। ফোন্ রেখে দেওয়ার আগে শুধু বললো—"আমার জীবন তোমার রুটিনে চলে না প্রসূন। এনি ওয়ে, চাওলাকে নিয়ে মাথা ঘামানোটা কিন্তু খুবই অ্যাব্সার্ড ব্যাপার···। রাখছি। গুড-নাইট।"

স্বাতীর শেষ কথাগুলো প্রসূনের কাছে খুব স্পষ্ট হলো না। কি বলতে চাইছিল স্বাতী? কোন্ কথাটা ওর অ্যাবসার্ড মনে হয়েছে? চাওলাকে নিয়ে মন্তব্য করার মতো কোনো ঘটনাই হয়নি? নাকি তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়ে থাকলেও প্রসূনের সে নিয়ে কথা বলার কোনো যুক্তি নেই? ইচ্ছে হচ্ছিলো একবার ওকে ফোন্ করে। শেষ পর্যন্ত রিসিভার তুলে আবার রেখে দিলো। আর কিইবা বলার আছে।

শুতে যাবার সময় প্রসূন ওর বিছানায় শনিবারের চিঠিপত্র পড়ে থাকতে দেখলো। গতকাল দুপুরে মেইল্ বক্স্ থেকে এনে উল্টেপাল্টে দেখে বেরিয়ে গিয়েছিল। এখন সরিয়ে রাখতে গিয়ে কাগজপত্রের ফাঁকে জগো মিত্রের পাতলা খাম চোখে পড়লো। ঠিক খামও নয়। স্টেপ্ল্ করা কাগজ। প্রসূন ভাঁজ খুললো। জগার লেটার হেডএ টাইপ্ করা কয়েকটা লাইন। লেখা আছে—ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে চাওলা ব্রডকাস্টিং নেট ওয়ার্কে হোলি ফেসটিভ্যাল্ সম্পর্কে বলবে জগদীশ মিত্র, কিরীট মেহতা, হরদীপ্ কাউর। ইণ্টারভিউ করবে স্বাতী সেন।

স্বাতীর নামটা জগা লাল কালি দিয়ে আণ্ডারলাইন করেছে। নিশ্চয়ই প্রসূনের জন্যে। নিজের নামের নীচে আরো মোটা করে লাল লাইন টেনে দিয়েছে। চিঠির মধ্যে হোলি খেলা! প্রসূন হেসে ফেললো। সারাদিনের পরে এই প্রথম ওর মনে হলো যেন স্নায়ুর ওপর থেকে চাপ সরে যাচ্ছে। জীবন অনেক বড়। রাগ, অনুরাগ, মান, অপমান, সময়ের নদী সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকে না।

স্বাতীকে তার নিজের পারস্পেক্টিভে বিচার করলে ঘটনাগুলোর মধ্যে হয়ত তেমন কোনো অসামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। চাওলার সঙ্গে স্বাতীর সম্পর্ক নেহাৎ কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা, জগদীশ মিত্রকে নিজের প্রয়োজনে প্রাধান্য দেওয়াও এক ধরনের আপস কিনা—এ নিয়ে প্রসূন আর বিশ্লেষণে যেতে চাইলো না। সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল এই জীবনের অভিজ্ঞতার পরম্পরায় স্বাতী এক সুখদুঃখের সংযোজন মাত্র।

অতঃপর প্রত্যাশাবিহীন সেই নিঃশর্ত সম্পর্কের জন্যে প্রসূন তার অধিকারবোধের খড়ির গণ্ডী মুছে ফেললো।

অ্যাঞ্জেলিকা গ্যাভিয়ারোর সঙ্গে আসা লোকজন চলে যাবার পরে আমি এই সংসারকে বাইরের মানুষের দৃষ্টি নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের সম্পর্কে অন্য লোকের বিচার-বিশ্লেষণ কেমন হওয়া সম্ভব, সে সব আন্দাজ করতে গিয়ে ভেবেছিলাম—এই পরিবেশের বাসযোগ্যতা নিয়ে নিশ্চয় তাদের কোনও সংশয় থাকবে না। আমাদের কি নির্ভর করার মতো মানুষ বলে মনে হয় না ?

স্টেট ডিপার্টমেণ্ট অফ্ ইউথ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের লোকেরা যা যা জানতে এসেছিল, তার বেশির ভাগ উত্তর পেয়ে গেছে। আমাদের ইনকাম কত, কে কী কাজ করি, শরীরগতিক কেমন, এগুলো তো জানাতেই হল। তারপরেও কত প্রশ্ন। জানতে চাইছিল বাড়িতে মেড্ আর বেবি সিটার রাখি কিনা। আমাদের দু'জনের কারুর অ্যাল্কোহলের প্রবলেম আছে কিনা, ড্রাগের ব্যাপার, পুলিসের রেকর্ড, এমনকি শমীক আর পলার স্কুলের অ্যাক্টিভিটি পর্যন্ত জানতে চাইল। খবর নেহাত কম নেয়নি। চারজনকেই তো ফ্যামিলি সাইকোলজিস্টের সঙ্গে বসতে হল। ভদ্রলোকের ইভ্যালুয়েশনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

সুজয় আর আমাকে সরিয়ে দিয়ে ওরা যখন শমীকদের ডাকল সে সময় রান্নাঘরে কফি তৈরি করতে গিয়েছিলাম। অ্যাঞ্জেলিকা সঙ্গে থেকে ট্রেতে কাপ প্লেট সাজাচ্ছিল। ওকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'সবাইকে এত কথা জিজ্ঞেস করে ? নাকি ইণ্ডিয়ান বলে বেশি খোঁজ খবর নিচ্ছে ?'

—'না, এটাই নিয়ম। বাইরে থেকে একটা ফ্যামিলিকে কতটুকু বোঝা যায় ? অনেকরকম ইনফরমেশন, ভেরিফিকেশনের দরকার হয়, বুঝতেই পারো ?'

—'তাতেও কিন্তু বিশেষ কিছু জানা যায় না। আজ একটা ইম্প্রেশনের ব্যাপার ছিল। সবাই বেশ তৈরি হয়ে বসেছিলাম।'

—'জানি। তবে সোশ্যাল সার্ভিস থেকে যে টিমকে ইভ্যালুয়েট করতে পাঠায়, তারাও তো মোটামুটি অভিজ্ঞ লোক। কোথাও সন্দেহ থাকলে রিপোর্টে জানিয়ে দেয়। তখন আবার ফ্যাক্ট্স্ ফাইণ্ডিং ভেরিফিকেশন, তারপর ডিসিশন্।'

অ্যাঞ্জেলিকা ডিনার পর্যন্ত থাকল না। প্রায় বিকেল হয়ে এসেছিল। পেছনের কাঠের ডেকে খাবারদাবারগুলো নিয়ে গেলাম। বার-বি-কিউ গ্রিলের ঢাকনা খুলে ভেতরে গোল গোল কাঠকয়লা সাজিয়ে দেবার সময় সুজয় বলছিল—'চাকরির ইণ্টারভিউতেও এত কথা বলিনি। তার ওপর তোমার কী স্টেটমেণ্ট। আমাদের নাকি লাইফে ঝগড়া হয় না। শুনে সাইকোলজিস্টটা

পর্যন্ত অবাক।'

—'ওঁরা মোটেই ছোটখাটো ঝগড়ার কথা জানতে চায়নি। বাড়িতে বড় রকম অশান্তি কিছু আছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করছিল।'

ট্রেতে চিকেন সাজিয়ে সস্ ঢালতে গিয়ে খেয়াল হল শিশিটা ভেতরে ফ্রিজে রয়েছে। পলাকে নিয়ে আসতে বললাম। পলা ফিরে এসে স্যালাড কাটতে বসল। মুখ ভর্তি শশার টুকরো নিয়ে বলল—'আমাকেও ফাইটের কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

সুজয় সামান্য বিরক্ত হল —'দ্যাট ওয়াজ নট্ রাইট। নিজেরা যা বলেছি সেই তো যথেষ্ট। আবার বাচ্চাদের কাছে বাড়ির ঝগড়াঝাঁটির কথা জানতে চাইবে কেন?'

—'তোমাদের ফাইটের কথা না। শমী আর আমি বেশি ফাইট করি কিনা, বলতে বলছিল। শমী আমাকে হিট্ করে কিনা, ড্যাড্ শমীকে কতবার হিট্ করেছে···' পলা এক নিশ্বাসে ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছিল।

সুজয় গ্রিল জ্বালিয়ে দিয়ে বলল—'ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে গেল। এ বাড়িতে মারধর খাওয়ার চান্স্ আছে বুঝলে ওরা তোমার মেয়েকে পাঠাবে না।'

শমীক ডেকের সিঁড়িতে বসে ম্যাগাজিন দেখছিল। সুজয়ের কথা শুনে হাসল—'ড্যাড্ তুমি আমাকে কতবার মেরেছ ঠিক করে বলতেই পারলাম না। ভারবাল্ অ্যাবিউজের কথাতেও সময়মতো একটাও মনে পড়ল না। অথচ লাস্ট ইয়ারেও স্টুপিড বলেছ। অ্যাটলিস্ট থ্রি টাইমস্ 'ইডিয়ট' বলেছ।' পলা খুব হাসছিল।

খাওয়া দাওয়া মিটে যাবার পর ওরা ভেতরে গেল। কতক্ষণ ওক গাছের নিচে বসে বসে জেনির কথা ভাবছিলাম। বসন্তের বিকেলে বেশিক্ষণ আলো থাকে না। সন্ধের পর ঘরে ঘরে ল্যাম্প জ্বলছিল। শীত শেষ হলে দীর্ঘকাল বন্ধ থাকা জানলায় কাচ আর জালের শাটারগুলো অনেকখানি করে উঠিয়ে দিয়েছি। বসন্তের হাওয়ায় জানলার পর্দা লণ্ডভণ্ড। বাড়ির ভেতর কে কী করছিল জানি না। শমীক আর পলা কাল হোমওয়ার্ক নিয়ে বসেছিল। এখন ওপরে কি নীচে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত বোধহয়। সুজয় নিশ্চয়ই ফ্যামিলি রুমে। টিভিতে এ সময় ইণ্টারন্যাশন্যাল নিউজ থাকে। উঠে গিয়ে কী আর নতুন খবর শুনব? তার চেয়ে বাগানে বসে থাকি। আজকের দিনটার কথা ভাবি। খুব আশা করেছিলাম, আজই একটু আভাস পেয়ে যাব। অ্যাঞ্জেলিকা যাই বলুক, বাইরে গিয়ে ভেরিফিকেশন করে কী পাবে ওরা? শমীক, পলার স্কুলে গেলেও যা ওদের ডাক্তারের কাছে গেলেও তাই। একই খবর পাবে। আমাদের বাড়িতে চাইল্ড অ্যাবিউজের কোনও ঘটনাই নেই। দুরন্তপনার জন্যে শমীকে তবু ছোটবেলায় চড়-চাপড় মেরেছি। পলা তো একদিনও মার খায়নি। এমনিতেও কিছু মিথ্যে বলিনি। ওদের অসুখ-

বিসুখের কথা জিজ্ঞেস করাতে শীতকালে যে মাঝে মাঝে শমীকের কানের পাশে সামান্য একসিমার মতো হয়, সেও বলেছি। এদেশে সব সম্ভব। পরে জেনির কখনও স্কিনের প্রব্‌লেম হলে হয়তো শমীকের এক্‌সিমার খবর এনে ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস আমাদের দোষ দেবে। প্রত্যেকের সুখ-অসুখ আগে থেকে বলে দেওয়া ভাল।

কখন সুজয় বাইরে এসে বসেছিল। আমি জানি, ও এখনও নানা কথা ভাবছে। আমি যে শুধু শুধু একটা দায়িত্বে জড়িয়ে পড়ছি, ছেলে মেয়ে আট-দশ বছরের হয়ে যাবার পর নতুন করে জেনিকে এনে সমস্যা বাড়াচ্ছি—এ নিয়ে ও গোড়াতে বেশ আপত্তি করেছিল। কিন্তু শমীক আর পলা এমন হইচই লাগাল যে তিনজনের এত ইচ্ছে দেখে সুজয়কে রাজি হতে হল।

উইলো গাছের নিচে চাপ চাপ অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ জোনাকির আলো। কাঠবেড়ালিগুলো সন্ধে নামতে কাঠের ডেকের তলায় ঢুকে পড়েছে। ওখানে ওদের সারা বছরের আস্তানা। দুটো তিনটে মেঠো খরগোশও একপাশে থাকে। পাখিদের সাড়া নেই। বুনো হাঁসের ঝাঁক ডানায় ঝড় তুলে কখন গলফ্‌ কোর্সের দিক থেকে উড়ে গেছে। বাগানে একটানা ঝিঁঝির ডাক।

নিস্তব্ধতা ভেঙে সুজয় বলল—'তোমাকে প্রথম দিকে একটু ডিস্‌কারেজ করেছিলাম এই সব কথা ভেবেই। সোশ্যাল ওয়ার্কাররা যদি সব সময় এসে ইণ্টারফিয়ার করে···।'

—'বার বার কি আর আসবে? আজকেই তো সব দেখে শুনে গেল।'

—'দ্যাখো! ঝামেলা না হলেই ভাল।'

—'ঝামেলা আর কী? বেশি ভাবলেই ওরকম মনে হয়। সবাই মিলে একটা বাচ্চার দেখাশোনা করতে পারব না?'

—'বাচ্চাটাই কতদিনে আসে দ্যাখো। ফর্মালিটির যা পর্ব দেখছি। তারপর ইণ্ডিয়া যাওয়া নিয়েও প্রবলেম হবে মনে হচ্ছে।'

—'কিচ্ছু প্রব্‌লেম হবে না। শমীদের কতটুকুটুকু নিয়ে দেশে গেছি। একটু সাবধানে রাখলেই ঠিক থাকে। বেশিদিন তো থাকব না।'

—'তুমি শিওর? ওরা জেনিকে আউট অফ্‌ কাণ্ট্রি যেতে দেবে?'

—'বাঃ মুন্নার ছেলেকে নিয়ে দেশে গেল না ওরা?'

—'রুণু, তুমি কিন্তু আসল ব্যাপারটা মনে রাখছ না। মুন্নারা বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করেছে। ও তো লিগ্যালি ওদেরই ছেলে। ওদের সঙ্গে যেখানে খুশি যেতে পারে।'

আমি সত্যিই জেনিকে আনার শর্তগুলো ভুলে যাই। ওকে তো অ্যাডপ্ট করছি না। ফস্টার চাইল্ড হিসেবে বাড়িতে রাখতে চাইছি। আর সেই জন্যেই বেশি চিন্তা-ভাবনা না করে অ্যাঞ্জেলিকার কথায় রাজি হয়েছিলাম।

অ্যাঞ্জেলিকার সঙ্গে আমার ক্লেয়ারমণ্ট স্কুলে কাজ করতে করতে আলাপ হয়েছিল। ও স্প্যানিশের টিচার। আমি স্কুল লাইব্রেরিতে ভলানটারি সার্ভিস

করি। আর স্কুলের পেরেণ্টস্ টিচার্স অর্গানাইজেশনের কিছু খুচরো কাজ। অ্যাঞ্জেলিকা বেশ ব্যস্ত মানুষ। দুটো-তিনটে সোশ্যাল সার্ভিস গ্রুপের সঙ্গে কাজ করে। গরিব স্প্যানিশ, কালো আর পর্টুর্যারিক্যান্‌দের জন্যে ওদের নানারকম প্রজেক্ট আছে। আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—'তোমার সোশ্যাল কমিট্‌মেণ্ট কতখানি? প্রায়ই তো বলো যে উইক্ এণ্ডে তোমাদের কমিউনিটি নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকো।'

'আমাদের ক্লাব আছে। তার অনেক অ্যাক্‌টিভিটি থাকে। কিছু সোশ্যাল সার্ভিসও হয়। তবে ফাণ্ড রেইজ্ করে সাহায্য করার দরকার-টরকার হয় না। এমনিতে নিজেদের মধ্যে বেশ একটা সাপোর্ট সিসটেম তৈরি হয়েছে। এমার্জেন্সিতে সবাই সবাইকে সাহায্য করে।'

আসলে বারো মাস আমাদের ফাংশান আর পার্টিতে নেমন্তন্ন খাওয়ার কথা না বলে ওকে আমি ইণ্ডিয়ানদের কালচারাল একসপোজার, রিলিজিয়াস কনফারেন্স, লিটারারি ম্যাগাজিন পাব্‌লিশ করা, এমনকি হেরিটেজ ধরে রাখা—এই সব ভাল ভাল কথাগুলো বোঝাতে চাইছিলাম। যাতে আমার সামাজিক জীবন সম্পর্কে অ্যাঞ্জেলিকার বেশ ভাল ধারণা হয়।

কিন্তু অ্যাঞ্জেলিকা অন্য কথা বলল—'তোমরা ইণ্ডিয়ানরা মোর অর লেস সাকসেসফুল। অন্য ইমিগ্র্যাণ্টদের তুলনায়, এমনকি আমেরিকানদের তুলনায় তোমাদের অ্যাভারেজ ইনকাম যা, ওয়েল অফ সোসাইটি বলতে তাই-ই বোঝায়। আমেরিকার সোশ্যাল কাজের জন্যে তোমাদের আরও ইন্‌ভল্‌ভড হওয়া দরকার। এখন তো এটাই তোমাদের দেশ। তুমি নিজেও ইউ এস সিটিজেন…।'

সেদিন আর কথা বাড়াইনি। কিন্তু অ্যাঞ্জেলিকা মাঝেমাঝেই এসব প্রসঙ্গ তুলত। আমরা যে গা বাঁচিয়ে বিদেশে আছি, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অধিকাংশ ভারতীয় শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। নিজেদের সুখ সমৃদ্ধির জন্যে যা কিছু পরিশ্রম। ছেলেমেয়েদের জন্যে যা কিছু সঞ্চয়। ক্লাব-ট্লাব যা গড়েছি, সেও নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্যে। প্রথম জীবনে কেরিয়ার নিয়ে হিমশিম, মধ্য জীবনে কালচার। অবসর জীবনে কমিউনিটি সেণ্টার। এরপরে আমেরিকার সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? আমেরিকায় খাচ্ছি, পরছি, অথচ এ দেশের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে চাকরি নয়তো ব্যবসার সম্পর্ক ছাড়া তেমন কোনও যোগসূত্র অনুভব করছি না। অন্তত আমাদের জেনারেশনের মধ্যে বেশির ভাগই তাই। আর আমরা বাঙালিরা যে কী ভীষণ কমিউন্যাল্ সে তো দেখতেই পাই। এ দেশে এসেও নন্‌বেঙ্গলি শব্দটা ভুলিনি। আমাকে অ্যাঞ্জেলিকা বলে কিনা মেইন স্ট্রিমে যোগ দিতে? কমন কজের জন্যে সোশ্যাল্ ওয়ার্ক করতে? কখন কী করব?

কিন্তু কোনও ভাবনা যদি ক্রমাগত মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, এক সময় তার কিছু প্রতিক্রিয়া তো হবেই। অ্যাঞ্জেলিকার কথাগুলো ধীরে ধীরে আমার ভেতরে এক ধরনের আবেগ সৃষ্টি করছিল। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে

একেকটা সেণ্টার দেখতে যাই। অ্যাঞ্জেলিকা ছুটির দিনে প্যাটারসনের 'এভাস্ কিচেনে' গিয়ে গরিব, হোমলেস লোকেদের জন্যে বড় বড় হাণ্ডা ভর্তি ভর্তি স্যুপ তৈরি করে। নানা রেস্টুরেণ্টে ঘুরে ঘুরে বাড়তি খাবারদাবার যোগাড় করে। কোনও দিন নু-আর্কে ব্যাটার্ড উইমেন্ শেলটারে যায়। মারধর খাওয়া স্প্যানিশ, পর্টু্রিক্যান মেয়েদের কোর্টের কাগজপত্র দেখেশুনে দেয়। মামলা হলে সঙ্গে যায়। জবট্রেনিং সেণ্টারের প্রোগ্রামে ঢোকানোর ব্যবস্থা করে। স্প্যানিশ ছাড়া যারা অন্য ভাষা জানে না, তাদের সমস্যাগুলো ওর কাছেই বলে। ইউথ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের জন্যে পর্টু্রিক্যান আর কালোদের ফ্যামিলিতে কখনও কখনও কাউনসেলিং করতে যায়। সোশিওলজি, স্প্যানিশ, দুটো সাবজেক্টে মাস্টার্স ডিগ্রি আছে ওর। কত ভাবে অ্যাঞ্জেলিকা সমাজের কাজে লাগছে। দেখে দেখে কেমন যেন প্রেরণা পাই।

ঠিক এই রকম সময়েই অ্যাঞ্জেলিকা বলেছিল—'রুণু, তোমরা ফস্টার পেরেণ্টস হবে? নিজেদের ছেলে মেয়ের সঙ্গে যদি আর দু'একজন গরিব ছেলে মেয়েকে কিছুদিনের জন্যেও থাকতে দাও।' ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী বলা উচিত। এখনও কি রাজি হওয়া যায়? অচেনা, অজানা দুটো ছেলে মেয়েকে হুট করে বাড়িতে আনা যায় না। কতদিনের ব্যাপার, তাও জানি না।

অ্যাঞ্জেলিকা বুঝেছিল আমি এখনই কথা দিতে পারব না। বলেছিল—'তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো। ওদের খরচপত্রের জন্যে স্টেট থেকে সাহায্য করবে। সেদিক থেকে কোনও প্রবলেম হবে না। তোমাদের শুধু দেখাশোনার দায়িত্ব। ভাল পরিবেশ আর একটু মায়া মমতা পেলে ওরা ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়।'

একেবারে এক কথায় অনুপ্রাণিত না হলেও আমি যেন সে সময় দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানোর কোনও উপলক্ষ খুঁজছিলাম। প্রায়ই মনে হত, শুধু নিজেদের বৃত্তের মধ্যে জীবন কেটে যাচ্ছে। উদ্‌বৃত্ত নিয়ে কী অপচয়। সকাল বেলা শমীক, পলাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি আসি। ঘরে ঘরে বিছানা তুলি আর ভাবি—এ বাড়িতে হেসে খেলে আরও দুটো বাচ্চা বড় হতে পারত। ওদের অপছন্দের জামা, জুতোগুলো স্যাল্‌ভেশন আর্মিতে দেবার সময় মনে হয়—যদি নিজে হাতে কাউকে দিতে পারতাম। বেঁচে যাওয়া খাবারদাবার নিয়েও সেই আক্ষেপ। এই সব অপচয়ের দুঃখ, দয়াধর্মের ভাবনা হয়তো আমার মনের মধ্যে সমাজসেবার উপযুক্ত একটি অবস্থার সৃষ্টি করছিল। অথবা অনুরূপ একটি জমি তৈরি করছিল। অ্যাঞ্জেলিকার সেখানে যদি কোনও ভূমিকা থাকে, তবে সে বীজবপনের ভূমিকা। কয়েকদিন সময় নিয়ে, তারপর, আমি যে ফস্টার মাদার হবার জন্যে তৈরি—সে কথা অ্যাঞ্জেলিকাকে জানিয়ে দিলাম। সুজয়কে রাজি করাতে আমার খুব বেশি সময় লাগেনি।

বাড়িতে অনেক আলোচনার শেষে একটা ব্যাপারে সবাই একমত হলাম যে—একসঙ্গে দুটি বাচ্চার দায়িত্ব নেওয়া মুশকিল। পলার খুব ইচ্ছে—ওর চেয়ে

একটু ছোট একটা মেয়েকে যদি নিয়ে আসি। তার মানে, বছর ছয়েকের মতো বয়স হলে ঠিক হবে। শমীক কেন জানি না ওর বয়সি ছেলের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। ওর কথা হল—'ডিসিশনের ব্যাপারটা ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের ওপর ছেড়ে দাও। ওরা যাকে পাঠাবে, সে এসে থাকবে।' আর সুজয়ের এক কথা—'বাচ্চা মেয়েটেয়ে নিয়ে এসো। টিন এজার ছেলে, মেয়ে একদম নয়। আমি কিন্তু কোনও টেনশন নিতে পারব না, এখনই বলে দিচ্ছি রুণু।'

টিন এজারের কথা আমিও ভাবিনি। সে অনেক বেশি দায়িত্ব। আবার একেবারে কোলের বাচ্চা আনব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। অ্যাডপ্শন তো নয়, যে যত ছোট হয়, ততই ভাল। ফস্টার হোমের জন্যে ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস থেকে কাগজে যে সব ছেলেমেয়েদের ছবি দেয়, বেশির ভাগই দেখি টিন এজার, কি তার চেয়ে একটু ছোট। সকলে যে অনাথ আশ্রম থেকে এসেছে, তাও নয়। অযত্নে, অত্যাচারে স্টেপ্ফাদারের কাছে রেপড হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে—এরকম কত আছে। স্টেটের খরচে লোকের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বড় হয়। একটু বড় হয়ে গেলে সহজে কেউ অ্যাডপ্ট করতে চায় না। কবে আবার আসল বাবা, মা এসে ফেরত নেবার জন্যে ঝামেলা করবে কে জানে? দেখি, আমরা আবার ঠিক যে বয়সটা খুঁজছি, পাই কিনা। বছর চার-পাঁচের একটা ছোট্ট মেয়ে কি আর পাব না?

মনস্থির করেছি জেনে অ্যাঞ্জেলিকা গ্যাভিয়ারো খুব খুশি হয়েছিল। শুধু পরে একদিন বলেছিল—'রুণু, এটা যে সাময়িক ব্যবস্থা, ভুলে যেও না যেন। খুব বেশি ইমোশন্যাল ইন্ভল্ভ্মেণ্ট হয়ে গেলে ছাড়তে বড় কষ্ট হয়।'

—'সে সময়ের কথা এখন থেকে ভেবে লাভ নেই। চেষ্টা করব অ্যাট্যাচ্-মেণ্ট আর ডিট্যাচ্মেণ্টের মাঝামাঝি একটা ব্যালান্স যদি করা যায়। অভ্যেস করতে পারলে হয়তো নিজের ছেলেমেয়ের জন্যেও একদিন কাজে লাগবে।'

প্যাটারসনের সেণ্টযোসেফ্ হস্পিটালে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের মিসেস্ বিয়াংকা। ওখানে প্রথম জেনিকে দেখলাম। ছ'সপ্তাহ আগে জন্মেছে। তারপর থেকে হাসপাতালেই পড়ে আছে। ওর পর্টুগ্রিক্যান মার নাম মারিয়া গার্সিয়া। বাচ্চা হবার পর হাসপাতাল ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। মিসেস বিয়াংকা বললেন—'মারিয়ার আগের বাচ্চা দুটোও এখানেই হয়েছিল। তাদের পর্টুগ্রিকোতে নিজের মার কাছে রেখে এসেছে। আমরা জেনির জন্যে স্যান্ যুয়ানে ফোন্ করলাম। দিদিমা আর কাউকে নিতে রাজি নয়। এ অবস্থায় স্টেটকে ফস্টার হোমের ব্যবস্থাই করতে হবে।'

সাদা কম্বলের ঘোমটায় ঘেরা প্রসন্ন একটি মুখ। ঘুমের ঘোরে কখনও সামান্য চম্কে উঠছে। মুহূর্তের জন্যে ক্ষীণ ভুরু আর কপালে অস্বাচ্ছন্দ্যের আঁকাবাঁকা ঢেউ। মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ। চোখের পাতা খোলে কি খোলে না,

কান্নার স্বর তোলে কি তোলে না, আবার নিঃসাড় ঘুমে তলিয়ে যায়।

এই দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কীভাবে বলা যায়—আমার পছন্দ হচ্ছে না। এ জিনিস আমি খুঁজছি না। বাতিল করার জন্যে কী যুক্তি দেব আমি ?

মিসেস বিয়াংকা কিছু আশা করছেন। উত্তর দেওয়ার জন্যে একটু সময় নিয়ে বললাম—'মেয়েটা বড় সুন্দর। কিন্তু মিসেস বিয়াংকা, দেড়মাসের বাচ্চা নেওয়া মানে যে প্রায় সমস্ত সময়ই তাকে দেখতে হবে। এতখানি সময় বোধহয় দিয়ে উঠতে পারব না।' মিসেস বিয়াংকা বললেন—'জেনিকে হস্‌পিট্যালে আর বেশিদিন রাখা যাবে না। অথচ অ্যাডপ্‌শনে দেওয়ার কোনও উপায় নেই।'

—'কেন ? লোকে তো এইটুকু বাচ্চাই চায় ?'

—'এখনই কতজন নিতে চাইছে। কিন্তু ওকে অ্যাডপ্‌শনে দেওয়া যাবে না। অরফ্যান তো নয়। যে কোনওদিন ওর মা এসে মেয়েকে ফেরত চাইতে পারে। জেনির জন্যে এখন ফস্টার হোম পেলে সবচেয়ে ভাল হয়। বহুদিন পর্যন্ত মারিয়া না ফিরলে কিংবা ও নিজে থেকে দিয়ে দিতে চাইলে, তখন অ্যাডপ্‌শনে দেওয়ার কথা উঠবে।'

এরপর আর ছেলেমেয়ে খুঁজে বেড়াইনি। অ্যাঞ্জেলিকা জেনির জন্যে ভেবে দেখতে বলছিল। শেষ পর্যন্ত আমি আর সুজয় কাগজপত্রে সই করে দিলাম। পলা বেশ খুশি। শমীকও বিজ্ঞের মতো বলল—"ভাল হল। পলার এবার ম্যাচিউরিটি আসবে। কথায় কথার কান্না আর নালিশ করা বন্ধ হবে।'

সুজয় অ্যাঞ্জেলিকার কাছ থেকে মারিয়া গার্সিয়ার বর কোথায়, সে লোকটাই বা মেয়েকে নিচ্ছে না কেন—এসব জানতে চাইছিল। অ্যাঞ্জেলিকা খোঁজ খবর নিয়ে এসে বলল—'মারিয়া গার্সিয়ার বরটর নেই। মাঝে মাঝে ক্র্যাক্‌ কোকেনের জয়েণ্ট থেকে লোকজন জোটায়। নিজেরও আগে কোকেন অ্যাডিক্‌শনের ব্যাপার ছিল। এখন অনেক ভদ্র হয়েছে। মিসেস বিয়াংকা ড্রাগ রি-হ্যাব সেণ্টার থেকে খবর এনেছেন।'

বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। জন্মসূত্রে জেনি যে পরিবেশ থেকে আসছে, সেই সামাজিক স্তর আর মানুষগুলো সম্পর্কে আমার কোনও প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। শুনেছি গরিব, অশিক্ষিত হিস্‌প্যানিকদের মধ্যে যৌন উচ্ছৃংখলতার ব্যাপারটা খুব বেশি। মারিয়ার জীবনযাত্রাও তো সেইরকম। জেনি এখন থেকে যে পরিবেশেই বড় হোক, ওর বংশধারা, সংস্কার কী ভাবে কাজ করবে কে বলতে পারে ? আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়ে আছে। তাদের একভাবে বড় করে তুলছি। ড্রাগ জয়েণ্ট, ক্র্যাক কোকেন, মারিয়া গার্সিয়ার লোক ধরে ধরে মা হওয়া, বাচ্চা ফেলে রেখে চলে যাওয়া—ঘটনাগুলো আমাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। অথচ আমাকে বেশ অবাক করে দিয়ে সুজয় ভরসা দিল—'অত ভাবছ কেন ? ঐটুকু তো বাচ্চা। হয়তো বেশিদিন থাকবেও না। সোশ্যাল সার্ভিস্‌

করবে বলেই তো আনছ ? এ সব কাজে কি আর কোনও চয়েস্ থাকে ?'

এখানেই আমাদের দু'জনের মধ্যে চিন্তাধারার তফাত ছিল। সুজয় শুরু থেকে ফস্টার হোমের ব্যাপারটাকে এক ধরনের পারস্পেক্টিভে দেখেছে। সমাজসেবা, অস্থায়ী সম্পর্ক, সাময়িক দায়িত্ব—এই ভাবনাগুলো ওর মাথায় থাকত। হয়তো সেই জন্যেই জেনির বংশধারা আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ওর দুশ্চিন্তা ছিল না। যেন একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়ে সময়মতো শেষ করতে পারা নিয়ে কথা। অন্তত আমার সেরকম মনে হচ্ছিল। তখন আমি কোনও অনিত্য সম্পর্কের কথা ভেবে দেখিনি। জেনির সংস্কার নিয়ে সংশয়, বড় হয়ে সে তার মা, বাবার ধাঁচ পাবে কিনা, শমীক, পলার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে—এ ধরনের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা মনে এসেছিল। জেনি আসার পর আর ও সব নিয়ে ভাবিনি।

ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস আমাদের ফস্টার পেরেন্টস হিসেবে উপযুক্ত মনে করে যখন জেনিকে পাঠাল, তখন ওর বয়স তিন মাস পেরিয়ে গেছে। স্টেট থেকে ওর জন্যে সাহায্য নিতে চাইনি বলে শুধু হেলথ ইন-সিওরেন্স করিয়ে দিল। আর বছরের শেষে জেনির খাওয়া-পরার খরচ দেখিয়ে ইনকাম ট্যাক্স থেকে কিছু বাদ দিতে পারি—সে কথাও কাগজপত্রে লেখা ছিল। আমরা জেনির ভার নিয়েছি বলে স্টেট যেন কত কৃতজ্ঞ। মিসেস বিয়াংকা বলছিলেন—'অনেক মধ্যবিত্ত বাড়িতে ফস্টার হোম খুলেই ভালভাবে সংসার চলে যায়।'

—'তার মানে, রোজগারের ব্যাপারও থাকে ? মাসে মাসে চারশো-পাঁচশো ডলার পাবে বলে বাচ্চা রাখে নাকি ?'

—'ঠিক সেরকম কিছু নয়। ডেডিকেশন নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু অ্যাফোর্ড করতে না পারলে কী করবে ? সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। দুটো-তিনটে গ্রোইং এজের ছেলেমেয়ের খরচ তো কম নয়। একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে নেয়। নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরও তিন-চারজন ফস্টার চিলড্রেন মানুষ করে। গভর্নমেণ্টের সাহায্য পেয়ে সবসুদ্ধু চলে যায় একরকম।'

বাঙালি মহলে জেনি বেশ কৌতূহল জাগাল। এখানে অনেকের অ্যাডপটেড ছেলেমেয়ে আছে। যাদের দেখি, সবাই দেশ থেকে এনেছে। ফস্টার পেরেন্টস হলাম বোধহয় আমরাই প্রথম। তাও আবার পর্টুগিজ কন্যা। জেনি নামটা কেউ পছন্দ করছে না। কিছু করার নেই। ওর নাম বদলানোর এক্তিয়ার নেই আমাদের। জেনিফার নামে যে ডাক্তার ডেলিভারি করেছিলেন, মারিয়া গার্সিয়া নাকি ভক্তিভরে তাঁর নামই রেখে দিয়েছে। তাই আমরাও জেনি বলেই ডাকছি। সুজয় আবার ঠাট্টা করে বলে—'জেনিবালা সরকার। ওর ঠাকুমার নাম মণিমালা সরকার। জেনিকে একদিন চান করিয়ে মাথায় ঘোমটার মতো করে সাদা তোয়ালে জড়িয়ে সুজয়ের কোলে দিয়েছিলাম। জেনি ব্লন্ড। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সাদা ধবধবে ভেজা চুল দেখা যাচ্ছিল। মুখে একটি দুটি

দাঁত। সুজয়ের দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসল। আর সেদিনই সুজয় বলল —'আরে! এ তো মণিমালা সরকার।' সেই থেকে হল জেনিবালা। তারপর জেনিবালা সরকার।

জেনির দেড় বছর বয়স পর্যন্ত আমার বেশ টেনশন গেছে। স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়। বার বার এটা সেটা নিয়ে ভোগে। আজ ধুম জ্বর, কাল কানে ইনফেকশন। একবার ব্রংকিয়াল অ্যাজমার মতো হয়ে নিঃশ্বাসের কষ্টে যায় যায় অবস্থা হল। কতবার যে মাঝরাতে উঠে উঠে হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হয়েছে। মার স্বভাবচরিত্রের দোষেই বোধহয় মেয়েটা এমন রুগ্ন আর ক্ষীণজীবী। ওর অসুখবিসুখের বহর দেখে সামারে দেশে যাবার প্ল্যান বাদ দিতে হল। একটু বড় করে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

একদিন ইউথ্ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস থেকে দু'জন ভলান্টিয়ার এসে উপস্থিত। এরকম হঠাৎ হঠাৎ তাঁরা চলে আসেন সেই প্রথম থেকেই। বুঝতে পারি, ওঁদের আসার কারণই হচ্ছে—আমরা কীভাবে জেনিকে দেখাশোনা করছি, তার খবর নেওয়া। সেদিন যেন সময় বুঝে জেনি তার কপাল ফুলিয়ে বসল। সকালে টেবিলের কোণায় গুঁতো খেয়ে ভুরুর ওপর দিকটা ফুলে ঢোল। তার পরেও দুরন্তপনার শেষ নেই। কালশিটে নিয়েই সমানে দৌড়োদৌড়ি করে যাচ্ছিল। একজন ভলান্টিয়ার বেশ মনোযোগ দিয়ে নীল হয়ে যাওয়া জায়গাটা দেখছিলেন। তারপর সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন—'জেনির ওখানে কী করে লাগল?'

—'সর্বক্ষণ দৌড়চ্ছে। আজ সোফা থেকে লাফাতে গিয়ে টেবিলের কোণায় ধাক্কা লাগল। কিছুক্ষণ বরফ দিতে তবে কান্না থামল। চোখটা খুব জোর বেঁচে গেছে।'

—'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওনি?'

—'ব্লিডিং হলে নিয়ে যেতেই হত। সামান্য ফুলে ওঠার জন্যে বরফ দিলে বেশ কাজ হয়। পরে দুটো বেবি অ্যাস্পিরিন্ দিতে ব্যথাও কমেছে মনে হল।'

—'তোমার ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যাক, আর কোনও কিছু না হলেই ভাল। জেনি, জেনি, তোমার কপালে লাগল কী করে? হাউ ডিড ইউ গেট্ দ্যাট্ বাম্প?'

আমার এত রাগ হল যে চট করে কোনও উত্তর দিতে পারলাম না। ওঁরা কি ভাবছেন মিথ্যে কথা বলছি? জেনিকে কেউ মারধোর করেছি? সেই জন্যে ডাক্তারের কথা তুলছেন? আমার কথা বিশ্বাস হয়নি বলে জেনিকে জিজ্ঞেস করছেন?

জেনি খুব সহজে ওঁদের সন্দেহ দূর করল। টেবিলের ঐ কোণায় চলে গিয়ে হাত দিয়ে দিয়ে থাবড়া মারতে লাগল। আবার কপালে হাত দিয়ে কী কী সব বলতে চেষ্টা করল। হঠাৎ ওঁদের ছেড়ে দিয়ে আমাকেই টেবিল দেখিয়ে দেখিয়ে বাড়ি মারছে দেখে টেনে সরিয়ে আনলাম। কোলে ওঠার জন্যে হাঁটু

ধরে ঝুলে পড়ল।

সুজয় সহজে উত্তেজিত হয় না। সন্ধেবেলা ঘটনাটা শুনে বলল—'দেখছ তো এদেশে চাইল্ড অ্যাবিউজ্ নিয়ে কত কাণ্ড হচ্ছে। ডে কেয়ার সেণ্টারে, বেবি সিটারের কাছে বাচ্চারা অ্যাবিউজড্ হচ্ছে না? ওঁদের সন্দেহ হলে দোষ দিতে পারো না।'

—'এটা ডে কেয়ার সেণ্টার? নাকি আমি পয়সার জন্যে বেবি সিটিং করছি? আশ্চর্য! দেড় বছরেও একটা ফ্যামিলিকে বিশ্বাস করতে পারছে না?'

—'রুণু, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়। এখন এরকমই হয়েছে। নিজের বাচ্চার জন্যে পুলিসে ধরছে, নিউজে দ্যাখো না? আজ পলার কোথাও কেটে-কুটে যাক, ডাক্তার প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। আবার আলাদা করে পলাকে জিজ্ঞেস করবে। জেনির কেসটাও তাই। নিজের মেয়ে নয় বলে আমাদের আরও কেয়ারফুল থাকা দরকার।'

জেনি যে আমাদের কেউ নয়, এ কথা মাঝে মাঝে কত জনই মনে করিয়ে দেয়। সময় হলে জেনিও জেনে যাবে। আমাদেরই ওকে বলতে হবে। অবশ্য যদি সেই বয়স পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকে। কিন্তু একটু বড় হয়ে গেলে আর কেউ কি ওকে অ্যাডপ্ট করবে? তখন আমরা কী করব? মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে গেলে, অনেক কথা ভাবি। তিন মাস বয়স থেকে হাতে করে বড় করলাম। শমীদের কাছে শুনে শুনে মা বলে ডাকে। সকাল, সন্ধে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। জেনি চলে যাবে ভাবতেও পারি না।

সেদিন মাস ছয়েক বাদে অ্যাঞ্জেলিকা এল। আজকাল আগের মতো দেখা হয় না। স্কুলের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছি। এখন সময় কাটানোর জন্যে তো জেনি আছে। অ্যাঞ্জেলিকা ওর জন্যে এক টিন চকলেট এনেছিল। আমরা বসে বসে কফি খাচ্ছি। জেনি টিন নিয়ে কসরৎ করছিল—টিনটা খুলে দিলাম। নিজে দুটো-একটা চকলেট মুখে পুরে আমাকে দিতে এল। নিচ্ছি না দেখে চটচটে হাতে অ্যাঞ্জেলিকাকে ধরিয়ে দিল। অ্যাঞ্জেলিকা হাসছিল। ও চকলেট হাতে নিয়ে বসে আছে দেখে জেনি হঠাৎ মাথা হেলিয়ে দিয়ে বলে উঠল—'খাও, খাও!'

আজকাল জেনি মাঝে-মধ্যে বাংলা বলতে চেষ্টা করে। শমীক আর পলার সঙ্গে যতক্ষণ থাকে উল্টোপাল্টা ইংরিজি চালিয়ে যায়। সোয়েটারকে বলে ফেটুর। ইয়েলোকে বলে লেলো। সুজয় প্রথম থেকে বলেছিল 'জেনিবালা'র সঙ্গে সকলে ইংরেজি বলবে। নয়তো পরে মেয়েটার ভাষা-বিভ্রাট হবে। অথচ এখন নিজেই অফিস থেকে ফিরে ওর সঙ্গে বাংলা বলে যাচ্ছে। একদিন ধরা পড়ে যাবার ভান করে বলল—'দেখছিলাম বোঝে কিনা।'

আমি তো জানি ইংরিজিতে আদর করতে গেলে নিজের কানেই খুব স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলে ধরা পড়ে না। যেন কোথায় ফাঁক থেকে যায়। সুজয় ছাত্রজীবন থেকে আমেরিকায় আছে। তবু বুড়ির মতো ঘোমটা দেওয়া ছোট্ট

জেনিকে দেখে ওর নিজের ঠাকুমার চেহারা মনে পড়ল। পর্টুরিকান মেয়ের নাম দিয়ে দিল জেনিবালা সরকার। এরকমই আমাদের স্নেহের প্রকাশ। সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত। উচ্ছ্বাসের কি অনুবাদ হয়? তবু জেনির ভবিষ্যতের জন্যে ইংরিজিতে কথা বলা দরকার বুঝে ওর সঙ্গে সহজে বাংলা বলি না। কিন্তু ও ঠিক টুকটাক শিখে ফেলেছে। খাবার টেবিলে বসে বসে কথাগুলো শোনে। শমীক পলাকে যা বলি সব ওর বলা চাই। মাঝে মাঝে বলে ওঠে—'দাল্।' জল বলছে না ডাল বলছে, তাই নিয়ে ভাইবোনের কী রিসার্চ। শেষে ওরা বলল 'ঝাল বলছে।' পলা তো একটুতেই ঝাল, ঝাল বলে আর জল খায়। জেনি ঐ সব নকল করতে চেষ্টা করে। একদিন সুজয়কে বলে দিল—'তক্কারি নিবি?' ওরা হেসে অস্থির।

অ্যাঞ্জেলিকা জেনির মুখে 'খাও, খাও' শুনে আন্দাজে ঠিক বুঝতে পারল। জিজ্ঞেস করল—'আমাকে ক্যান্ডি খেতে বলছে? তোমাদের ল্যাঙ্গোয়েজ শেখাচ্ছ নাকি?'

—'ঠিক শেখাব ভেবে বাংলা বলি না। আমরা ওর সঙ্গে ইংরিজিই বলছি। আসলে, বাড়িতে শুনে শুনে খানিকটা পিক্-আপ করছে।'

—'খুব স্বাভাবিক। ছোটরা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি নতুন ভাষা শেখে। আর আমরা তো এমনিতেই বাই-লিঙ্গুয়্যাল্। জেনি শেষে তিনটে ভাষা শিখে যাবে।'

—'কিন্তু ওকে স্প্যানিশ শেখাব কী করে?'

—'শেখাতে হলে এখনই ঠিক সময়। না হয়, স্কুলে গিয়ে শিখবে। স্প্যানিশ জেনির মাতৃভাষা। শিখতে তো হবেই।'

অ্যাঞ্জেলিকা বুঝিয়ে দিয়ে গেল জেনি আমাকে মা বলে ডাকলেও ওর আর আমার ভাষা এক হবার নয়। তবে আমার সমাজসেবার নিষ্ঠা দেখে ওর ভাল লাগছে। এই ব্যস্ততার দেশে কত মূল্যবান সময় আর এনার্জি ক্ষয় করে এমন সৎ কাজ করে চলেছি, সে কথা ও বহুবার বলেছে। সত্যি বলতে কি প্রথম প্রথম নিজেও ভাবতাম, ঝোঁকের মাথায় এতটা জড়িয়ে পড়লাম। তখন ঐ মহত্ত্ব-টহত্ত্বর কথা ভেবে নিতাম। সামাল দিতে না পারলে জেনিকে আবার ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের জিম্মা করে দিতে হত। ওরা নতুন ফস্টার পেরেন্টস ঠিকই পেয়ে যেত। শুধু শুধু আমাদের স্বার্থপরতা প্রকট হয়ে উঠত। আর এখন দু'বছর কেটে যাবার পরে জেনি যে সাময়িকভাবে আছে, সেই সত্যি কথাটাই ভুলে থাকতে চেষ্টা করি।

ইদানীং দেশে যেতে না পেরে মনটা বেশ ব্যস্ত হয়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম—জেনিকে অনায়াসে দেশে নিয়ে যাওয়া যায়। ফস্টার হোম থেকে যেমন ছেলেমেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যায়, সেইভাবে নিয়ে যাব। শমীক, পলার গরমের সময় লম্বা ছুটি। সবসুদ্ধু জুনের শেষাশেষি যাব ঠিক করলাম। জেনির অনেকদিন টয়লেট ট্রেনিং হয়ে গেছে। আর ডায়াপারের বোঝা বইতে

হবে না। শরীরও অনেক ভাল হয়েছে। দেশের গরমে যা একটু কষ্ট পাবে। সে আর কী করা যাবে? শমীকরা তো দু-তিনবার গরম কালে গেছে। ফস্টার পেরেন্টস্ হবার কথা বাবা, মাকে প্রথমেই জানিয়েছিলাম। শ্বশুর, শাশুড়িও জানেন। ওঁদের জেনিবালা সরকারকে দেখার ইচ্ছে হয়েছে। আমি অবশ্য ইচ্ছে করেই মারিয়া গার্সিয়ার কথা-টথা কিছু লিখিনি। দুদিনের জন্যে জেনিকে চোখে দেখবেন। অত ইতিহাস জানানোর দরকার কী?

মোটামুটি ফ্লাইটের তারিখ ঠিক হল। সময় মতো রিজার্ভেশন করে রাখা দরকার। জেনিকে ইণ্ডিয়া বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি বলে ইউথ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি সার্ভিসকে জানিয়ে দিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যে স্টেট ডিপার্টমেণ্ট অফ্ ইউথ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের অফিস থেকে চিঠি এল। বিশেষ দরকারে নু-আর্কের অফিসে দেখা করতে বলছে। ভাবলাম, জেনির পাসপোর্টের জন্যে বোধহয় ফস্টার পেরেণ্ট হয়ে অ্যাপ্লাই করা যায় না। কিংবা ওকে ইণ্ডিয়া নিয়ে যাওয়ার আগে কোনও ফর্মটর্ম ফিলাপ করতে হবে। সুজয় অফিস থেকে লাঞ্চের সময় বেরিয়ে আমাকে আর জেনিকে তুলে নিয়ে যাবে, এরকমই ঠিক হল।

নু-আর্কের ইউ এস ইমিগ্রেশন অ্যাণ্ড ন্যাচারলাইজেশনের বিশাল বাড়ির কাছাকাছি পার্কিং লটে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকতেই এলিভেটরের সামনে মিসেস বিয়াংকার সঙ্গে দেখা। জেনিকে নিচু হয়ে আদর করলেন। একসঙ্গে এলিভেটরে উঠলাম। ছ'তলায় দেখা করতে ডেকেছে। মিসেস বিয়াংকাও ঐ ফ্লোরে নেমে পড়লেন।

সরকারি বাড়িগুলোর বিশাল বিশাল উইং। এক প্রান্ত থেকে ঘরের নম্বর খুঁজে খুঁজে প্রায় আর এক প্রান্তে চলে গেলাম। জেনি গুট্ গুট্ করে হাঁটছিল। মিসেস বিয়াংকাকে জিজ্ঞেস করলাম—'জেনির ইণ্ডিয়া যাবার ব্যাপারে কোনও প্রবলেম হবে না তো? আমাদের দেশে যাওয়া প্রায় ঠিক।'

মিসেস বিয়াংকা বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন। জেনির জন্যে আমরা পিছিয়ে পড়ছিলাম। অনেকখানি এগিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে বললেন—'অফিসে এসো। ওখানে কথা হবে।'

আমরা একটু বাদে গিয়ে পৌঁছোলাম। ঘরে বিশেষ ভিড় নেই। বড় বড় আলমারি আর ফাইলভর্তি তাক ঘরটার দেওয়াল জুড়ে রেখেছে। একদিকের চেয়ারে পর পর বসে গেলাম। টেবিলের ওপারে দু'জন অফিসার। একপাশে মিসেস বিয়াংকা। আরও দূরে টেবিল ভর্তি কাগজপত্র বিছিয়ে দু'জন মহিলা কী সব লেখালেখি করছেন। অফিসাররা জেনিকে লক্ষ্য করছিলেন। জেনি আমাদের চেয়ার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ মিসেস বিয়াংকা বললেন—'আমি একটু জেনিকে কুকি কিনে দিতে নিয়ে যাই? নীচে ক্যাফেটেরিয়াতে অন্য কিছু ও খেতে পারে।'

বুঝতে পারছিলাম না উনি হঠাৎ জেনিকে নিচে নিয়ে যেতে চাইছেন

কেন ? ও তো এখানে কিছু অসুবিধে করছে না। এত বড় বিল্ডিং-এ কোথায় কতক্ষণের জন্যে চলে যাবে, শেষে কাজ মিটে গেলেও আমরা উঠতে পারব না। জেনির মুখ দেখে মনে হচ্ছে নতুন লোকজন দেখে ঘাবড়েছে। জোর করে মেয়েটাকে কুকি খেতে পাঠানোর দরকার নেই। বললাম—'থ্যাংক ইউ মিসেস বিয়াংকা ! জেনি আসার আগেই লাঞ্চ খেয়ে এসেছে। এখন আর কিছু খাবে না বোধহয়।'

—'আইসক্রিম খেতে পারে ? মিসেস্ সরকার, ওকে কিছুক্ষণের জন্যে যেতে দিলে ভাল হয়।'

অফিসাররা যেন সেরকমই চাইছিলেন। সুজয় সোজাসুজি জানতে চাইল —'জেনি থাকলে কথা বলার অসুবিধে আছে ?'

—'আমাদের দিক থেকে নেই।'

সুজয় যেন কিছু বুঝে নিল। জেনিকে বলল—'আমরা এখানেই আছি। তুমি আইসক্রিম কিনে আনো। মিসেস বিয়াংকাকে নিয়ে যাও।' সুজয় ওর হাতে তিনটে ডলার ধরিয়ে দিতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেল।

সামনের টেবিলে রাখা জেনির ফাইল নাড়াচাড়া করতে করতে বয়স্ক অফিসারটি চশমা খুলে নিলেন। কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলাম না। একটু নার্ভাস লাগছিল। জেনির ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে কোনওরকম অবহেলা অযত্নের খবর পেয়েছেন কি ? যখন তখন কেসওয়ার্কাররা বাড়িতে এসে ওকে দেখে যায়। কী জানি, কোথায় কী দোষ ত্রুটি পেল ?

—'জেনিকে তোমরা বেশ যত্ন করে বড় করছ। কেসওয়ার্কারদের রিপোর্ট খুব ভাল।'

ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল। জেনির জন্যে যদি শেষে চাইল্ড অ্যাবিউজ আর নেগ্‌লিজেন্সের অপবাদ নিতে হত, তারচেয়ে লজ্জার কিছু আছে ? বিনা দোষে কী ঝামেলায় পড়তাম। সত্যি মিথ্যে প্রমাণ করাটরা তো পরের কথা। হিউমিলিয়েশনের চূড়ান্ত হত।

যাক। জেনি যে আদর যত্নের মধ্যে মানুষ হচ্ছে, সে তো নিজেরাই বললেন। সুজয় ভদ্রতা করে ধন্যবাদ জানিয়ে একবার ঘড়ি দেখল। জেনি এসে পড়ার আগে কথাবার্তা হয়ে যাওয়া ভাল। মহিলা অফিসার রোস্যান জ্যানেট এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। বয়স্ক অফিসারটি রোস্যান্‌কে শুরু করতে বললেন। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন—'তোমরা কি উকিলের চিঠি পেয়েছ ? জেনির ব্যাপারে ?'

—'উকিলের চিঠি ! না, সেরকম কিছু তো পাইনি।'

—'খুব সম্ভব পাবে। মাঝে একটা ঘটনা হয়েছে। প্রায় তিন বছর অপেক্ষা করে, জেনির ব্যাপারে আমরা মারিয়া গার্সিয়াকে স্যান্‌যুয়ানের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলাম। মা হিসেবে ওর অধিকার আর বেশিদিন যে বজায় রাখা যাবে না, জেনিকে অ্যাডপ্‌শনে দেবার আগে খবরটা তাকে জানানো দরকার ছিল। স্টেট্ ডিপার্টমেণ্ট থেকে আইন অনুযায়ী এগুলো করতে হয়।'

সুজয় বলল—'কিন্তু জেনিকে অ্যাডপ্‌শনে দেবার প্রশ্ন আসছে কেন? তোমাদের রিপোর্ট বলছে—আমরা ভালভাবেই ওকে মানুষ করছি··· ।'

—'ফস্টার হোম হচ্ছে এক ধরনের টেম্‌পোর‍্যারি অ্যারেঞ্জমেণ্ট। জেনির জীবনের জন্যে কোনও পার্মানেণ্ট সলিউশন্‌ নয়। তোমরা সাময়িক ওর দায়িত্ব নিয়েছ। চিরকাল যে রাখতে পারবে, এমন নিশ্চয়তা কিছু নেই। কলেজে পড়ানোর খরচও অনেক। ওর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আমরা নণ্ট করে দিতে পারি না। অ্যাডপ্‌শনে যে নেবে, সে নিজের মেয়ে থাকলে যা যা করত, জেনিকেও সেই সুযোগ দেবে। আশা করছি, পরিস্থিতি বুঝতে পারছ?'

আমি শুধু ভাবছিলাম, আমাদের অজান্তে কত কী ঘটে গেছে। এরা এরই মধ্যে জেনিকে সরিয়ে নেবার চেণ্টা করছে। খুঁজে খুঁজে মারিয়া গার্সিয়াকে চিঠি দিয়েছে। অন্য জায়গায় ওকে অ্যাডপ্‌শনে দেবার বন্দোবস্ত করছে। অথচ আমাদের কোনও ভূমিকাই নেই। আমরা জেনির ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নণ্ট করে দিচ্ছি? যে কোনও সময় ওকে পথে বের করে দিতে পারি? ওর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি? কীভাবে মানুষের সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়ে যায়। আমরা ফস্টার পেরেণ্টস্‌ সত্যি কথাই। কিন্তু জেনিকে তো স্টেটের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে বড় করিনি। যা করেছি, নিজের মনে করেই করেছি। আর যদি ত্যাগ স্বীকার করেছি বলেও ভাবি, সে কি শুধু সমাজ সেবার জন্যে? এত দিনে ওর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি? ক্ষোভে দুঃখে কী যে বলব ভেবে পেলাম না।

তবু কী ঘটছে জানা দরকার। ওঁদের জিজ্ঞেস করলাম—'জেনিকে কেউ অ্যাডপট করতে চাইছে?'

—'সেরকম সিচুয়েশন হলে, প্রথমে তোমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ্‌ করার কথা। গভর্নমেণ্ট জোর করে কাউকেই সে দায়িত্ব নিতে বলতে পারে না। ফস্টার পেরেণ্টের ইচ্ছে না থাকলে তখন আর কোথাও পার্মানেণ্ট ব্যবস্থা করতে হয়। আর, অ্যাডপশনের মধ্যে দিয়ে সেটা সম্ভব। তারপরে স্টেট আর লায়াব্‌ল্‌ থাকে না।'

সুজয় এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার অফিসারের কথা শেষ হতে বলল —'ধরো, আমরা দু'জনে জেনিকে অ্যাডপট্‌ করতে চাই। কতদিনের মধ্যে ডিসিশন নিয়ে স্টেটকে জানাতে হবে?'

মনস্থির না করে সুজয় একথা বলবে না। কিন্তু তাহলে কেন আবার অতিরিক্ত সময় চাইছে? আমার ইচ্ছের কথা ও খুব ভালই জানে। শুধু শুধু কথা দিতে দেরি করছে কেন? অধৈর্য হয়ে সুজয়কে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, টেবিলে ফোন বাজল।

মিসেস বিয়াংকার ফোন। জানতে চাইছেন এবার জেনিকে ওপরে নিয়ে আসবেন কিনা। অফিসার বলে দিলেন দশ মিনিট পরে আসতে। আমিও চাইছিলাম না মেয়েটা এ মুহূর্তে এ ঘরে আসুক। বয়সের তুলনায় ওর ভালই

বোধবুদ্ধি হয়েছে। একেবারে যে কিছু বুঝবে না এমন নয়। সুজয়ের কথায় রোস্যান জ্যানেট বললেন—'আমরা সেইরকম আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন খুব সমস্যা হয়েছে। মারিয়া গার্সিয়া জেনিকে নিয়ে যেতে এসেছে। জন্মের পর থেকে জেনিকে দেখাশোনা করেনি বলে ইউথ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি সার্ভিস থেকে এতদিন অপেক্ষা করে শেষে ওর নামে চিঠি দেওয়া হল। জানানো হল—এরপর আর মেয়ের ওপর ওর কোনও অধিকার থাকবে না। এরকম খবর দেওয়াও দরকার। আসল মায়ের খোঁজপত্র পাওয়ার জন্যে স্টেটকে অপেক্ষা করতেই হবে।'

রোস্যানের কথার মাঝখানে ফোন বাজল। অন্য টেবিলে কেউ ফোনটা ধরল। আমরা দু'জনেই বুঝতে পারছিলাম ক্রমশ ঘটনা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুজয় জানতে চাইল--'মারিয়া থাকে কোথায় ?'

'এখন এখানেই থাকে। নিউজার্সির সুপিরিয়র কোর্টে কেস করেছে। মারিয়া আর ওর এখনকার স্বামী হোসে আর্নেজ দু'জনে মিলে মারিয়ার বায়োলজিক্যাল রাইট দেখিয়ে জেনিকে ফেরত চাইছে।'

সেদিন ঘটনার গুরুত্ব না বুঝে প্রথম দিকে ভেবেছিলাম জেনিকে আমরা জিতে নেব। অন্য কেউ অ্যাডপট করার আগে তাকে আমরা পেয়ে যাব। আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছেই সব। যে মুহূর্তে জানলাম কে আমাদের আসল প্রতিপক্ষ, সেই মুহূর্ত থেকে ওকে হারাবার ভাবনায় বড় বিষণ্ণতার মধ্যে দিয়ে দিন কাটতে লাগল। অ্যাঞ্জেলিকা আসে। মিসেস বিয়াংকার কাছে যাই। আমাদের পুরনো উকিল মারভিন স্টাইনফেল্ডের অফিসে গিয়ে কী ভাবে কী করা যায় আলোচনা করি। অথচ ফস্টার পেরেণ্টদের কনটেস্ট করার কোনও উপায় নেই। মারিয়া গার্সিয়ার কেসের ব্যাপারে স্টেট ডিপার্টমেণ্ট অফ ইউথ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি সার্ভিস যা করার করছে। ওরা সাইকোলজিস্ট পাঠাল। জেনির সঙ্গে তিনি আমাদের সামনেই স্প্যানিশে কথা বললেন। সে একবর্ণ বুঝল না। ওঁর সঙ্গে জেনি পর্ট্যরিকো বেড়াতে যাবে কিনা ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করায় সবেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। প্যাটারসনে অন্য একটা বাড়িতে আরও দু'জন বাচ্চার কাছে গিয়ে থাকবে কিনা জিজ্ঞেস করাতে উল্টে জেনি তাঁকে খবর দিল—'আমরা প্লেনে চড়ে ইণ্ডিয়া যাচ্ছি।'

আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। পরে ইউথ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি সার্ভিস থেকে খবর পেলাম, জেনি সম্পর্কে তাঁর ইভ্যালুয়েশন হল—এই পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে পাঠিয়ে দিলে ওর মনের ওপর খুব চাপ পড়বে। অ্যাঞ্জেলিকা ভরসা দিয়ে গেল—এই পয়েণ্টগুলো কেসের জন্যে খুব কাজে লাগবে।

বাঙালি বন্ধুবান্ধবরা যে কী ভাবে সাহায্য করবে বুঝতে পারছে না। কেউ বলে সেনেটারকে লেখো। কেউ বলে লোক্যাল কংগ্রেস ম্যানের কাছে গেলে হয়তো কাজ হবে। কিন্তু আমেরিকান লিগ্যাল সিসটেমকে চ্যালেঞ্জ করার

ক্ষমতা নেই আমাদের। নিউজার্সির সুপ্রিম কোর্ট রুল করে দিয়েছে—নিজের মার অধিকার সবচেয়ে আগে। সে তার কর্তব্য করুক, না করুক, ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাক, দু'চার বছরের মধ্যে ফিরে এলে তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে।

জেনির জন্যে সুপিরিয়র কোর্টের জাজ কার স্বার্থ দেখবেন? মেয়েটার স্বার্থ বিবেচনা করলে তো ওকে ঐ অশিক্ষিত, দায়িত্বজ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর মার কাছে থাকতে দেওয়াই উচিত নয়। মারভিন স্টাইনফেলড্ আইনের এক-আধটা ফাঁকফোকর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছেন। অবস্থা বুঝে পরে সুপিরিয়র কোর্টে অ্যাপিল করব।

বাড়িতে সব সময় যেন চাপা টেনশন। জেনিকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করি। শমীক ভরসা দিয়ে বলে—'ওদের ড্রাগের প্রবলেম থাকলে জেনিকে পাবে কিনা সন্দেহ। পেলেও বেশিদিন রাখতে পারবে না দেখো।'

—'অদ্ভুত জেদ। যারা নিজেরা এত গরিব, আরও তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে আবার কিসের জন্যে জেনিকে চাইছে?'

—'পভার্টি কিন্তু কোনও ক্রাইম নয় মা। ওখানে আমাদের কিছু এক্সট্রা পয়েন্টস্ নেই। শুধু ক্র্যাক কোকেন অ্যাডিকশন থেকেই ওদের ডিস্অ্যাড-ভ্যানটেজ থাকতে পারে।'

স্কুল থেকে ফেরার পর পলা মিউজিক টেলিভিশন দেখতে বসলে জেনিকে সেখান থেকে নড়ানো যায় না। ঘুরে ঘুরে কত রকম নাচের চেষ্টা। আজকাল পলার আর বেশিক্ষণ টিভি দেখতে ভাল লাগে না। এক একদিন মন খারাপ করে নিজের ঘরের দরজা লক করে বসে থাকে। বুঝতে পারি কান্নাকাটি করে। জেনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডেকে ডেকে হয়রান। কচি গলার চিৎকার শুনতে পাই—'হেই পলা। ওপন্ দ্য ডোর। লেট্ মি গেট্ ইন…'

রাতে শুয়ে শুয়ে সুজয় আক্ষেপ করে—'কেন যে মেয়েটাকে প্রথম থেকে অ্যাডপট করলাম না। সব রকম রেসপন্সিবিলিটি নিলাম। অথচ সময় থাকতে লিগ্যাল রাইট এসট্যাব্লিশ করতে পারলাম না।'

—'জেনিকে তখনও অ্যাডপট করা যেত না। সিচুয়েশন তো একই ছিল।'

দিনের বেলা বাড়িতে শুধু জেনি আর আমি। কাজের মধ্যে থাকি। তবু সারাক্ষণ কী যে এক অস্থিরতা। ভাবি, কেন আমি এ সবের মধ্যে গিয়েছিলাম? শমীক ছিল, পলা ছিল। অভাববোধ, নিঃসঙ্গতার দুঃখ বলে তো কিছু ছিল না। তবে কি সেই সমস্যাবিহীন জীবনকে খুব গতানুগতিক বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম? নাকি অ্যাঞ্জেলিকাকে দেখে দেখে নিজেকে নেহাত গণ্ডিবদ্ধ মানুষ বলে মনে হত? স্বার্থপর, সাধারণ, সংসারী মানুষ? সীমাবদ্ধতার সেই দৈন্য কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় কিছু কি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম? মহত্ত্বের উদাহরণ রাখার জন্য, ভারতীয় মেয়ে হিসেবে আমেরিকার সোশ্যাল কজে নাম লেখানোর জন্যে, প্রথম দিকে জেনিকে কি উপলক্ষ হিসেবে নিয়েছিলাম? তবে

এখন কেন সে ভাবে চিন্তা করতে পারছি না ? কেন বারবার অ্যাটাচমেণ্ট আর ডিটাচমেণ্টের মধ্যে ভারসাম্য হারাচ্ছি ? আসলে আমরা কোনও শর্ত মনে রাখিনি।

শেষ পর্যন্ত মারিয়া গার্সিয়ার আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল। স্টেট ডিপার্টমেণ্ট অফ ইউথ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি সার্ভিসের কেসওয়ার্কাররা জাজকে অনেক অ্যাপিল করেও রাজি করাতে পারল না। জেনি যে সম্পূর্ণ অচেনা জগতে গিয়ে পড়বে, তার এতদিনের আশ্রয় হারিয়ে দারিদ্র্যের সংসারে গিয়ে কষ্ট পাবে, এই সত্যি কথাগুলো তিনি কানেই নিলেন না। কোর্ট থেকে আলাদা সাইকোলজিস্ট পাঠিয়েছিল। তিনি জেনিকে ইভ্যালুয়েট করার পর তাঁর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই জাজ রায় দিয়ে দিলেন। নিজের মা আর ভাই-বোনদের নাকি কোনও বিকল্প নেই। সাড়ে তিন বছর বয়সেও জেনি অনায়াসে তাদের সঙ্গে থাকতে পারবে।

স্টেট থেকে আবার চিঠি পেয়ে নু-আর্কের অফিসে গেলাম। আমরা অ্যাপিল করতে চাই শুনে ওঁরা কিন্তু তেমন ভরসা দিলেন না। সুপ্রিম কোর্টের রুল নিয়ে আর কিছু করা যাবে না বলেই ওঁদের ধারণা। মারিয়া গার্সিয়া এখন বর ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করছে। এ অবস্থায় জেনিকে ফিরিয়ে দিলেই ভাল। নয়তো নতুন করে কেসের ঝামেলায় পড়ে যাব।

জেনির দায়মুক্ত হবার নিয়মগুলো জেনে নিতে হল। দু'জন কেসওয়ার্কার এক এক করে বোঝাতে লাগলেন—'জাজ ফ্লোরিও ট্র্যানজিশন পিরিয়ড ঠিক করে দিয়েছেন। ছ'মাসের মধ্যে জেনিকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দেবার সময় দিয়েছেন।'

সুজয় বলল—'ঠিক বুঝলাম না। মাঝের ছ'মাস কী করতে হবে ?'

—'প্রথম প্রথম সপ্তাহে তিনদিন করে জেনিকে নিয়ে মারিয়া গার্সিয়ার বাড়িতে যাবে। সঙ্গে একজন কেসওয়ার্কার থাকবে। ক্রমশ দিন আর সময় বাড়াতে হবে। তারপর তোমরা নিজেরা যাওয়া কমিয়ে দিও। এক সময় আর জেনির সঙ্গে যেও না। কেসওয়ার্কার নিয়ে যাবে। ওখানে বসে থাকবে। আবার ওকে তোমাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আশা করা যায়, মাসতিনেক পর থেকে জেনি একা ওদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবে।'

জিজ্ঞেস করলাম—'এগুলো দিনের বেলার ব্যাপার তো ?'

—'প্রথম দিকে তা-ই। তারপর, জেনি ওখানে রাতেও থাকতে শুরু করবে। ছ'মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে অভ্যেস করিয়ে দিলে ওর পক্ষে অ্যাডজাস্ট করতে খুব বেশি কষ্ট হবে না। আর এজন্যে তোমাদের হেলপ দরকার সবচেয়ে বেশি।'

বুঝতে পারলাম আর কিছু করার নেই। কোর্ট কেস করতে যাওয়া মানে হয়তো শুধু অশান্তি আর টানাপোড়েন সার হবে। আমরা ঠিক সেরকম অ্যাগ্রেসিভ্ ধরনের মানুষ নই। ল'ইয়ার স্টাইন্‌ফেলড যাই বলুন, জেনিকে

ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রথম যেদিন অ্যাঞ্জেলিকা গ্যাভিয়ারোর সঙ্গে জেনিকে নিয়ে প্যাটারসনে গেলাম, মারিয়া গার্সিয়ার মুখোমুখি হতে হবে ভেবে বেশ অসোয়াস্তি হচ্ছিল। কে জানে কেমন ব্যবহার করবে? চোখে তো দেখিনি কখনও। জীবনযাত্রার যেটুকু আভাস পেয়েছিলাম, তাতে তার ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ সম্পর্কেও সন্দেহ ছিল।

মেইন স্ট্রিটের কাছে পুরনো অ্যাপার্টমেণ্ট বিল্ডিং-এর একতলায় মারিয়া আর হোসের সংসার। ডোরবেল বাজাতে ম্যাজিক আই দিয়ে কে যেন উঁকি দিয়ে দেখল। খানিকক্ষণ বাদে দরজা খুলে দিল। পর্টুগ্যারিক্যান লোকটির কোলে ছোট্ট বাচ্চা। অ্যাঞ্জেলিকা স্প্যানিশে পরিচয় দিতে যাচ্ছিল। লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে ভেতরে যেতে বলল।

লিভিং রুমে গিয়ে বসলাম। ময়লা সোফার পাশে আর একটা সোফা বেড পাতা। দুটো মেয়ে বসে বসে টিভি দেখছিল। একজনের বয়স বছর আট-দশের বেশি হবে না, কি আরও কম। আর একজন বছর পাঁচেকের। লক্ষ্য করলাম জেনির মুখের সঙ্গে ছোটটার বেশ মিল। ওরা জেনিকে বারবার দেখছিল। কোলের ছেলেটা নিশ্চয়ই হোসে আর্নেজের। হোসে, অ্যাঞ্জেলিকার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলছিল। কাছেই মিট মার্কেটে মাংস কাটার কাজ করে। মারিয়া দুধ কিনতে গিয়ে দেরি করছে দেখে যেন একটু অপ্রস্তুত ভাব। হোসে নিজে থেকেই জেনির সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছিল।

জেনির কাছে সাড়াশব্দ না পেয়ে হোসে বলল—'স্প্যানিশ শিখতে বেশী দেরি হয় না। বাড়িতে থাকতে থাকতে শিখে যাবে।'

আসলে আমরা একটু আগে আগেই এসে পড়েছি। অচেনা এলাকা ভেবে হাতে বেশ সময় নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু পাড়াটায় এসে বেশি ঘুরতে হয়নি। চট্ করে বাড়ির কাছাকাছি পার্কিং পেয়ে যাওয়াতে ওদের বাড়িতে আগেই পৌঁছে গেছি।

অ্যাঞ্জেলিকা মেয়ে দুটোকে প্রায় একসঙ্গেই জিজ্ঞেস করল—'তোমাদের নাম কী?' বড়জন বলল—'পাওলা।' শুনে জেনি বলে উঠল—'পলা।' মেয়েটা সাড়া দেবার মতো করে হাসল। ছোটটাকে আবার নাম জিজ্ঞেস করাতে দিদির গা ঘেঁসে ঘেঁসে গাম চিবোতে লাগল। একটু পরে গোলাপি চিউইংগাম সুদ্ধু জিভ বের করে বলল—'কারলা।'

ডোরবেল বাজল। বড়জনের পেছন পেছন ছোটটাও উঠে গেল। বাইরে গলার আওয়াজ। কেন যে মনে হচ্ছে, এবার বোধহয় নাটকের মতো কিছু একটা ঘটে যাবে। কতদিন ধরে এই মুহূর্তের কথা ভেবেছি। নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরি করতে চেয়েছি। আজ আমার সংযত থাকার কথা। সহজভাবে মারিয়ার সঙ্গে কথা বলার কথা। তবু সে এসেছে জেনেও জেনিকে আমি কোল থেকে নামালাম না। শক্ত করে দু'হাতে ধরে রাখলাম।

মারিয়া ঘরে এল। তার সঙ্গে জেনির সাদৃশ্য ধরা যায়। বয়স বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। তামাটে গায়ের রং। এক মাথা ঘন চুল কাঁধ ছাড়িয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখ। এক দুর্বল প্রতিপক্ষের মতো দূরে দাঁড়িয়ে। যেন আমাদের করুণার অপেক্ষায়।

কে কাকে করুণা করে? মারিয়া কি জানে না জেনিকে সে সারা জীবনের জন্যে অধিকার করে বসে আছে? শুধু তিন বছরের দায়িত্ব নিয়ে আমি কি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি? মারিয়া জেনির কাছাকাছি এল। ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রথম কথা বলল—'জেনি!' তারপর হাঁটু ভেঙে বসে জেনিকে কোলে তুলে নিল। বিড়বিড় করে স্প্যানিশে কিছু বলছিল। দেখলাম জেনির গালে গাল ঠেকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে।

জেনি বেশ থতমত খেয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ। অ্যাঞ্জেলিকা আমার হাত ধরে সামান্য চাপ দিল। আমার ভেতরে কী ঘটে যাচ্ছে, ও ছাড়া কেই বা বুঝবে? জেনি জোর করে মারিয়ার কোল থেকে নেমে পড়ল। আমার কাছে এসে বাড়ি যাব বলে অস্থির করতে লাগল। যখন ওঠার তোড়জোড় করছিলাম, মারিয়া বারবার জিজ্ঞেস করছিল আমরা 'এস্‌প্যানিয়ন' জানি কিনা। জেনি জানে কিনা? কেউ ওদের ভাষা জানি না বলাতে খুব হতাশ মনে হল। নিশ্চয়ই ভেবে পাচ্ছিল না কী ভাষায় মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে? চলে আসার সময় অ্যাঞ্জেলিকাকে স্প্যানিশে বলল—'অনেকদিন পুয়েতোরি-কোতে ছিলাম। সামান্য ইংরিজি জানি। এবার এখানে থাকব। শিখে নেব।'

ওর বর হোসে আর্নেজ আবার অভয় দিল—'জেনি শীগগিরই স্প্যানিশ বলবে।'

সেদিন অফিস থেকে ফিরে সুজয় এমন কোনও কথা তুলল না যাতে আবার সেই মন খারাপ করা কথাবার্তা শুরু হয়। বেশ আগ্রহ দেখিয়েই যেন জানতে চাইল—'ওদের বাড়িঘর কেমন দেখলে? হোসে লোকটা কী করে? অ্যাটিচিউট ভাল তো?' আমি বুঝতে পারছিলাম সুজয় মারিয়ার প্রসঙ্গে আসতে চাইছিল না।

শমীক, পলা বারবার জিজ্ঞেস করছিল জেনি ওখানে কীভাবে রি-অ্যাক্ট করেছে? ওর ভাইবোনেরা কত বড়?

একসঙ্গে কত প্রশ্নের জবাব দেব? তবু যা দেখে এসেছি, মোটামুটি বললাম। রাতে জেনি শুয়ে পড়ার পরে আমরা ফ্যামিলি রুমে বসেছিলাম। সুজয় শেষ পর্যন্ত মারিয়ার কথা জিজ্ঞেস না করে পারল না। ঐ নাটকীয় মুহূর্তের বিবরণ দেওয়া যে আমার পক্ষেও কষ্টকর হবে। এই ভেবেই বিকেল থেকে বেশি প্রশ্ন করেনি। কিন্তু আমিও তো না বলে পারছিলাম না। নিজের লোক ছাড়া কেই বা বুঝবে? শুধু জেনিকে ফিরিয়ে দিতে হবে বলে নয়, মারিয়া আর হোসের বাড়ির অবস্থা দেখে এসে আরও যেন মন খারাপ হয়ে আছে।

সুজয় বলল—'মেয়েটার যে কী ভবিষ্যৎ! ভাবলে দুঃখ হয়।' পলা যেন খুব মিনতি করে বলল—'তুমি জেনির গড্‌মাদার হতে পারো না? তাহলে ও এখানে এসে থাকতেও পারবে। আমরা ভিজিট্‌ করব। গিফট নিয়ে যাব।'

শমীক বলল—'আমাদের উচিত ওদের টাইম টু টাইম হেলপ করা। অবশ্য যদি কন্‌ট্যাক্ট রাখতে দেয়। শুধু জেনিকে গিফট না দিয়ে আরও কিছু করা যায়।'

আসলে জেনি কষ্টে থাকবে ভেবেই ওদের এত চিন্তা। বললাম—'জেনি ওখানে সেট্‌ল করে যাক। তারপর তোমাদের প্যাটারসনে নিয়ে যাব।'

জেনিকে কেসওয়ার্কাররা সত্যি কথা বলার দায়িত্ব নিয়েছে। মারিয়া যে তার আসল মা আর ছোট্টবেলায় জেনিকে হারিয়ে ফেলার পর এতদিন বাদে খুঁজে পেয়েছে, এরকমই বোঝানোর চেষ্টা চলছিল। আর আমরা হচ্ছি খুব দয়ালু পরিবার। জেনিকে বড় দয়া করেছি। কিন্তু অতটুকু মেয়ে কি এসব বোঝে? মারিয়ার বাড়িতে যাবার দিন এলে কেসওয়ার্কারদের দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। গাড়িতে ওঠার সময় কান্নাকাটি। আমি সঙ্গে যাই না। জেনি ফিরে এসে বিকেলে নালিশ করে—'আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু গো দেয়ার। আই ডোণ্ট লাইক্‌ টু কল্‌ হার মামি।' কোনওদিন বলে—'আই নো, ইউ আর মাই মামি। রাইট মা?'

তখন আমি সেই নিষ্ঠুর ধর্মাবতারের কথা ভাবি। ইচ্ছে হয় জেনিকে তাঁর সামনে নিয়ে যাই। শুধু তাঁর অবিবেচনার জন্যে একটি শিশুর এমন যন্ত্রণা আর টানাপোড়েন। তবু হুকুম নড়চড় হবার উপায় নেই। মারিয়াদের ভাষা বোঝে না বলে ওর আরও কষ্ট। সারাদিন অচেনা পরিবেশে কাটিয়ে যখন বাড়ি আসে, তখন আমাদের কাউকে ছাড়তে চায় না। রাতে ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে। কিন্তু কী করব? এ ভাবেই ওকে অভ্যেস করাতে হবে। তারপর, একদিন আর ফিরবে না। ধীরে ধীরে সেও সহ্য হয়ে যাবে। বিচারক কত অভিজ্ঞ মানুষ। বলেছেন—নিজের মা, ভাইবোনের কখনও বিকল্প হয় না। তবে এতদিন পর্যন্ত আমরা জেনির কে ছিলাম?

দেখতে দেখতে জেনির যাবার সময় হয়ে এল। মাঝে বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। তিন বছর আগে বসন্তকালে জেনি এসেছিল। আর এখন গ্রীষ্ম শেষ হতে চলেছে। আজ বাগানে বার-বি-কিউ করলাম। অ্যাঞ্জেলিকা আর মিসেস বিয়াংকা এসেছেন। জেনি বেশ কয়েকদিন পরে প্যাটারসন থেকে আজ ওঁদের সঙ্গেই ফিরল।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সবাই বাগানে বসেছিলাম। মিসেস বিয়াংকা বলছিলেন—'কী তাড়াতাড়ি সময় চলে যায়। মনে হচ্ছে এই সেদিন তুমি সেণ্ট যোসেফে গিয়ে জেনিকে দেখলে। খুব ছোট বাচ্চা চাও না বললে। পরে আবার ওকেই নিয়ে এলে।'

—'আমরা সবাই জেনিকে খুব এনজয় করেছি মিসেস বিয়াংকা। ও

আমাদের বাড়িটাকে ভরিয়ে রেখেছিল। এজন্যে অ্যাঞ্জেলিকার কাছে, আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।'

আজকাল আমি আর সুজয় নিজেদের মধ্যেও এই সব কথাই বলি। জেনি কেন শুধুমাত্র বিষণ্ণতার স্মৃতি হয়ে থাকবে? আমরা তো তাকে শৈশব থেকে বড় করে তোলার আনন্দ পেয়েছি। একটি শিশুর উপস্থিতির মাধুর্য কি মুহূর্তে মুহূর্তে উপভোগ করিনি? জেনির মধ্যে দিয়ে আমরা পরস্পরের ধৈর্য দেখেছি। একজন অন্যজনের চোখে মহৎ হয়ে উঠতে চেয়েছি। কখনও অসুস্থ জেনির জন্যে কত উদ্বেগে রাত কেটেছে। হাসপাতালে গেছি। বাড়িতে দুটো ছোট ছেলেমেয়ে ঘুম ভেঙে বসে থেকেছে। জেনি আমাদের এক অভিজ্ঞতা। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার অবিমিশ্র অনুভূতি।

আমার কথার পর শুধু সুজয় একবার বলল—'খুব চেষ্টা করেও জেনির ভবিষ্যতের ভাবনা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি না। অথচ কী ভাবে যে হেলপ্ করা যায়?'

আইসক্রিমের গাড়ির ঘণ্টা শুনে জেনি ছুটতে ছুটতে আসছিল। সুজয়ের পকেটে ওয়ালেট নেই। আবার বাড়ির ভেতর জেনিকেই পাঠাতে হবে। কিন্তু জেনি এদিকে এল না। বাগান দিয়ে দৌড়ে রাস্তার দিকে চলে গেল। জানলা দিয়ে পলা চিৎকার করে বলল—'হেই জেন, স্যামি ডাজ্ন্ট ওয়াণ্ট এনি···।' বুঝলাম ওরাই ওকে ডলার দিয়েছে। জেনির গলা শুনতে পেলাম—'টু ভেনেলা ডাবল্ স্কুপ্। চকলেট স্প্রীংক্লস্।'

সুজয়ের কথার সূত্র ধরে অ্যাঞ্জেলিকা বলল—'মারিয়া আর হোসে মিলে চালিয়ে নিতে পারবে। মিট-কাটারদের রোজগার খারাপ নয়। ইউনিয়ন আছে। অনেক বেনিফিট আছে। মারিয়াও পরে কাজকর্ম শুরু করতে পারবে।'

জেনি আবার এদিকে আসছে। দু'হাতে দুটো বড় বড় ভ্যানিলা আইসক্রিমের কোন্। জিজ্ঞেস করলাম—'কে তোমাকে আইসক্রিম কিনতে ডলার দিল?'

—'মারিয়া দ্য আদার মামি।'

জেনি তবে মারিয়াকে মা বলছে। সেই গরিব মা ওর হাতে কটা ডলার দিয়েছে। সেইজন্যে সুজয়ের কাছে আইসক্রিমের দাম চাইতে আসেনি।

নাকে মুখে ভ্যানিলা, চকলেট মেখে জেনি আমার আরও কাছে চলে এল। নিজের আইসক্রিমটা টর্চের মতো তুলে ধরে বলল—'ইউ ওয়াণ্ট এ লিক্?'

—'না, তুমি শেষ কর। পলারটা তো গলে যাচ্ছে জেনি?'

—'হ্যাভ এ লিক্ ড্যাড। ইটস গুড···।' জোর করে সুজয়কে একটু খাইয়ে দিয়ে জেনি দোতলার জানলার দিকে ঘুরে চিৎকার করল—'হেই পাওলা। কাম অন্। ক্যানট্ হোলড ইট এনি মোর···।'

বলতে বলতে দুই কনুই দিয়ে গড়িয়ে পড়া চকলেট মেশানো দুধ চেটে

নিল। এই প্রথম আমি জেনির রূপান্তর লক্ষ্য করলাম। ধীরে ধীরে অন্য এক পরিবার ওকে আকর্ষণ করছে। মারিয়াকে আজ আমার কাছে 'অন্য মা' বলে চেনাল। এই মুহূর্তে মারিয়ার কিনে দেওয়া আইসক্রিম হাতে ধরে পলাকে নয়, যেন পাওলাকেই ডাকছে। ওর জীবনে আমাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে এসেছে। সুজয়ের জেনিবালা সরকার আবার কখন জেনি গার্সিয়া হয়ে গেছে।

॥ ১৩ ॥ আবরণ

কখনও দেখিনি পাহাড়ের চূড়ায় মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। কখনও উপত্যকায় বৃষ্টি নামতে দেখিনি। শুধু ক্যালেণ্ডারের পাতায় পাতায় পাহাড়ি নদী, পাইন বন, উদ্দাম জলপ্রপাত দেখেছি। মাঝে মাঝে স্বপ্নে, কল্পনায়। আমরা শহরের মানুষ। বহুদিন প্রকৃতির কাছাকাছি আসার সময় হয়নি।

এতদিনে সেই সময় হল। এখন ঘুম ভাঙলে পাহাড় দেখতে পাই। যে জানলার ধারে দাঁড়াই, সেখান থেকেই অ্যাপালাসিয়ান রেঞ্জের উদ্ধত সৌন্দর্য চোখে পড়ে। কোনওদিন উপত্যকা ঘিরে রিমঝিম বৃষ্টি। দেবদারু বনের মাঝখানে টিলার ওপর দিদির ইংলিশ টিউডর স্টাইলের বাড়ি। রাস্তার নাম ভ্যালি কোর্ট। হয়তো এই পাহাড়ি শহরে অনেকদিন থেকে যাব। ইচ্ছে করলে সমুদ্রও বেছে নিতে পারি। কিংবা এমন কোনও স্টেট্, যেখানে এক ছুটির দিনে পাহাড়ে যাওয়া যায়, অন্য ছুটির দিনে সমুদ্রে।

আজ পাহাড়ের মাথায় ঘন ধোঁয়ার মতো মেঘ জমে আছে। দূরের গাছ-পালা, স্যাড্‌ল রিভারের জল কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কাল শেষ রাত থেকে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। সকালে যদি বা আকাশ একটু পরিষ্কার হল, আবার বেলার দিকে মুষলধারে নেমেছে। বাগানের ঘাস ভিজে কাদা। জলে ধুয়ে যাচ্ছে লালকাঠের টেবিল, বেঞ্চ, সারি সারি প্লাস্টিকের চেয়ার। ডেকের ওপর বসানো মস্ত ছাতা হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। ফ্যামিলি রুমের স্লাইডিং ডোরের পাশে বসে যেন ঘষা কাচের মতো আবরণের মধ্যে দিয়ে বাইরের ছবি দেখছি।

দুপুরে বৃষ্টি নামার পর ভেবেছিলাম, আজ আর কোথাও যাওয়া হবে না। ঘরে বসে বসে সারা সন্ধ্যে কেটে যাবে। অথচ সুকান্তদার বাগানের পার্টি কবে থেকে ঠিক হয়ে আছে। মে, জুনের এতগুলো ছুটির দিন বাদ দিয়ে জুলাইতে পৌঁছেও বৃষ্টি এড়ান গেল না।

—"এই ওয়েদারে সুকান্তর বাড়িটা বাদ দাও। ওরা নিজেরাই নিশ্চয়ই ক্যানসেল্ করে দেবে।'—তুষারদা চেক বই নিয়ে কী কী সব পেমেণ্ট করতে বসে এই নিয়ে দু'বার কথাটা বলল। দিদি বলল—"ব্যাক্-ইয়ার্ডে গেট টু গেদার করার এই ঝামেলা! গতবার রনির গ্র্যাজুয়েসন পার্টিতে সাদা জুতোটা হিলসুদ্ধ কাদায় ডুবে গেল। যতোই স্যাণ্ড্ ছড়িয়ে দিক, মাঠ ভেজা থাকবেই!"

একটু পরে ফোন এল। বাসবীদির ফোন। ওরা পার্টি ক্যান্‌সেল্‌ করতে চাইছে না। বৃষ্টির জন্যে শেষ অবধি বাড়ির ভেতরে হচ্ছে। গ্যারাজে বার-বি-কিউ করবে। দিদি কথার মাঝখানে চট করে রিসিভারটা তুষারদাকে ধরিয়ে দিল। দিদির বোধহয় বেশ যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু ঝড়বাদল মাথায় নিয়ে তুষারদা রাজি হচ্ছে না বুঝে ওকেই কথা বলতে দিল। তুষারদা আবার সহজে ফোন ধরতে চায় না। আজ নেহাৎ ওদিকে বাসবীদি বা সুকান্তদা আছে বলে ভদ্রতার খাতিরে বলল—"হ্যালো, আজ মাংস পোড়ানটা বাদ দিন না—।"

রিসিভার ভেদ করে বাসবীদির গলা শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তুষার-দাকে রাজি করিয়ে ছাড়ল। আমি আর দিদি ঘণ্টা খানেকের ভেতর তৈরি হয়ে নিলাম। তুষারদা গড়িমসি করতে করতে বাথরুমে ঢুকল।

আমরা রওনা হয়ে গেলাম। বৃষ্টি একটু ধরেছিল। গাড়িতে আমি তো পেছনেই বসি। দিদি সিট বেলট্‌ বেঁধে পেছন ফিরতে না পারলেও সমানে গল্প চালিয়ে যায়। সাইট-সিইং-এ গেলে বরং চুপচাপ থাকে। কিন্তু লোকের বাড়ি, বিশেষ করে বাঙালি আড্ডায় যাবার পথে দু'চারটে উপদেশ দেবেই। আজ ও মাথা ঘুরিয়ে বলে দিল—"তোর কী প্ল্যানট্যান, কাউকে কিছু বলতে হবে না। বিয়ের নেগোসিয়েশনের ব্যাপারেও কিছু বলার দরকার নেই। ইণ্ডিয়া যাচ্ছিস শুনলেই তো একেক জনের একেক অর্ডার।"

আচ্ছা, আমি কেন লোকেদের ডেকে ডেকে বলতে যাব যে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কাগজে অ্যাড্‌ দিলেই বিয়ে ঠিক হয়ে যায় নাকি? আসলে, দিদি যে কী বলতে চায়, সে আমি জানি। এখানে কোথাও আমার বেশি কথা বলার উপায় নেই। আমার নিজের যে কী প্ল্যান্‌, সে তো নিজেই ভাল জানি না। লোকেরাও এত পার্সোনাল খবর নেয় না। দেশ থেকে যারা নতুন আসে, তাদের সঙ্গে কটা কথাই বা বলে? আমার খারাপ লাগে না। বসে বসে নানা গল্প শুনি। এই সমাজের মানুষজন তাদের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কিছু স্বতন্ত্র। তবু কখনও মনে হয় না ভিড়ের ভেতরে একা বসে আছি। সদ্য পরিচিত, অপরিচিত, সকলকেই লক্ষ্য করি। মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে। ভাবি, এভাবেই ক্রমশ এদের সমাজে মিশে যাব।

সুকান্তদারা বোধহয় আশেপাশের শহর মিলিয়ে সত্তর-আশিজন ইণ্ডিয়ানকে ডেকেছে। যা বিশাল বাড়ি, লিভিং রুম, ফ্যামিলি রুম, বেসমেণ্ট নিয়ে বসার জায়গার অভাব নেই। তবু বাড়ির ভেতরে পার্টি করতে হবে জানলে আগে থেকে সে ভাবে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখত নিশ্চয়ই। এখন তাড়াতাড়িতে দু'জনে অনবরত একে ওকে ডাকাডাকি করছে। বাসবীদি স্ন্যাক্সের প্লেট সাজাতে গিয়ে পেপার ন্যাপকিন পাচ্ছে না। সুকান্তদা গ্যারাজ থেকে প্যাকেট সুদ্ধ এনে দিল। বাগানে পার্টি হবে ভেবে আগে ওখানেই সব জড় করে রেখেছিল। ঘরে ঘরে গিয়ে সকলকে ড্রিংকস্‌ দিতে হচ্ছে। একদল বেসমেন্টের রিক্রিয়েশন রুমে গিয়ে বসেছে। বাসবীদি লজ্জা পাচ্ছিল—"বেস-

মেন্টের যা অবস্থা ! ক'দিন ভ্যাকিউম্ করাও হয়নি।"

পরে নিচে গিয়ে দেখলাম অবশ্য পুল টেবিলে ধুলো, কফি টেবিলে গাদা খানেক ম্যাগাজিন। সোফাতে কুশন উল্টে পড়ে আছে। এত অগোছাল অবস্থায় এখানে কেউ বাড়িতে লোক ডাকে না। অসময়ে বৃষ্টি এসে সব মাটি করেছে।

সুকান্তদারা গ্যারাজে পোর্টেব্‌ল্ গ্রিল জ্বালিয়েছে। বাইরে কাঠকয়লার ধোঁয়া গন্ধ। খানিকক্ষণ লিভিং রুমে থাকার পর ভাবলাম গ্যারাজে কী হচ্ছে দেখে আসি। দিদি এখন বেসমেন্টে নেমে গেছে। ও কোনও দলের সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্প করতে পারে না।

গ্যারাজে দাউ দাউ করে দুটো গ্রিল জ্বলছে। একটাতে দীপক দত্ত হ্যাম-বার্গার প্যাটি পোড়াচ্ছেন। ভদ্রলোক ক্যানসারের ডাক্তার। অন্য গ্রিলটার সামনে ডাঃ গুহ। হাতে মোটা মোটা কাপড়ের গ্লাভস্ পরে চিমটে দিয়ে চিকেনের টুকরোগুলো উলটেপালটে দিচ্ছেন। আগুনে চর্বি পোড়ার চিড়চিড় শব্দ। সুকান্তদার ছেলের সঙ্গে আরও দুটো ছেলে মেয়ে বাগান থেকে ভেজা চেয়ারগুলো টেনে এনে গ্যারাজের দেওয়াল ঘেঁসে রাখছিল। ইন্দ্রাণীদি ভেতর থেকে মোটা তোয়ালে নিয়ে এসেছেন। চেয়ারের জল মুছে আমাকে বসতে দিলেন।

গ্যারাজে দেখছি ডাক্তারদের দল ভারি। তুষারদা এক কোণে বিয়র ক্যান্ নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আমাকে দেখে হাতের ঘড়ি দেখল। তার মানে বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছে নেই। আমি ঠাট্টা করে ইন্দ্রাণীদিকে বললাম—"এই আপনাদের সামার ? সমানেই তো দেখছি বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।"

—"রিয়েলি ! আজ ওয়েদারটা এত বাজে হয়ে গেল ! সামারে এত বৃষ্টি ভাল লাগে না।"

ট্রে ভর্তি ড্রিংক্স্ নিয়ে সুকান্তদা গ্যারাজে এল। দিদির হাতে একগোছা ন্যাপকিন আর কাবাবের মস্ত প্লেট। মাঝে বাসবীদি এসে সিঙ্গাড়া রেখে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট ফ্রোজেন সিঙ্গাড়া। গুজরাটির দোকানে ফ্রিজারে দেখেছি। বাসবীদি কত বাক্স এনেছিল কে জানে ? সমানেই ভেজে ভেজে দিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঝাল ! তুষারদা স্ন্যাক্স্ নিচ্ছে না। কোলেস্টেরল্-এর জন্যে, নাকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসেছে বলে মুড অফ ? তুষারদার মধ্যে উচ্ছ্বাসের এত অভাব। স্বভাবে এক ধরনের অন্যমনস্কতাও আছে। লোকেরা হয়তো ভাবে অহংকারি। অথচ এমনিতে মানুষটা খারাপ নয়। কাছাকাছি থাকলে বোঝা যায়।

সুকান্তদা বলল—"কী শম্পা, ড্রিংক দিইনি তোমায় ?"

—"দিয়েছিলেন। লিভিং রুমে রেখে এসেছি।" দিদি বলে গেল—"তুই সফ্ট ড্রিংক্ নে না একটা !"

ওর খবরদারি সমানে চলেছে। বুঝিয়ে দিয়ে গেল ওর কী ইচ্ছে। আমি লিভিং রুমে জিন্ অ্যান্ড টনিকের গেলাস প্রায় শেষ করে এসেছি। এখন কোক নিলাম। সুকান্তদা দীপক দত্তকে বিয়র ক্যান্ দিয়েই বলল—"এই

মোহনদা, বড্ড পুড়িয়ে ফেলছেন। মাংস না কাঠকয়লা, চেনা যাচ্ছে না।"

আগুনের আঁচে ডাঃ গুহর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। গ্যারাজের দরজা খোলা। তবু ভেতরে বেশ গুমোট ভাব। বৃষ্টি আসার পর ভ্যাপসা গরম পড়লে যেমন হয়। কিন্তু বাগানে এত কাদা উঠছে যে গিয়ে বসা যাবে না।

ডাঃ মোহন গুহ চিমটে দিয়ে পোড়া মাংস তুলে তুলে পাশের ফয়েল ট্রেতে রাখছিলেন। সুকান্তদাকে বললেন—"পোড়াব না তো কী করব? তোমাদের বউরা রেয়ার, মিডিয়াম, কোনওটাই পছন্দ করে না। বার-বি-কিউ চিকেনে এক ছিটে রক্ত দেখলে প্লেট সুদ্ধু গারবেজে ফেলে দেবে।"

ইন্দ্রাণীদি হেসে ফেললেন—"তোমার বউও খাবে না। আজকাল তো পিকনিকে গিয়ে ওয়েলডান্ না হলে মাংস খেতেই ইচ্ছে করে না। কে জানে কতক্ষণ ধরে বাইরে ফেলে রাখে?"

বার-বি-কিউ পার্টি শেষ হতে খুব বেশি রাত হল না। তবু পুরোপুরি আড্ডা ভাঙার লক্ষণ নেই। দিদি, বাসবীদির ডাকাডাকিতে তুষারদা খানিকক্ষণ লিভিং রুমে গিয়ে বসেছিল। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেখে বাড়ি ফেরার জন্যে উঠে পড়ল। মাউণ্ট লরেলে ফিরতে একঘণ্টার বেশি লাগবে। আজ আকাশের যা অবস্থা, বৃষ্টির জন্যেই ট্রাফিক স্লো হয়ে যাবে। তুষারদা গাড়ি আনতে গেল। আমরা একটু বাদে বেরিয়ে এলাম।

পেভ্‌মেণ্টে দাঁড়িয়ে সমানে ভিজে যাচ্ছি। ছাতাগুলো গাড়ি থেকে নামানো হয়নি। তখন তো তুষারদা ড্রাইভ ওয়ের সামনে নামিয়ে দিয়েছিল। তারপর কতদূরে পার্ক করেছে কে জানে? এই মাঝরাতে বৃষ্টি মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকা। শীত শীত করছে। দিদি হাতের ব্যাগটা আলগা করে মাথার ওপর ধরে রেখে বলল—"ছাতাগুলো সেই গাড়িতেই পড়ে থাকল।"

রাস্তার দু'ধারে পার্ক করা গাড়ির পাশ ঘেঁসে ডান দিক থেকে প্রায় নিঃশব্দে সাদা 'ভোলভো' এসে থামল। দিদি ওপাশে ঘুরে যেতে গিয়ে আরও ভিজে গেল। সামনে, পেছনে একটা দরজারও লক খোলা নেই। তুষারদা খেয়ালই করছে না। রিয়র-ভিউ মিররে পেছনে গাড়ি আসছে কিনা লক্ষ্য করতে ব্যস্ত। জানলার কাচে টোকা দিতে লক্ খুলে দিল।

গাড়িতে উঠে দিদি রেগে গেল—"বৃষ্টির মধ্যে উল্টোদিক দিয়ে চলে এলে। শুধু শুধু ভিজলাম। লকটা খুলে দেবে তো?"

জুতো খুলে ফেলেছি। পেছনের সিটে পা ছড়িয়ে দিয়ে বললাম—"হিটিংটা একটু চালিয়ে দিন তুষারদা। শীত করছে। আপনিও তো খুব ভিজলেন।"

দিদি বলে যাচ্ছিল—"আমি খেয়াল করিনি বলে তোরাও কেউ ছাতা নিয়ে নামলি না। আমার অলরেডি গলা খুশখুশ করছে···।" ব্যাগ থেকে টিস্যু পেপার বের করে তুষারদাকে বলল—"মাথাটা একটু মুছে নাও। কতদূরে পার্কিং করেছিলে?"

তুষারদা গাড়ি চালাতে শুরু করেছিল। এক হাতে টিসু পেপার নিয়ে শুধু কপালের দিকটা মুছে নিল। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। সেই অন্য-মনস্ক ভাব। বৃষ্টির বেগ বাড়ছিল। ওয়াইপারের একঘেয়ে ঘট্ ঘট্ শব্দ। উইন্ডস্ক্রিনে জলের ধারা অবিশ্রাম ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দূরের ট্র্যাফিক লাইট অস্পষ্ট বিন্দুর মতো। সেই নিষ্প্রভ সবুজ আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে তুষারদা গাড়িতে স্পিড তুলল।

—"বৃষ্টির মধ্যে এত জোরে চালিও না।"

ট্র্যাফিক সিগ্ন্যাল হলুদ হতে হতে আমরা মোড় পার হয়ে গেলাম। হাইওয়ে ধরতে আর দেরি নেই। দিদি জিজ্ঞেস করল—"কী হয়েছে বলো? বেশি ড্রিংক করেছ? আর ইউ ফিলিং অল্রাইট?"

হঠাৎ তুষারদা একেবারে অন্য কথায় চলে গেল—"তুমি নাকি প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিলে?"

দিদি অবাক হয়ে গেল—"কে বলল? আমি তো কাউকে বলিনি।"

—"তাহলে মোহনদারা কেন জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্সির অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হয়েছ কিনা? ভার্জিনিয়া বিচের পিক্নিকে যাচ্ছ কিনা? হঠাৎ তোমার কথা উঠল কেন?"

দিদির গলার স্বর নিচু—"বাঃ আমি কী করে জানব? হয়তো উনি আন্দাজেই ভেবে নিয়েছেন।"

—"রুপা, ডোণ্ট্ ডিফেন্ড ইওর সেলফ্। কন্স্ট্যাণ্ট আজেবাজে কথা কেন বলো? সুকান্তদের বলেছ আমি নাকি ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ হয়ে গেছি। ওরা কন্গ্র্যাচুলেট্ করছে না তোমার কথাটা ভেরিফাই করছে, তাই-ই বুঝতে পারছিলাম না। এত অকোয়ার্ড লাগছিল···।"

আমার খুব খারাপ লাগছে। আবার তুষারদার কাছে দিদির দুটো মিথ্যে কথা ধরা পড়ল। এত বকুনি খেয়েও ওর স্বভাব বদলায় না। কার কাছে কী যে বলে আসে। প্রেসিডেন্সিতে ইংলিশ অনার্সের কথা ও নিজেই রটিয়েছে। ছিঃ এরকম মিথ্যে কথা কেন যে বলে? ওর কমপ্লেক্স কি কোনওদিন যাবে না···।"

ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের কথাটা এড়িয়ে গিয়ে দিদি তখন কলেজ নিয়ে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে—"মোহনদার সঙ্গে কখনও কলেজ নিয়ে কথাই হয়নি। আর উঠে থাকলেও, প্রেসিডেন্সিতে পড়েছি মোটেই বলিনি।"

"নিশ্চয়ই বলেছিলে। ইন্দ্রাণীও শুনেছে। প্রত্যেকবার এরকম সিচুয়েশন হয়। পরে তুমি ডিনাই করো। আ আম্ গ্র্যাজুয়ালি গেটিং ফেড্ আপ।"

বাকি পথ দিদি গুম হয়ে থাকল। তুষারদার স্টিরিওতে ক্যাসেট বাজল না। কারুর গান শোনার মেজাজ নেই। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি। হঠাৎ হঠাৎ আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জুড়ে বিদ্যুতের নীল্চে আলো। প্লেন উড়ে যাওয়ার শব্দের মতো মেঘের ডাক। মাউণ্ট লরেলের পথে ঘুরে ঘুরে

নীচের শহরের দিকে চলেছি। এরপর আবার টিলায় ওঠা। গাড়ির রেডিও একঘেয়ে খবর শুনিয়ে যাচ্ছে—আজ রাতভোর বৃষ্টি। কাল মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে দু'এক পশলা নামবে। সোমবার বড় উজ্জ্বল দিন। ···আপাতত জেফারসন টানেলের মুখে রাস্তা সারানো বন্ধ রয়েছে। রাত বারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত টানেলের দুটো লেন্ খোলা থাকবে। কাল থেকে কনস্ট্রাকশনের জন্যে আবার লেন্ বন্ধ···এখন ট্র্যাফিক বাইশ মিনিট স্লো যাচ্ছে। রুট্ নাইনটি সেভেনে ট্র্যাকটর ট্রেলার অ্যাক্সিডেণ্ট···

মাউণ্ট লরেলের মেঘ, বৃষ্টি, রোদ নিয়ে দিদির জীবন। সোমবার ওরা যখন অফিসে গেল, তখন ঘরে বাইরে মেঘ সরে গেছে। চাইব দুজনেই বেশ তাড়াতাড়ি আপস করে নেয়। গতকাল সকাল পর্যন্ত দিদি কিন্তু রীতিমতো গাম্ভীর্য মেইনটেইন করছিল। তুষারদার তো এমনিতেও তাপ উত্তাপ বোঝা যায় না। বিকেলের দিকে একটু একটু কথাবার্তা শুরু হল। তারপর মুভিতে গেলাম। হল থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটে পৌঁছে তুষারদা জিজ্ঞেস করল—"বাড়িতে রান্নাবান্না আছে ? নাকি ইটালিয়ান খেতে যাবে ? শম্পা ডু ইউ হ্যাভ্ এনি স্পেশ্যাল্ চয়েস্ ?"

সবসময় ভাবি আমার জন্যে ওদের খুব খরচ হচ্ছে। প্রায় হাজার দেড়েক ডলার খরচ করে টিকিট পাঠিয়ে নিয়ে এসেছে। আসার পর বেড়ানও কম হল না। থাকব আশা করে, জিনিসপত্র তো সমানে কিনে দিচ্ছে। এরপর ওখানে খেতে নিয়ে চলুন, সেখানে খেতে নিয়ে চলুন—এরকম বলা যায় ? আমি পারি না। অবশ্য দিদি অনেক বছর চাকরি করছে। আমার সব খরচ দিদি দিচ্ছে, একথা ভাবলেও কিন্তু সংকোচ যায় না। এত পেয়েও লোভির মতো এটা সেটা চাইব কেন ? তুষারদা নিজে থেকে ইটালিয়ান রেস্টুরেণ্টে নিয়ে গেল বলে রাজি হলাম। রেস্টুরেণ্টে বসে বসেই লক্ষ্য করছিলাম ওরা নিজেদের মধ্যে সহজ হয়ে আসছে।

সারাদিন নানা চিন্তায় কেটে যায়। এখনও চাকরিবাকরি শুরু করিনি। রিটার্ন টিকিটে মাঝে একবার দেশে যেতে পারি। কিন্তু আবার এখানে ফেরার প্লেন ভাড়া পাব কোথায় ? তার চেয়ে কাজকর্ম খোঁজা ভাল। সমস্যা হচ্ছে যাতায়াতের। দিদি গ্রিন কার্ড করিয়ে দিলেও চাকরি খোঁজার জন্যে আমাকেই বেরতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্সের অভাবে তাও পারছি না। এরকম গ্রাম গ্রাম শহরে পাব্লিক ট্র্যানস্পোর্টেশনের যা অবস্থা দেখছি, গাড়ি ছাড়া চাকরি খোঁজা অসম্ভব। ড্রাইভিং কোর্স নিতে অন্তত চার-পাঁচশো ডলার লাগবে। সাত, আটটা লেস্নের কমে কি আর রোড-টেস্ট্ পাস করতে পারব ? দিদি শেখাতে পারত। কয়েকটা উইক এণ্ডে বেরিয়েও ছিলাম। কিন্তু এমন সাংঘাতিক চালিয়েছি যে, ও রেগে মেগে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তুষারদা অফিসের পরে দু'দিন কাউণ্টি কলেজে পড়ায়। তার সময় নেই। বৃষ্টি বাদলা কমলে ড্রাইভিং কোর্সে ভর্তি করে দেবে বলেছে। এদেশে জীবনটা যে কিভাবে শুরু

করব তাই ভাবছি। দিদি নানা পরামর্শ দেয়। কখনও বলে—"চাকরিটাকরি করে আগে সেট্‌ল কর। তারপর বিয়ের চিন্তা করা যাবে।" আবার মাঝে মাঝে তুষারদাকে বলে—"পি এইচ ডি স্টুডেণ্টরা গ্রিন কার্ডের জন্যে ইণ্টারেস্টেড হতে পারে। অ্যাড্‌ দিলেই খোঁজ পেয়ে যাবে।" দিদির ধারণা গ্রিন কার্ড আছে বলে, দেশে এখানে ভাল ভাল প্রফেশন্যাল ছেলে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে। অথচ এখন আমার বিয়ের কোনওরকম ইচ্ছেই নেই।

এ সপ্তাহে মার চিঠি পেলাম। আমার জন্যে এখনও মার কত চিন্তা। চিঠির অর্ধেক জুড়ে কেবল উপদেশ। বাবুজির ব্লাড প্রেসার আবার বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে অ্যাজ্‌মার কষ্ট···চিঠি পড়তে পড়তে মন খারাপ হয়ে যায়। মা তবু নিজের শরীরের কথা কখনও লেখে না। আমি তো জানি মা কিভাবে সংসারটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তপু, দীপুর জন্যে বড্ড মন কেমন করে। কবে যে ওদের সঙ্গে দেখা হবে?

মার চিঠি আসার কয়েকদিন বাদে দিদি আমার সামনেই তুষারদাকে বলল—"মনে হচ্ছে তপুদের আর দেশে থাকার কোনও মানে হয় না। গ্রিন কার্ডের ব্যবস্থা যখন হয়ে গেল, আর দেরি করে কী লাভ?"

দিদি একসঙ্গে আমাদের তিনজনকে স্পন্‌সর করেছিল। আমি আগে চলে এসেছি। ওরা কলেজের পড়া শেষ করে আসবে—এরকমই ঠিক ছিল। কিন্তু ইদানীং তপু একদম পড়াশোনা করছে না। যখন থেকে আমেরিকায় আসবে মাথায় ঢুকেছে, তখন থেকেই রেজাল্ট খারাপ করছে। ও বোধহয় ভাবছে আমেরিকায় এসে অন্য কিছু শিখবে। দীপুর জন্যে চিন্তা নেই। পড়াশোনায় যথেষ্ট সিরিয়াস। তবু জয়েণ্টে হয়তো কোথাও না পেতেও পারে। দিনদিন যা কম্পিটিশন বাড়ছে। আমার কাছে এইসব শুনে ভাইদের জন্যে দিদির চিন্তা শুরু হয়েছে।

তুষারদার গলার স্বরে সামান্য বিরক্তি ধরা পড়ল—"ওরা এখনই এখানে এসে কী করবে, কিছু চিন্তা করেছ?"—"যা হোক একটা কাজ পেয়ে যাবে। তপু কিছুদিন অড্‌ জব করার পর কাউণ্টি কলেজে যেতে পারে। অ্যাসোসিয়েটেড ডিগ্রি করতে পারবে না?"

—"আর দীপু? ও তো শুনি পড়াশোনায় ভাল। দেশ থেকে অন্তত কলেজ ডিগ্রিটা করে আসতে পারত। এখানে বড় কলেজে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটের খরচ যা—" তুষারদা কথা শেষ করার আগেই দিদি বলল—"ঠিক আছে, আগে তপুর টিকিটের ব্যবস্থা করি। দীপু জয়েণ্টে পেয়ে গেলে তখন ডিসিশন নেওয়া যাবে।"

আমার এমন সঙ্গতি নেই যে ভাইদের আনার ব্যাপারে ওদের একটু সাহায্য করতে পারি। এখনও চাকরি শুরু করতে পারলাম না। সত্যি তো, তুষারদাকে আর কত চাপ দেওয়া যায়? আমাদের মতো সাধারণ ফ্যামিলিকে আমেরিকায় সেট্‌ল্‌ করানো মানে প্রত্যেকের প্লেন ভাড়া দেওয়া থেকে শুরু

করে, এদেশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া পর্যন্ত কম দায়িত্বের ব্যাপার ? হয়তো এই জন্যেই দিদি আমাকে তাড়া দিচ্ছে। আমি চাকরি পেয়ে গেলে, প্রফেশন্যাল লোককে বিয়ে করলে ওদের সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারব—এ আশা করা তো অন্যায় নয়। উনিশ বছর বয়সে ওর বিয়ে হয়েছিল। তারপর থেকে সমানেই সাহায্য করে চলেছে।

মার জন্যে দিদির বড় দুঃখ। এমন দিন গেছে, যখন মানুষের করুণা ভিক্ষার জন্যে মা দু'হাত মেলে ধরেছে। আশৈশব দিদি দেখেছে শুধু দয়াভিক্ষা। সেই অনিশ্চিত দিনে অপেক্ষার সময় ছিল না। ভরসা রাখা যায়নি অযাচিত করুণা, মানবিকতা আর সমবেদনার মতো ভাল ভাল শব্দগুলোর ওপর। মা থিয়েটারে নাচত, ছোটখাটো পার্ট করত। দিদি আর আমি তখন কতটুকু ? আমাদের বাবা যে কেন দুম করে ওই বয়সে আত্মহত্যা করেছিল, সেও এক রহস্য থেকে গেছে।

মা পুরনো কথা তুলতে চাইত না। বাবা গানের টিউশনি করত। বাজারে খানিক ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল। মার ধারণা ভীরু প্রকৃতির মানুষটাকে কেউ কোর্ট-কাছারির ভয় দেখিয়েছিল। নয়তো খুব অপমান করেছিল। হতেও পারে। আমরা বোনেরাও তো ভীষণ সেন্‌সিটিভ।

শুধু বাবুজি একদিন অন্যরকম ঘটনার আভাস দিয়েছিল। তখন হিন্দ্‌ সিনেমার কাছে থাকি। ফাংশান সেরে মা বেশ রাত করে ফিরল। বাবুজি রেগে পায়চারি করছিল। পাশের ঘরে শুয়ে বাবুজির গলা শুনছিলাম—"তোমাকে সন্দেহ করে করেই লোকটা অশান্তিতে পাগল হয়ে গিয়েছিল। রঞ্জিতের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ছিল, সবই বুঝতে পারত। তুমি, রঞ্জিত কেউ সংসারটার কথা ভাবোনি।" মা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারছিলাম মা জামাকাপড় বদলানোর জন্যে শোবার ঘরে ঢুকেছে। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল। বাবুজি জিজ্ঞেস করল—"খেয়ে এসেছ ?" মার গলার স্বরে ক্লান্তি—"হুঁ। ওই জন্যেই দেরি করিয়ে দিল।"—"বেশি রাত হলে বড্ড ভাবনা হয়। কোথা থেকে কিভাবে ফিরছো জানতেও পারি না। দিনকাল যা হয়েছে।"

—"আজ আবার রঞ্জিতের কথা তুললে। সংসার সংসার করে কথা শোনালে। সে সংসারের হাল যদি জানতে। ছোট ছোট মেয়ে দুটোর কী শাস্তি। ও মানুষটা তো কোনদিন স্বাভাবিক ছিল না। সেদিন রঞ্জিত না থাকলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম ?"

সে রাতে বোধহয় বহুক্ষণ ওরা জেগে ছিল। তন্দ্রার ঘোরে গুণগুণ কথার আওয়াজ ভেসে আসছিল। তবু, আর একবারও রঞ্জিতের নাম শুনিনি। বাবুজী মাকে আর কষ্ট দিতে চায়নি। না হলে, বলতে পারত—সেই রঞ্জিতও তোমার সঙ্গে থাকল না। বললে মা তো প্রতিবাদ করতে পারত না।

আমাদের নিয়ে মা যখন বাবুজির কাছে চলে এসেছিল, তখন দিদির

ছ'বছর বয়স। আমার মাত্র তিন। ক বছর পরে তপু আর দীপু হল। বাবুজি "জ্যোতি" সিনেমার কাছে একটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটিং কোম্পানিতে কাজ করত। পরে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে ঢুকেছিল। সংসার চালাতে কত রকম কাজই করেছে। মার ওই সামান্য রোজগার। তপু, দীপু হওয়ার পর নাচ, গান, থিয়েটার, একে একে সবই ছাড়তে হল। শেষের দিকটা বাবুজী একাই সামাল দিয়ে গেছে। অ্যাজমার কষ্ট কি আজ থেকে? অসুস্থ শরীর নিয়েও আমাদের জন্যে বিশ্রাম নেওয়ার উপায় ছিল না। দিদি, আমি দু'জনেই এণ্টালির কাছে মিশনারী স্কুলে পড়েছি। বি এ পাস করার আগে দিদির বিয়ে হয়ে গেল। আমার এম এ পাড়ার ইচ্ছে ছিল। বাবুজির স্ট্রোক না হলে সে সময় পড়াশোনায় বাধা পড়ত না। যখন "রোজ্ ফার্মেসিউটি-ক্যালে টেম্পোরারি চাকরি করছি তখনও বাবুজি বলেছে—"আর বেশি দিন পড়ে থাকব না। একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে পারলে আর চিন্তা কী? তখন তুই রুপার কাছে চলে যাস। ওরাই তোকে কলেজে ভর্তি করে দেবে।"

এই মানুষ চিরকাল আমাদের ভাল চেয়েছে। অথচ শেষ বয়সে, অসুস্থ অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে কতদূরে চলে এলাম। দিদির আশা একদিন ওরা সবাই এদেশে এসে থাকবে। কিন্তু মা, বাবুজি কি সেইদিনের অপেক্ষায় বেঁচে থাকতে পারবে? বয়সের জন্যে নয়, ওদের শরীরের জন্যেই ভয় হয়।

লাইসেন্স পাওয়ার আগেই চাকরি পেয়ে গেলাম। দিদির প্রতিবেশী মিসেস রিচার্ডসন কেমিস্ট্। ওঁদের কোম্পানি কস্মেটিক্স তৈরি করে। মিসেস রিচার্ডসনের চেষ্টায় প্যাকেজিং ডিভিশনে চাকরি হয়ে গেল। প্রথমে ট্রেনিং পিরিয়ড। সে সময় ওঁর গাড়িতেই যাওয়া আসা করব। তারপরও কারপুলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে শুনছি। কাছাকাছি কয়েকজন ওখানে কাজ করে। অফিসে গেলে খবর পেয়ে যাব। গাড়ি চালানোর লেসন্ নিচ্ছি সপ্তাহে দু'দিন করে। ইনস্ট্রাক্টর দিদির মতো অধৈর্য নয়। আমার ধারণা দিব্যি গাড়ি চালাচ্ছি। কয়েকদিন পরে রোড টেস্ট দিতে হবে।

হঠাৎ একদিন শপিং মলে ডাঃ গুহদের সঙ্গে দেখা। ওঁরা মাউণ্ট লরেলের কাছাকাছি থাকেন। দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন কারা সব এসেছে। তাদের নিয়ে সকাল থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। 'ম্যাকডোনাল্ডে'র সামনে দেখা হল। ইন্দ্রাণীদি আলাপ করানোর আগেই অচেনা ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"তুষার না? চিনতে পারছ? আমি খোকনদা, বেনারসের···।"

তুষারদাকে স্পষ্ট চমকে উঠতে দেখলাম। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মুখের ভাব সহজ হয়ে এল। যেন চেষ্টা করে হাসল—"হ্যাঁ, এবার চিনতে পারছি। লেট্ মি ইনট্রোডিউস্, আমার স্ত্রী রুপা, আর এ হচ্ছে শম্পা, রুপার বোন।"

ভদ্রলোক তাঁর নিজের বউয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন না। কোনরকম সৌজন্য প্রকাশ করলেন না। দিদিকে খুব ভালভাবে লক্ষ্য করেছিলেন ওঁর স্ত্রী। ডাঃ গুহ বললেন—"চলো না, কফি খেতে খেতে গল্প

হবে এখন। বেনারস কানেক্‌শন বেরিয়ে গেছে মানে···

—"সরি মোহনদা, আমাদের একটু তাড়া আছে। আজ আর কফির জন্যে বসতে পারছি না"—তুষারদা আমাদের কথা বলার সুযোগ দিচ্ছিল না। দিদিরও বিশেষ আগ্রহ দেখলাম না।

তবু ভদ্রতা করল—"আপনারা কতদিন আছেন? সময় পেলে একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন।"

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন—"আপনারা কোথায় থাকেন? ইন্দ্রাণীদের কাছাকাছি নাকি?"

তুষারদা উত্তর দিল—"অল্‌মোস্ট্‌ একই শহরে। এনি ওয়ে, পরে কন্‌ট্যাক্ট করতে চেষ্টা করব।"

ভদ্রলোক একটু জোর দিয়ে বললেন—"আমরা আর মাত্র দু'দিন আছি। তুমি কিন্তু ডেফিনিটলি একবার এসো। আ হ্যাভ টু টক্‌ টু ইউ।"

বাড়ি ফিরেই তুষারদা ফেটে পড়ল—"হঠাৎ ওদের ইন্‌ভাইট করার কী ছিল? কোনকালে চিনতাম, তার ঠিক নেই। এখন আমেরিকায় এলেই নেমন্তন্ন করতে হবে?"

—"দেশের চেনাশোনা ভেবে আসতে বললাম। ভদ্রলোক তো দেখা করার জন্যে ব্যস্ত মনে হল। কী দরকার থাকতে পারে বলো তো? বলছিলেন না, একটু কথাবার্তা বলতে চান?"

—"আমার কোনও ইণ্টারেস্ট নেই। কিছু একটা ধান্দা আছে হয়তো ওই জন্যেই দেখা করার অত ইচ্ছে।"

তুষারদার মুখ রাগে থমথম করছিল। এত রাগের কি আছে বুঝলাম না। পুরনো দিনের চেনাশোনা কেউ, বিদেশে এলে ভাল লাগে না? মনে হয় না, কত স্মৃতি, কত অনুষঙ্গ নিয়ে মানুষটা এসেছে। হয়ত এই একবারই তার বিদেশে আসা। জীবনেও আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ইচ্ছে হয় না তার সঙ্গে দেখা করি? বাড়িতে নিয়ে এসে একটু আদর যত্ন করি? আমাদের দু দণ্ড সময়ের এত অভাব কেন? তুষারদা কেন মানুষকে এমন অবজ্ঞা করে? সবাই কি মতলব সিদ্ধি করতে চায়? কে জানে! হয়ত আমাদের দাবি মেটাতে মেটাতে ওর এরকমই ধারণা জন্মে যাচ্ছে। ভাবছে ওই খোকনদাও ওর কাছে কিছু চাইবে। তাই এত অশ্রদ্ধা করে কথা বলছে।

শেষ পর্যন্ত তাঁরা আর এলেন না। ফোন করে আসতে চেয়েছিলেন। তুষারদা বেশ কায়দা করে কাটিয়ে দিল। দিদি ওর রকমসকম দেখে বিশেষ অবাক হয় না। অসামাজিক লোক বলে তুষারদার কাছে ঠিক স্বাভাবিক ব্যবহার বোধহয় আশা করে না। মাঝখান থেকে যা হল, ডাঃ গুহরা দিদিদের সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা ব্যবহার করতে লাগলেন। তুষারদার ব্যবহারে অপমানিত হতেই পারেন। বেনারসের লোকেরা ওঁদের আত্মীয়। নিশ্চয়ই তুষারদার নামে দু কথা বলে গেছেন। এই নিয়ে বাসবীদিও দিদিকে কিছু বলেছে। এক

অচেনা ভদ্রলোকের জন্যে আমরা যেন একঘরে হয়ে যাচ্ছি। পরপর কয়েকটা গেট-টু-গেদারে ডাক পড়ল না। দিদির ভীষণ মন খারাপ। তুষারদা তো বেঁচে গেছে। উইক এণ্ডে বাঙালির মুখ দেখতে হচ্ছে না।

আমার দুটো-একটা বিয়ের প্রপোজাল্ আসছে। কিন্তু সবদিক ভেবে ঠিক করলাম—আপাতত বিয়ে করব না। চাকরি করতে ভাল লাগছে। একটা পুরনো গাড়ি কিনে এধার ওধার খুব চালিয়ে বেড়াচ্ছি। কয়েক মাসের মধ্যে তপুর আসার কথা। তারপর বেশিদিন আর এ বাড়িতে থাকব না। তপুর সঙ্গে অ্যাপার্টমেণ্ট নিয়ে থাকব। এই শহরেই যে থাকতে হবে, তার কোনও মানে নেই। কাছাকাছি সব শহরেই পাহাড় দেখেছি। "মেরি মাউণ্ট গার্ডেন" নামে অ্যাপার্টমেণ্ট কমপ্লেক্স-এর বারান্দায় দাঁড়ালে ওয়াটার ফল্স্ দেখা যায়। অফিসের বন্ধু ক্রিস্টিন্ হয়ত আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে।

দিদিকে এখন কিছু জানাইনি। তপু এলে, আগে ও চাকরি পেয়ে যাক, তারপর যা ব্যবস্থা করার করব। শুধু চিঠিতে মাকে একটু জানিয়ে রেখেছি।

আমাদের অফিস চারটেয় ছুটি হয়। সাড়ে চারটের ভেতর বাড়িতে ফিরে আসি। দিদির ফিরতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। তুষারদা এমনিতে ওই রকমই ফেরে। শুধু যে দুদিন রাতে কলেজে পড়ায়, সে দুদিন রাত দশটা হয়ে যায়। আমি আজ ফেরার পর মেইল বক্স খুলে দেখলাম আর সব চিঠিপত্রের সঙ্গে পোস্ট অফিস থেকে একটা কার্ড দিয়ে গেছে। তুষারদার নামে রেজিস্ট্রি করা চিঠি, বাড়িতে কেউ না থাকায় ডেলিভারি দিতে পারেনি। হয় কাউকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে, নয়তো আবার তারিখ ঠিক করে জানালে পোস্ট অফিস বাড়িতে ডেলিভারি দেবে। তার মানে সেদিন কাউকে বাড়িতে থাকতে হবে। শনিবারেও অবশ্য নেওয়া যায়। এখন তো আধ ঘণ্টা পোস্ট অফিস খোলা আছে। আমি গিয়ে সই করে নিয়ে আসতে পারি।

চিঠিখানা নিয়ে এলাম। ব্রাউন পেপারের খামের চিঠি। ওপরে টাইপ্ করে ঠিকানা লেখা। বেনারসের পোস্ট মার্ক। বাঁ পাশের ঠিকানায় দেখলাম সোনারপুরা থেকে দেবেন্দ্রকুমার রায়ের নাম। আবার বেনারস? সেই 'খোকনদা'র নাম দেবেন্দ্রকুমার নাকি? হয়তো খুবই প্রয়োজন, তাই নিজে থেকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু ডাঃ গুহরা থাকতে তুষারদার কাছে সাহায্য চাইতে যাবেন কেন? এ বাড়িতে 'বেনারস কানেকশন' থেকে যত অশান্তি শুরু হয়েছে। তুষারদা কিছুতেই 'স্যান্ডারলিং'-এর দুর্গাপুজোয় যেতে রাজি হল না। এখানকার বাঙালিদের অকারণ অভদ্রতা নিয়ে কত লেকচার দিল। আমি আর দিদি অবশ্য গিয়েছিলাম। সকলেই ভাল ব্যবহার করেছে। এমনকি ইন্দ্রাণীদি মোহনদার সঙ্গে দিদি যখন নিজে থেকে কথা বলল, ইন্দ্রাণীদি কি ইমোশন্যাল হয়ে গেলেন। দিদির হাত ধরে বললেন—"শম্পাকে নিয়ে একদিন চলে এসো।" তুষারদার কথা জিজ্ঞেস করলেন না।

সেদিন দিদি ফেরার পর রেজিস্টার্ড চিঠিটা দিলাম। তুষারদার চিঠি ও

সবসময় খোলে। ঠিকানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল—"দেবেন্দ্র রায় আবার কে? তুষার তো বি এইচ ইউ-তে হস্টেলে থেকে পড়ত। বেনারসের লোক্যাল লোকজনকে এত চিনল কী করে? চিঠিটা খোল্ তো।"

দিদি চায়ের জল বসাতে গেল। তুষারদার পার্সোনাল চিঠি আমার কি পড়া উচিত? দিদিরও পড়া উচিত না। কিন্তু দিদি এরকম প্রাইভেসিতে বিশ্বাস করে না। ওর যত প্রাইভেসি বাইরের লোকের কাছে। আমাদের জীবন ওর সাজানো মিথ্যের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। যা কিছু লজ্জা, যত কিছু গোপন দুঃখ, বড় সাবধানে তাকে আড়াল করে রেখেছে। আমিও মনে করি না, বাইরের মানুষকে সব কথা বলা যায়। আমার মা যে তিনজন পুরুষের সঙ্গে সংসার করেছে, এ খবর জানানোর কিছু নেই। সে একান্ত তার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা। সাধারণ মানুষের বিচার বুদ্ধির কাঠগড়ায় কেন আমি তাকে ঠেলে দেব? আমার তো মা? বাবুজি যে আমাদের দুই বোনের বাবা নয়, সেও আমি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া কাউকে বলিনি। তখন বয়স কম ছিল, এখন এদেশে আসার পর ভাবি—এতে তো সংকোচের কিছুই নেই। কিন্তু দিদি যা আড়াল করতে চায়, সে শুধু একটা-দুটো ঘটনা নয়, পুরো পারিবারিক ছবিখানাই বদলে দেয়। ওর কল্পনার জগতে আমরা কেউ সামান্য নই, সাধারণ ক্যালিবারের মানুষ নই। এখানকার লোকেদের কাছে বাবুজিকে ও 'অ্যাডভোকেট' বলেছে। একথা কোনদিন বাবুজিকে বলতে পারব না। সামান্য চাকুরে লোককে দিদি বাবা বলে পরিচয় দিতে রাজি নয়। আমাদের এণ্টালির ভাড়াবাড়ি ওর কল্পনায় সাদার্ন অ্যাভিনিউ না কোথায় পৌঁছে গেছে। দেশ ছেড়ে এসেও দিদি ওর পছন্দের এলাকায় বাপের বাড়ি সাজিয়ে রাখতে চায়। পড়াশোনা নিয়েও অদ্ভুত কমপ্লেক্স্। না ওর ইংলিশ অনার্স পড়া হয়েছে, না আমার। তবু এখানে প্রেসিডেন্সির কথা বলেছে। মাঝে মাঝে এমন লজ্জাকর অবস্থায় ফেলে দেয়। পিট্সবার্গ থেকে সোনার গয়না, কাঞ্জীভরম সিল্ক কিনে এনে পুজোয় পরে গেল। লোকেদের বলে এল—"মা পাঠিয়ে দিয়েছে।" বুঝতে পারি, নিজেকে বেশ সচ্ছল পরিবারের মেয়ে বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখানে কেউ ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাহলে তো ওরা সমাজে যথেষ্ট প্রাধান্য পেত। উল্টে, দিদির মাত্রা ছাড়ানো ঐশ্বর্যের গল্প নিয়েই লোকে হাসাহাসি করে। দিদি না বুঝুক, তুষারদা বোঝে। আমি বুঝি।

বেনারসের চিঠি শেষ পর্যন্ত দিদি খুলল। ভেতরে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ছবি রয়েছে দেখলাম। দিদি ছবি দেখেও কিছু বুঝতে পারছিল না। চিঠির প্রথম দিক পড়তে শুরু করে বলে উঠল—"কেউ আমাদের ক্ষতি করতে চাইছে রে শম্পা। ওকে ভীষণ থ্রেট্নিং দিয়ে চিঠি লিখেছে।"

—"থ্রেট্নিং দিয়েছে মানে? ওই দেবেন রায়? দেখি, দে তো চিঠিটা।"

দিদির মুখ শুকনো। হাত থরথর করে কাঁপছে। ওকে কখনও এত ভয়

পেতে দেখিনি।

—"কী সব লিখেছে! কিছুই বুঝতে পারছি না···।" দিদির গলার স্বর কান্নার মতো শোনাল।

—"চুপ কর না। আগেই কান্নাকাটি করছিস কেন? চিঠিটা আমাকে দে।"

জোরে জোরে পড়তে শুরু করলাম—"দীর্ঘজীবেষু বাবা তুষার, বহু বছর পরে আবার তোমাকে পত্র লিখতে বসেছি। আজ বারো বছরের ওপর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ঠিকানা জোগাড় করতে পারি নাই। তুমি আমেরিকায় আছ, এই শুধু জানা ছিল। কলকাতার মার্কিন কনসুলেট অফিস আমার আবেদনপত্র পেয়ে দেখা করতে লিখেছিল। অশক্ত শরীর নিয়েও নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্যে সেখানে উপস্থিত হই। পরে তাদের দেওয়া ঠিকানায় পত্র লিখে কোনও উত্তর পাই নাই। সে পত্র কি আদৌ পেয়েছিলে? তোমার মা সে সময় নিতান্ত অসুস্থ। মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে দেখার জন্য অস্থির হয়েছিলেন।

সম্প্রতি ধীরেনবাবুর ছেলে খোকন এসেছিল। সে মাউণ্ট লরেল নামে একটি শহরে গিয়ে তোমার সংবাদ নিয়ে এসেছে। ঠিকানা লিখে দিয়ে গেছে। শুনলাম আবার বিবাহ করেছ এবং শ্যালিকাও তোমার কাছে থাকেন।

বৃদ্ধ বয়সে আমার আর তোমার কাছে কোনও প্রত্যাশা নাই। শুধু শেষবার মিনতি করি লছমীমাঈ আর তোমার ছেলে দুটির জন্যে একবার বেনারসে এসে যা হোক কিছু ব্যবস্থা করে যাও। আমার অবর্তমানে তোমার দাদাদের সংসারে তারা আশ্রয় পাবে কিনা, সেও এক চিন্তা। তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে একপ্রকার নিরুপায় হয়ে তোমাকে পত্র লিখলাম। আশা করি তোমার শিক্ষিতা স্ত্রী আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে নিজগুণে এই বৃদ্ধকে ক্ষমা করবেন। আর অধিক কী? তোমাদের কি সন্তানাদি হয়েছে? স্নেহাশীর্বাদ সহ

বাবা

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়

চিঠি আর ছবি নিয়ে আমরা কী যে করব ভাবতে পারছিলাম না। চিঠিটা তুষারদার বাবা লিখেছেন, তারই বা কি প্রমাণ? উনি যে বেঁচে আছেন, তাই তো বিশ্বাস করতে পারছি না। স্পষ্ট মনে আছে দিদির বিয়ের সময় তুষারদা যখন আমেরিকা থেকে কলকাতায় গিয়েছিল, ওর কোনও আত্মীয়স্বজন বিয়েতে উপস্থিত ছিল না। তুষারদা রেজিস্ট্রির দিন দু'জন বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান করে বিয়ে দেওয়ার সঙ্গতি ছিল না বলে নয়, দু'পক্ষের আত্মীয়স্বজনের অভাবেই রেজিস্ট্রি বিয়েতে বাবুজি রাজি হয়ে গেল। তুষারদা কখনও বলেনি ও বেনারসের ছেলে। শুনেছিলাম ওরা নর্থ বেঙ্গলের লোক। ছোটবেলায় শিলিগুড়ি না জলপাইগুড়ি কোথায় যেন থাকত। কম বয়সে মা, বাবা মারা যাওয়াতে নানা সাংসারিক পলিটিক্‌সে পড়ে, নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছে। আট বছর আগে দিদির বিয়ে হয়েছে। আজ

পর্যন্ত কোনওদিন তুষারদার আত্মীয়স্বজনের কথা শুনিনি। দাদাদের সঙ্গে ঝগড়া, এই পর্যন্তই আন্দাজ করতাম। কিন্তু আজকের চিঠিতে যা পড়লাম, এরপর কাকে বিশ্বাস করব? ছবিতে দেখছি তুষারদার পাশে অবাঙালি একটি রোগা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় সামান্য ঘোমটা। তার কোলে একটি বাচ্চা। পায়ের কাছে আর একটি ছোট ছেলে। তবে কি ও সত্যি আগে একবার বিয়ে করেছিল? দু'দুটো বাচ্চা ছেড়ে চলে এসেছিল কেন? মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে?

তুষারদা কলেজে পড়িয়ে যখন বাড়ি এল, দিদি তখনও একভাবে কার্পেটের ওপর চিঠি আর ছবি নিয়ে বসে আছে। রান্নাবান্না করা হয়নি। বাড়িতে মৃত্যুসংবাদ আসার পর যেমন হয়, দিদির অবস্থা দেখে সেরকমই মনে হচ্ছিল। আবার মাঝে মাঝে নিজের মনে বলে যাচ্ছিল—"অসম্ভব! একটা লোক বারো বছর বাবা, মাকে দেখতে গেল না। এ কখনও হয়? বউটার ব্যাপারও পুরো মিস্ট্রি মনে হচ্ছে। হিন্দুস্থানী একটা মেয়ে! কে জানে? কারও কোনও ইনভল্‌ভমেণ্ট হয়ে ছিল। তাই থেকে ব্ল্যাক মেইল শুরু করেছে…।"

তুষারদাকে চিঠি দেওয়ার আগে আমি বললাম—"আজ আমাদের খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি তুষারদা। আপনি জামাকাপড় চেঞ্জ করে আসুন। ফোন করে পিত্‌জা আনিয়ে নিচ্ছি।"

তুষারদার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। ছবিটা চিঠির আড়ালে থাকায় শুধু দূর থেকে খামটা দেখতে পেল।

—"কী হয়েছে? রূপা, হোয়াই আর ইউ সো আপ্‌সেট? কোনও খারাপ খবর এসেছে?"

—"তুমি দেবেন্দ্রকুমার রায়কে চেনো?"

তুষারদার সেই মুখ আমি ভুলব না। ভয়ংকর ভয়, নিদারুণ লজ্জা, ক্ষোভ, দুঃখ মিলে মিশে পরাহত, বিধ্বস্ত চেহারা। সেই প্রথম তুষারদাকে ভেঙে পড়তে দেখলাম। দিদির মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। তবু ওরই কাছে গিয়ে বসল। কী ক্লান্ত কণ্ঠস্বর—"আই ক্যাণ্ট টেক্ ইট এনি মোর! রূপা, আমার বাবা কি মারা গেছেন?"

দিদি উত্তর দিলো না। শুধু চিঠি আর ছবিটা ছুঁড়ে দিল। তুষারদা আগে ছবিটা দেখল। ক্রমশ ওর চেহারায় আগের মতো নিস্পৃহ ভাব ফিরে আসছিল। ছবি উল্টে রেখে চিঠি পড়ল। শেষ করার পর দিদি জিজ্ঞেস করল—"উনি যা লিখেছেন, সব সত্যি?"

—"কি জানতে চাও বলো?"

—"তুমি আগে একবার বিয়ে করেছিলে? ওই হিন্দুস্থানী মেয়েটা তোমার বউ ছিল?"

লক্ষ্য করলাম দিদি ছবির মেয়েটির সঙ্গে তুষারদার অতীতের কোনও তুচ্ছ সম্পর্ক ছিল বলেই বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছে। এখনও কঠিন সত্যের মুখো-

যুখি হতে পারছে না। এত সহজে কি বিশ্বাস হারানো যায়?

তুষারদা কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে বলল—"আমার তখন কুড়ি বছর বয়স। লছমীর সতেরো। প্রায় ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করেছিলাম।" হঠাৎ আমি বলে বসলাম—"তারপর দুটো বাচ্চা সুদ্ধু বউকে ফেলে চলে এলেন? দিদিকে বিয়ে করার আগে বললেন আপনার মা, বাবা কেউ বেঁচে নেই? আপনি কি সাংঘাতিক লোক তুষারদা?"

ক্রমশ মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছিল। লোকটা দিদিকে ঠকিয়েছে। বাবুজিকে ঠকিয়েছে। আমরা গরীব বলে, সমাজে মানমর্যাদা ছিল না বলে তার সুযোগ নিয়েছে। বাবুজিই বা কী করে অবিশ্বাস করবে? আমেরিকা থেকে কত ছেলে দেশে যায়। দশদিন-বারোদিনের মাথায় বিয়ে করে ফিরে আসে। সকলে তো আর ঠগ, জোচ্চোর নয়। দিদির সুন্দর চেহারার ওপর ভরসা করে বাবুজি কাগজের বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছিল। সরল মানুষ, ভাবতেও পারেনি, তুষারদা আগের ঘটনা লুকিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে এসেছে।

ইদানীং নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়েছি। ভেবেচিন্তে দেখেছি, প্রথমদিকে যা বলার, অনেক বলেছি। তুষারদা শুধু দোষ স্বীকার করে গেছে। দিদির কাছে ক্ষমা চেয়েছে। এখন দিদি যেন বেশ দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। তুষারদাকে বলেছে—বেনারসের ফ্যামিলি মেইনটেইন্ করার ব্যাপারে ওর কোনও আপত্তি নেই। অ্যালিমনি হিসেবে দেওয়াও উচিত। বিশেষ করে, যখন দুটো ছেলে আছে। ইচ্ছে করলে তুষারদা নিজের বাবাকে দেখেও আসতে পারে। কিন্তু দিদি আর মাউন্ট লরেলে থাকবে না। অন্য কোথাও চলে যাবে। ওদের মধ্যে যা কথা হয়, সব তো আমি শুনতে পাই না। জানতে ইচ্ছেও করে না। এই অশান্তির মাঝে পড়ে তপুর আসার কোনও ব্যবস্থা করতে পারছি না। দিদিও কথা তোলে না।

তুষারদার ঘটনা এখনও মাকে, বাবুজিকে জানাতে পারিনি। দিদি চাইছে না। মোহনদা, ইন্দ্রাণীদি নিশ্চয়ই আগে জানতেন। কিন্তু এত কাণ্ড লোকজনদের বলে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। দেখা হলে কেউ তো এসব কথা তোলে না। জানে কি জানে না বলা শক্ত। তবু দিদি এ শহরে থাকতে চাইছে না।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তুষারদার বাবার চিঠি এল। ও আর বেনারসে যায়নি। তবে বাবার নামে ডলার ড্রাফ্ট পাঠাচ্ছে। ডিভোর্সের ইচ্ছে থাকলেও কেস্টা ঘাঁটাতে চাইছে না। একটা বিয়ে থাকতে দিদিকে রেজিস্ট্রি করেছিল। দেশে গেলে ওরা ইচ্ছে করলেই ঝামেলা করতে পারে। তুষারদা সব এড়িয়ে আমেরিকায় থেকে গেল।

বারোই মার্চ দিদির বিয়ের ন'বছর পূর্ণ হবে। গতবছর থেকে ঠিক করে রেখেছিল দু'জনে জাহাজে করে ক্যারিবিয়ান আইল্যাণ্ড্সে বেড়াতে যাবে। তিন-চারটে আইল্যাণ্ডে যাওয়ার কথা। ছ'মাস হল ফ্লাইট, ক্রুজ্ শিপ, সব

বুকিং হয়ে আছে। তারই মধ্যে দিদির জীবনে যেন ঝড় বয়ে গেল। তবু তুষারদা কিছু ক্যানসেল্ করেনি। আশা করছিল বেড়াতে নিয়ে গিয়ে দিদির সঙ্গে সহজ সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে পারবে।

ফেব্রুয়ারির শেষে এক বরফের ঝড়ের রাতে দিদি আমার ঘরে এসে শুল। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। সেও শুধু বিষণ্ণতার স্মৃতি। দুঃখ যেন আমাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করে ফেরে। দিদির হাত আলতোভাবে আমার মাথা ছুঁয়ে ছিল।

—"এ বাড়িতে এটাই বোধহয় আমাদের শেষ উইন্টার।"

—"কোথায় যাবি দিদি? তুষারদার সঙ্গে থাকবি, না আমার সঙ্গে মুভ্ করে যাবি? তপু এলে আমরা তিনজনে থাকব।"

—"জানি না শেষ পর্যন্ত কী করব? তবে এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করে না। কারুর তো কোনও ঘটনা জানতে বাকি নেই।"

—"লোকের কথা ভাবছিস কেন? নিজে কী চাইছিস সেটাই বড় কথা। তোর যদি মনে হয় তুষারদা জীবনে একটা ভুল করেছিল, তবু তাকে ক্ষমা করা যায়, তবে সেভাবেই ডিসিশন নে। কে কী বলছে, সেটাকে এত ইম্পর্ট্যান্স দিবি কেন?"

—"আমি তোর মতো বোলড্ হতে পারি না রে শম্পা। ছোট থেকে মার জন্যে এত লজ্জা করত। আত্মীয়স্বজন পাইনি, সামাজিক জীবন ছিল না। শ্বশুরবাড়ি কী জিনিস জানলাম না। যা কিছু পেয়েছিলাম, সে তোর তুষারদার কাছেই। সোশ্যাল অ্যাক্সেপটেন্সও জীবনে এই প্রথম। অথচ কিছুই থাকল না শেষ পর্যন্ত···।"

মার্চের আট তারিখে দিদিরা প্লেনে পুয়ের্টোরিকো চলে গেল। স্যান য়ুয়ান থেকে ওদের জাহাজ ছাড়ছে। আমি মাউন্ট লরেলের বাড়িতে একা আছি। দশদিন পরে ওদের ফেরার ফ্লাইট। ওরা ডোমিনিকা আইল্যাণ্ডের একটা বই রেখে গিয়েছিল। এগারো না বারো তারিখ ভোরে ওদের জাহাজ ডোমিনিকায় পৌঁছোবে।

বারো তারিখ সকাল থেকে ভাবছি, আজ দিদিরা ডোমিনিকায় ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি কাটাচ্ছে। জাহাজের ব্যাংকোয়েট হলে কেক কাটবে। হয়তো এই নির্জনতার প্রয়োজন ছিল। দিদির কষ্ট তো দেখেছি। তুষারদাকেও আর বিশ্বাস করতে পারছে না। কতবার বলেছে—"তুমি কি মানুষ? নিজের ছেলেদের কথাও কখনও মনে পড়ে না?" তুষারদা বলেছিল—"সবই অল্প বয়সের ভুল। বলতে পারো ইন্স্টিংক্টের ব্যাপার। কিন্তু তারপরে আর অ্যাটাচ্মেণ্ট ডেভেলপ্ করল না। লছমীকে সহ্য করতে পারতাম না। তাই নিয়ে মা, বাবার সঙ্গে ঝগড়া শুরু হল।"

হয়তো কখনও যন্ত্রণা আর অনুতাপের মধ্যে দিয়ে তুষারদার মধ্যে পরিবর্তন আসবে। দিদি যদি ক্ষমা করে নিতে পারে, তাই ভাল।

পোর্ট থেকে দিদির ফোন আসার কথা। শুয়ে শুয়ে রাত বেড়ে যেতে মনে হল—এখন ওরা জাহাজে ফিরে গেছে। আজ আর ফোন আসবে না। ডোমিনিকার বইটার পাতায় পাতায় কতো ছবি। অন্ধকার রেইন ফরেস্ট। পাহাড়ের গা বেয়ে ট্রাফালগার ফলস নেমে আসছে। কোথাও গাঢ় সবুজ রং-এর লেক্।

আমার জানলার বাইরে রাতের কালো পাহাড়, বই-এর পাতায় ধূসর আগ্নেয়গিরির ছবি—দেখতে দেখতে কখন ঘুম এসে গেল। ঘুমের মধ্যে ক্যারিবিয়ানের স্বপ্ন দেখলাম। সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে জাহাজে যাচ্ছি ঠিক সেই স্বপ্ন নয়। শুধু ডোমিনিকায় পৌঁছে দিদির হাত ধরে হাঁটছি। কোথাও সমুদ্র নেই। নারকোলবাগান, কলাবাগানের ধার দিয়ে চলেছি। সেখানে তুষারদা নেই। শক্ত লাভার ওপর ডাবের খোলা পড়ে আছে। দিদি বলল "ডাব খাস না, লাভা আছে, লাভা আছে।" চল্ দিদি বৃষ্টিতে ভিজি। আমাকে রেইন্ ফরেস্টে নিয়ে চল্। বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে উঁচুতে উঠছি। রেইন্ ফরেস্টের ভেতরে শুধু সবুজ অন্ধকার। ছলছল জলের শব্দ। বনের অন্ধকারে এমন বৃষ্টি। আমার ভয় করছে। দিদি তুই কোথায়? গাছের ঝুরির আড়াল থেকে রুপালি বলে একটা মেয়ে তার বোনের ছোটবেলাকার নাম ধরে ডাকল—বনু আয়, এইখানে আয়। আমি কাঁদছিলাম—নিয়ে যা দিদি, আমাকে নিয়ে যা। রুপালি আর বনু এমারেল্ড পুলের জলে নেমে গেল···।

যখন জেগেছি, তখনও চোখের কোণে জল জমে আছে। মাথা ভার। বুকের মধ্যে যন্ত্রণার মতো অনুভূতি। রাতে কি জ্বর এসেছিল? অফিস যেতে হবে ভেবেও উঠতে পারছি না। দিদি কাল ফোন করল না কেন?

আর কোনওদিন দিদি ফোন করেনি। বারোই মার্চ জাহাজের অ্যানিভার্সারি পার্টির পর কেবিনে শুতে এসেছিল। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে তুষারদা ওকে বিছানায় দেখেনি। কখন দিদি জাহাজের ওপরের ডেকে গিয়ে বসেছিল, কখন সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে, কেউ জানে না। তারপর প্রায় দশদিন জাহাজ ডোমিনিকার পোর্ট ছাড়তে পারেনি। পুলিস ইনভেস্টিগেশন হল। কোস্ট গার্ডরা বডি খোঁজার জন্যে বহুদিন সময় নিল। তবু দিদিকে পাওয়া গেল না। সুইসাইড নোটেও নিজেদের মানসিক অশান্তির কথা লিখে যায়নি। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে বাঁচার ইচ্ছে হারিয়েছে—লিখেছিল। তুষারদা ওকে নিজে হাতে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিতে পারে কিনা এই সন্দেহ থেকে পুলিস ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল। দিদির ছোট্ট চিঠি ওকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

তুষারদা মাউন্ট লরেলে ফিরে আসার পর আমি আর ভ্যালি কোর্টে থাকিনি। ক্রিস্টিনের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টে চলে গিয়েছিলাম। তুষারদা বলেছিল —"তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? এখানে থাকতে ভয় পাচ্ছ?"

বলেছিলাম—"আপনার সঙ্গে আমার দিদিকে দিয়েই সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত। আমার জন্যে অনেক করেছেন তুষারদা। তবু, আর থাকা যায় না।"

দশ বছর পরে আজ আবার সেই তারিখ। মনে পড়ছে দিদির বিয়ের কথা। ক্যারিবিয়ান ক্রুজের কথা। বারোই মার্চ সারারাত ধরে দিদিকে স্বপ্ন দেখা। দিদির শেষ সমুদ্রযাত্রা। সমুদ্রই তার শেষ আবরণ। আজ আমরা তিন ভাই বোন আমেরিকার তিন প্রান্তে আছি। বাবুজী মারা গেছেন। মা কখনও এদেশে, কখনও দেশে। শুধু দিদি কোথাও থাকে না।

॥ ১৪ ॥

অনিকেত

"মহারাজ, আপনি বলেছিলেন সংসারে সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগ বেশী। পৃথিবীর সেই তিনভাগ জলের মতো। দুঃখের সঙ্গে জলের তুলনা আমি নিজেই দিই মহারাজ। জীবনের অভিঘাতে সম্পৃক্ত হতে হতে এ উপমা যথার্থ মনে হয়েছে। আর যে বাকি একভাগ সুখের স্থলভূমি আমার কল্পনায় ছিল, বহু অন্বেষণের পরেও সেখানে পৌঁছোতে পারিনি।

মহারাজ, আপনি এমন কথাও বলেছিলেন—সংসারের কাছে কোনো প্রত্যাশা না রাখতে। সেখানে আমরা কর্মের জন্যে প্রতিশ্রুত। কর্তব্যের কাছে দায়বদ্ধ। অথচ সংসার অথবা মানুষের এমন সাধ্য নেই যে প্রতিদানে আমাকে পুরস্কৃত করে। সে অধিকার শুধু ঈশ্বরের। আপনি আমাকে সেই রাজাধিরাজের কাছে পুরস্কার চাইতে বলেছিলেন। আমি তো ভিক্ষা চেয়ে বসে থেকেছি মহারাজ। আপনার উপদেশ মতো ঈশ্বরের কাছে শান্তি ভিক্ষা করেছি। হয়ত শান্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানার জন্যে, আমার অজ্ঞতার কারণে প্রার্থনার মুহূর্তে কিছু ভুল ভ্রান্তি ঘটে থাকবে। সংশয় থেকে যা হওয়া সম্ভব। যখন তাঁকে বলবার কথা ছিল—আমাকে অভিমান মুক্ত করো, অথবা তোমার প্রতি অনুরক্ত করো প্রভু, তখন ঐ অজ্ঞতার দোষে অন্য কিছু বলেছি নিশ্চিত। আজ বলতে ভারী লজ্জা হয় মহারাজ, ঈশ্বরকে সাংসারিক দুঃখের কথাই শুধু বলেছি। অশান্তি আর ক্ষোভ থেকে বারবার অভিযোগ জানিয়েছি। হয়ত আত্মজনের প্রতি আমার এই ক্ষমাহীনতার জন্যে, প্রকৃত শান্তি আর কখনো চাওয়া হল না মহারাজ। এ সত্য যেন ক্রমশঃ উপলব্ধি করছি।"

লেখার কাগজ থেকে চোখ তুলে ব্রততী কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো। চশমা খুলে রেখে, খাতাপত্র গুটিয়ে একপাশে রাখবার সময় আশা করছিল, এবার হয়ত শিবানী কিছু বলবেন। শিবানী তখনও অন্যমনস্কের মতো বসে ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত ঘরে কোনো শব্দ ছিল না। এক সময় শিবানী বললেন—"বেশ তো শুরু করেছো। এই একঘেয়ে জীবন নিয়ে আর কিই বা লেখার আছে!"

—"চেষ্টা করবো শেষটা যাতে অন্যরকম হয়।"

—"আমার জীবন? না তোমার গল্প? আর কি অন্যরকম হবে?"

—"অনবরত দুঃখের কথা লিখবো না। আপনি মাঝে মাঝে বলেন

সংসারে দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। আমি ঠিক সে ভাবে ভাবি না। জীবন তো শুধু একটা মাত্র অভিজ্ঞতা নয়।"

—"আমার জীবনে দুঃখই সার ব্রততী। আর কোনো অভিজ্ঞতা হল না।" বিষণ্ণ হেসে শিবানী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গায়ের শালখানা জড়িয়ে নিতে নিতে বললেন—"রান্নাঘরে এসো। আর একটু চা করি।"

চায়ের টেবিলে বসেও ব্রততী আলোচনার সূত্র ধরে রাখছিল—"কেন বলেন জীবনের সব পর্বেই শুধু দুঃখ ছিল? আপনার ছোটবেলার কোনো আনন্দের স্মৃতি নেই?"

—"সাধারণ অবস্থা ছিল। মা ডিপ্রেশনে ভুগতেন। লোকে পাগল বলতো। মা থেকেও না থাকারই মতো। সেটা দুঃখ নয়?"

ব্রততী সে মুহূর্তে যেন এক দুঃখের প্রতিমূর্তিকে অস্বীকার করার চেষ্টায় নিজের কাছেই সংকুচিত হয়ে গেল। এই মানুষকে বারবার প্রশ্ন করতেও মায়া হয়।

আজ ব্রততী আসবে বলে শিবানী সন্দেশ করে রেখেছিলেন। স্যাণ্ডউইচের সঙ্গে একটু ঘুগনি আর সন্দেশ এনে টেবিলে রাখতে ব্রততী বলল—"মাসীমা আপনি এত কিছু করলেন কেন? দুপুরে একদম খাওয়ার অভ্যেস নেই…।"

—"একদিন খেলেই ওজন বাড়ে নাকি? যেটুকু পারো, খাও।"

—"আপনিও লাঞ্চ সেরে নিন। এমনিতেই বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমি আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উঠব।"

খাবার টেবিলে বসে বসে শিবানী রাতের রান্নার তরকারী কাটছিলেন। গল্পের মেজাজ ফিরে এসেছিল। ব্রততী যেন শিবানীর জীবনে অন্তত সামান্য সময়ের জন্যেও সুখের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাইছিল। শুধু দুঃখের কথাই উনি বলেন। এই মধ্যবয়সী মহিলার জীবনে এত দুঃখ জমে থাকা উচিত নয়।

ব্রততী বললো—"আপনি স্কুলে পড়েছিলেন। স্কুল লাইফের একটা আলদা আনন্দ থাকে। দু-একজন ভালো বন্ধুও নিশ্চয়ই ছিল?"

—"আমাদের সময়ে অত বন্ধুত্ব রাখার সুযোগ ছিল না। জয়েণ্ট ফ্যামিলিতে কত কাজ থাকতো। মার মন মেজাজ খারাপ থাকলে ছোট ভাই-বোনদের সামলাতে হতো। ইস্কুলের পরে আর বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ানো হতো না।"

ব্রততী মৃদু হাসলো—"স্কুল লাইফে না হয় স্বাধীনতা পাননি। কিন্তু বিয়ের পরে? আপনার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কও তো সুখেরই অভিজ্ঞতা?"

শিবানীও হেসে উঠলেন। ব্রততী তাঁর মেয়ের বন্ধু। ফিলিপস্‌বার্গ থেকে হঠাৎ হঠাৎ উইক ডেতে চলে আসে। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ সময় কাটিয়ে যায়। ইমিগ্র্যাণ্ট মা, বাবাদের নিয়ে পেপার লিখছে বলে নানা প্রশ্ন করে ওঁকে। কিন্তু শিবানী জানেন সেটাই ওর আসার একমাত্র কারণ নয়। ওঁকে নিয়ে আরও কিছু লেখার ইচ্ছে ব্রততীর। যা ওর থিসিসের কাজে লাগবে না। হয়ত

অন্য কোথাও লিখবে। আজকাল আমেরিকায় বাঙালীদের সম্মেলন হচ্ছে বছর বছর। সেমিনারে তাঁর মতো মা, বাবাদেরও ডাকা হচ্ছে সুখ দুঃখের কথা বলবার জন্যে। ব্রততী এ সব নিয়ে কাজ করে। আমেরিকায় আসার পর থেকে ওকে দেখছেন। এ বাড়ির সঙ্গে ওর অনেকদিনের চেনাশোনা। অথচ ইদানীং খুকুর সঙ্গেই ব্রততীর সম্পর্ক আলগা হয়ে যাচ্ছে।

ব্রততী জিজ্ঞেস করল—"বিয়ের পরে ভালোই ছিলেন নিশ্চয়ই ?"

—"খুব বেশীদিন নয়। খুকু যখন আড়াই বছরের, ওর বাবা হঠাৎই মারা গেলেন। দিব্যি সুস্থ মানুষ, কি থেকে যে কি হয়ে গেল। আর আমি তখন মেয়ে নিয়ে মালদায় বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে শেষ সময়ে আমার দেখা হল না।"

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ব্রততী চলে গেল। কাল থেকে শিবানীর অল্প জ্বরের মতো হয়েছে। দুপুরের দিকে একটু শুয়ে থাকলেন। মাথার মধ্যে রাজ্যের চিন্তা। তবু সব কিছু ছাপিয়ে ব্রততীর লেখার প্রথম অংশটুকু মনে পড়ছিল। মহারাজের কথা ভাবছিলেন। ব্রততী আর প্রদীপ্ত নিয়ে না গেলে মহারাজের কাছে কোনোদিনও যাওয়া হত না। সেই উৎসবের দুপুরের কথা মনে পড়ছিল।

—"মহারাজ, আপনার একটু সময় হবে আজ ?"

ভীড়ের মধ্যে এগিয়ে যেতে যেতে ব্রততীর ডাকে মহারাজ ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। হলের পেছনে তখনও অনেক লোক তাঁর অপেক্ষায় ছিল। মহারাজ ব্রততীকে বলেছিলেন—"একটু পরে ওপরে এসো।"

ভীড়ের দিনেও মহারাজ সময় দিয়েছিলেন। এর আগে শিবানী কখনো মিশনে যাননি। ঠাকুরের জন্মদিনে, দুর্গাপুজোর সময়, বিবেকানন্দের জন্মদিনে ওখানে বড় উৎসব হয় শুনেছিলেন। কিন্তু খুকুদের তো কোনো আগ্রহ ছিল না। কার সঙ্গেই বা যেতেন ?

প্রসাদের পর্ব মিটলে ব্রততী ওঁকে তিনতলায় লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলেছিল—"দেখেছেন কত পুরনো বাড়ি। নাইনটিন ফিফ্‌টিনে মিশন কিনেছিল। অভেদানন্দ মহারাজ পর্যন্ত এ বাড়িতে থেকেছিলেন।"

ব্রততী উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছিল আর একটু পরে পরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। শিবানীর সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হচ্ছিলো। হাঁটুতে চাপ ধরার মতো ব্যথা। ধীরে ধীরে রেলিং ধরে উঠছিলেন। ব্রততী সিঁড়ির মাথা থেকে নেমে এসে ওঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিল। ওঁর হাঁফ ধরছে দেখে ল্যাণ্ডিং-এ অপেক্ষা করিয়ে করিয়ে ওপরে নিয়ে গিয়েছিল।

লাইব্রেরীর ঘরে আরও কজন বসেছিলেন। সকলেই মহারাজের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন। মহারাজ তখনও ঘরে না আসায় ফিসফিস করে কথাবার্তা হচ্ছিলো। দেওয়ালে দেওয়ালে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির আর বেলুড়মঠের

পুরনো সাদা কালো ছবি। ফায়ার প্লেসের ওপরের তাকে ঠাকুরের ছোট্ট মূর্তির সামনে মোমবাতি জ্বলছিল। শিবানী দেখলেন এক বৃদ্ধা ওঁদের জন্যে একটি থালাতে ফল আর বিস্কুট রাখছেন। ব্রততী উঠে হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করার সময় বয়সের ভারে প্রায় অবনত সেই সন্ন্যাসিনী শিবানীর দিকে চেয়ে সামান্য হাসলেন। শিবানী অপ্রস্তুতের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সন্ন্যাসিনী ঘরের আলো জেবলে দিয়ে গেলেন। তখন দুপুর শেষ হয়ে এসেছিল।

সেদিন গাড়িতে ফেরার সময় ব্রততী আর প্রদীপ্তর কাছে শুনেছিলেন সন্ন্যাসিনীর নাম অ্যাগনেস। অল্প বয়সে সংসার ছেড়ে মিশনের কাজ করতে এসেছিলেন। প্রায়ষাট বছরেরও বেশী ঐ বাড়িতে আছেন। এই দীর্ঘ সময়ে অন্য কোথাও রাত্রিবাস করেননি। কখনো প্লেনে ওঠেননি, টেলিভিশন দেখেননি। আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

ব্রততী বলেছিল—"পঁচাশী বছর বয়সেও কি যে প্রাণশক্তি ওঁর! ভোর থেকে উঠে রাত বারোটা-একটা অবধি কিছু না কিছু কাজ করে যাচ্ছেন। নীচের হলঘরে ঠাকুরের বেদী পরিষ্কার করা, সাজানো গোছানো থেকে শুরু করে এত বড় বাড়ি পরিষ্কার রাখা, মিশনের অফিসিয়াল কাজকর্ম দেখা, লোকজন এলে দেখাশোনা, সব ঐ বুড়ো মানুষ এখনও করে যাচ্ছেন। নিজের বলতে কিছু নেই ওঁর।"

শিবানী বলছিলেন—"আমেরিকানরা কত বয়স পর্যন্ত যে কাজের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে।"

প্রদীপ্ত বলেছিল—"সিসটার অ্যাগনেস মিশনের বাড়িটাকে তীর্থস্থান বলে ভাবেন। মহারাজ ওঁর সম্বন্ধে বলেন লিভিং সেইণ্ট্।"

ব্রততী বলেছিল—"মহারাজ বলেন, এমন মানুষের সংস্পর্শে আসাও ভাগ্যের কথা।" সেদিন শিবানী এত সব যোগাযোগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। বৃদ্ধ মহারাজ এক সময় ঘরে এসেছিলেন। নানা জনের নানা কথা আর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ফাঁকে কজন ছাত্রছাত্রীকে কিছু বইপত্র দিয়েছিলেন। ওরা কলেজে রিলিজিয়ন নিয়ে পড়ছে। মহারাজের কাছে ক্লাস করতে আসতে চাইছিল।

ক্রমশ ঘর খালি হয়ে যেতে সময় বুঝে ব্রততী বলেছিল—"মহারাজ, এবার আসতে অনেক দেরী হয়ে গেল। আজকাল রবিবারে রবিবারে সুদীপের বাংলা স্কুল হয়ে এমন তাড়াহুড়ো লেগে যায় সকাল বেলায়···।"

মহারাজ হাসছিলেন—"আমি তো ভবলাম মিশনের রাস্তা ভুলে গেছ। তোমাদের ছেলে কোথায়? এবারে আনোনি দেখছি?"

প্রদীপ্ত বলেছিল—"সুদীপদের স্কুল থেকে ওয়াশিংটন নিয়ে গেছে।"

মহারাজ শিবানীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আপনি কোথায় থাকেন?"

—"লং আইল্যাণ্ডে থাকি। মেয়ে-জামাইয়ের কাছে।"

—"এমন কিছু দূর তো নয়। তাদের নিয়ে আসবেন মাঝে মাঝে।"

শিবানীর মনে হয়েছিল এ সবই ভূমিকামাত্র। ব্রততী তো তাঁকে নিয়ে আসার আগে মহারাজের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল। তবে কি সেভাবে কিছু বলেনি? মহারাজের হয়ত জানা নেই, কেন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু তখন বড় সংকোচ হয়েছিল। সকাল থেকে উৎসবের পুণ্যময় পরিবেশে ধূপ আর ফুলের সুবাসের মাঝখানে বসেছিলেন। ঠাকুরের বেদীর সামনে নতজানু হয়ে থাকা দেশীবিদেশী মানুষ, মহারাজের স্তোত্রপাঠ, বক্তৃতা—এমন জায়গায় আগে তো কখনও আসেননি শিবানী। সাহেব ভক্তরা যখন অর্গানের বাজনার সঙ্গে চোখ বন্ধ করে গাইছিল—জয়রামবাটির মাটি চন্দন সমান, তখন বুকের মধ্যে এক নিঃশব্দ স্ফুরণ অনুভব করেছিলেন। তারপরে বিকেল বেলায় মহারাজের সামনে বসে নিজের সংসারের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা বলতে ভারী কুণ্ঠা বোধ হয়েছিল তাঁর। তবু কিছু কথা বলেছিলেন। সেদিন মহারাজ তাকে যা যা বলেছিলেন, ব্রততী সেই নিয়েই গল্পের ভূমিকা তৈরী করেছে।

ব্রততী চলে যাবার পর অসুস্থ শরীরে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শিবানী। অ্যালার্ম ক্লকের কর্কশ শব্দে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন। ঘড়ির মাথার বোতাম টিপে ধরতে শব্দ বন্ধ হলো। আজকাল দুপুরে শুলেও অ্যালার্ম দিয়ে রাখেন। না হলে জয়কে আনতে দেরী হয়ে যায়।

শেষ দুপুরে ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। যেন এখনই সন্ধ্যে নামবে। ঘুমের ঘোর কাটতে চাইছিল না। জোর করে কম্বল সরিয়ে খাট থেকে নামলেন। জানলার পর্দা সরাতে চোখে পড়লো বিবর্ণ আকাশের নীচে অবিশ্রাম বরফ পড়ে চলেছে। বাড়ির ড্রাইভওয়ে, সামনের পীচের রাস্তার ওপর পুরু সাদা আস্তরণ। কখন শুরু হয়েছে কে জানে? শুয়েছিলেন বোধহয় বেলা একটা দেড়টা নাগাদ। এর মধ্যে এত বরফ পড়ে গেল? এখন হাঁটতে হাঁটতে জয়ের ইস্কুল পর্যন্ত যেতে হবে। প্রথম প্রথম এত ঠাণ্ডায় বেরোতে চাইতেন না। শীতের মধ্যে গাদা খানেক জামাকাপড় পরে তৈরী হওয়াই এক পর্ব। তার ওপর অতদূর হেঁটে যাওয়া। বরফের ওপর পড়ে গিয়ে গত শীতে হাত ভাঙলেন। বিক্রম সেই ভাঙা হাতও মুচড়ে দিয়েছিল। কি অমানুষিক অত্যাচার। আজও একটু কাজ করলেই হাতটায় যন্ত্রণা হয়। তবু তো বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। এই সংসার তাঁর কাছে অনেক কিছু দাবী করে। আমেরিকায় বয়স্ক লোকেরা কত বেশী কাজ করে। আর শিবানী সবেমাত্র আটান্নয় পৌঁছেছেন। ওদের বিবেচনায় মাঝবয়সী। ওঁর তো আরও পরিশ্রম করা উচিত। এমন কথা কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিক্রম বলেছে। এর পর আর নিজের কষ্টের কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। নেহাৎ অতিষ্ঠ না হলে কতবারই বা প্রতিবাদ করেছেন?

ঘড়ির কাঁটা হু হু করে এগোচ্ছে। শিবানী তাড়াতাড়ি তৈরী হতে চেষ্টা করছেন। আজকাল মোজা পরেই শুয়ে থাকেন। টিনার ভারী বুটজোড়া পায়ে দিয়ে ফিতে বাঁধতে বসলেন। শীতের শীতে সর্বাঙ্গে ব্যথা। কোমর নীচু করতে কষ্ট হয়। টিনারই মোটা গলাবন্ধ সোয়েটার-মাথা গলিয়ে পরে নিলেন। নাতনী কলেজে যাবার আগে তার যত ভূষিমাল দিদিমাকে দান করে গেছে। বেরোনোর সময় খুকুর ছাই-ছাই রং-এর পুরোনো মাফলারখানা বেশ করে কানে গলায় জড়িয়ে নিলেন। সাড়ে তিনটেয় জয়ের ইস্কুল ছুটি হয়ে যাবে। ঠাণ্ডার মধ্যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে না থাকে। কাল থেকে আর দুপুরে শোবেন না। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে আরও দেরী হয়ে গেল। এই বয়সে তাড়াহুড়ো করে বেরোনো যায়? খুকুর ভারী লেপের মতো ডাউন কোটটা পরে আরও যেন দমসম লাগছে। খুকু তো অনেকটা লম্বা। শিবানীর এই রোগা চেহারায় হাঁসের পালক-ভর্তি লেপের ডিজাইনের মেরুন কোটটা একেবারে পা পর্যন্ত লুটোপুটি খায়। মাথার একটা গোল টুপী এদেশে আসার পরে খুকু কিনে দিয়েছিল। খোঁপাসুদ্ধু মাথাতে ভালোভাবে চেপে বসতো না। পরে নিজে ঘোমটার মতো করে উলের টুপী বুনে নিয়েছিলেন। এখনও সেটাই চলছে।

শিবানী দরজা লক্ করে বাইরে এলেন। ড্রাইভওয়েতে বিক্রমের গাড়িটা দু হাতে ধরে ধরে অনেকটা নীচে নেমে গেলেন। বিক্রম সকালের বাস ধরে নিউইয়র্কে যায়। গাড়িটা পুরোনো হয়েছে। বেশীর ভাগ সময় ড্রাইভওয়েতে পড়ে থাকে।

রাস্তায় পৌঁছে শিবানী দেখলেন বরফ তখনও জমে শক্ত হয়নি। পাউডারের মতো নরম হয়ে আছে। ভুস ভুস করে পা ডুবে যাচ্ছে। হাওয়ার দাপটে চোখ মুখ কেটে যাওয়ার মতো লাগছে। এক-একবার দমকা হাওয়ায় বরফের কুচি উড়ে এসে চশমার কাঁচ ঢেকে দিচ্ছে। ভালো করে সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। গ্লাভস্ পরা হাত দিয়ে মুছে মুছে কাঁচ পরিষ্কার করছেন।

স্যালীদের বাড়ির মোড়ে এসে যেন আশায় আশায় ওদের ড্রাইভওয়ের দিকে তাকালেন। নাঃ, গাড়িটা নেই। স্যালী ছেলে মেয়েদের আনতে চলে গেছে। দেখা হলে মাঝে মাঝে তাঁকে ঐ পথটুকুর জন্যে গাড়িতে তুলে নেয়। তাও সব দিন নয়। ফেরার সময় ওর গাড়িতে অনেকগুলো অন্য বাচ্ছা ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় নামাতে নামাতে যায়। এক একজন মা একেক সপ্তাহে কারপুল করে। শিবানী ভেবেছিলেন; অন্তত শীতকালটায় জয়ের জন্যে খুকু ঐরকম কোনো বন্দোবস্ত করে দেবে। খুকু কিছুই করলো না। তাহলে তো ওকেও এক সপ্তাহের জন্যে কারপুল করতে হতো। ওর সময় কোথায়? অফিস থেকেই ফেরে কত দেরীতে। অবশ্য ইচ্ছে করলে একটু খরচ করে ইস্কুলবাসের ব্যবস্থাও তো করতে পারতো। বিক্রমই করতে দেয়নি। উল্টে কত লেকচার! বলেছিল—"সারাদিন বাড়িতে থাকলে ফ্রেশ এয়ার পাবেন কি করে? অনবরত

বলেন গ্যাস হচ্ছে। কিছু হজম হচ্ছে না। সে জন্যেই রোজ বাইরে হাঁটা দরকার। দেশে লোকে সকাল বিকেল কম হাঁটে ?"

তা হাঁটে ঠিকই। শিবানীও কিছু কম হাঁটতেন ? তবু ট্রাম বাস তো ছিল। রিকশো নিয়েও ঘুরতেন কত সময়। আর যেটুকু হাঁটতেন, তাও দোকানপাট, লোকজনের মুখ দেখতে দেখতে। এখানে বরফ ঠেলে ঠেলে কনকনে হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে রুগ্ন শরীরে একটা মানুষ রোজ এতদূর হাঁটতে পারে ?

খুকুটা এত স্বার্থপর হয়ে গেল কেন ! এত নিষ্ঠুর ! ওর জেদী আত্ম-সুখী ভাবটা আগেও ছিল। বিয়ের সময় আমেরিকায় সম্বন্ধ শুনে আর কোথাও কথাবার্তা এগোতে পর্যন্ত দিলো না। একবারও ভাবলো না ও ছাড়া মার আর কেউ নেই। মাথা গোঁজার নিজস্ব আশ্রয় পর্যন্ত নেই। ও চলে গেলে মাকে দেখবে কে ? ওর ঝোঁক দেখে শিবানী বুঝেছিলেন, দূরে চলে গিয়ে ও নিজে অন্ততঃ মন খারাপ করবে না। শিবানী নিজের একাকিত্বের কথা ভাবেননি সেদিন। বিক্রমদের চাহিদা মেটাতে আত্মীয়স্বজনের কাছে সাহায্য নিয়েছিলেন। বিয়ের চার মাস বাদে খুকু আমেরিকায় চলে এসেছিল। তিন বছর খুকুকে আর দেখেননি। চিঠিপত্রও লিখতো কত কম। তারপর নিজেদের গরজেই তাঁকে এদেশে নিয়ে এল। এখন অন্ততঃ তাই-ই বুঝেছেন। গত বারো বছর ধরে ওদের সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছেন। নেহাৎ মরে না গেলে ছুটি পাবেন না। মেয়ের সংসারেও যে এমন দুরবস্থা হয় মানুষের, না বাস করলে বোঝা যেত না।

শিবানী আজকাল নিজের সঙ্গে কথা বলেন। এইসব ক্ষোভ আর অভিমানের মুহূর্তে মহারাজের উপদেশ মনে করতে চেষ্টা করেন। তবু বিষণ্ণতা যায় না।

চতুর্দিকে পেঁজা তুলোর মতো বরফ উড়ছে। কংকালসার গাছগুলোর শুকনো শাখা-প্রশাখা ঘিরে বরফের মালা জড়ানো। পাইন আর এভারগ্রীনের গাঢ় সবুজ পাতার পরতে পরতে তখনও নরম ফেনার মতো বরফ জমছে। ক্রমশ আকাশে আলো কমে আসছে। শিবানী হেঁটে হেঁটে অনেকটা পথ চলে গেছেন। ক্লান্ত শরীরে শীত ঢুকে যাচ্ছে। পা পর্যন্ত ঝল্‌ঝলে লম্বা কোট ভিজে উঠছে। ঘোমটার মতো টুপীর গায়ে অজস্র জলবিন্দু। চশমার কাঁচে বরফের অস্বচ্ছ আবরণ। শীর্ণ কোলকুঁজো মানুষটি তীব্র হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হিলস্‌বোরো এলিমেণ্টারী স্কুলের অন্য ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভাবছেন, জয়ের হয়ত ছুটি হয়ে গেছে এতক্ষণে।

—"হাই মিসেস বাসু, হাউ আর ইউ টু ডে ?" মোড়ে দাঁড়ানো ক্রসিং গার্ড ওঁকে রাস্তা পার করাতে করাতে কথা বলছে।

রোজ এক প্রশ্ন। আর মামুলী উত্তর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর নতুন করে কেমন থাকে মানুষ ? তবু ভদ্রতা বজায় রাখেন। সেটাই নিয়ম।—"ফাইন্। থ্যাংক ইউ" বলে হাসির মতো একটু ভঙ্গী করে স্কুলের মাঠের দিকে নেমে

স্নান। ঠাণ্ডায় নাক মুখ জমে পাথর।

জয় দূর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে। একবার বরফের মধ্যে পড়েই আবার উঠে দাঁড়ালো। দেখে মনে হলো ইচ্ছে করেই পড়ে গেল। টুপী নেই, মাফলার নেই। জ্যাকেটের জীপার পর্যন্ত লাগায়নি। ঠাণ্ডায় মুখখানা টুকটুকে লাল। কাছে এসেই বললো—

—"ইউ লুক ফানী।"

—"আমার খুব শীত করে যে। তুমি টুপী, মাফলার পরোনি কেন? অ্যাঁ? কোথায় ফেলেছো?"

জয় হি হি করে হাসছে। শিবানী জোর করে ওর ব্যাগ টেনে নিয়ে খুঁজছেন। বারোমাস কান কট কট আর গলাব্যথা। কথায় কথায় সর্দি কাশি। বিশেষ করে এই শীতকালটায়। এদিকে টুপী আর মাফলার পরা নিয়ে দিদিমার সঙ্গে রোজ ঝগড়া। টুপীটা ব্যাগ থেকে টেনে বের করে পরাতে যাচ্ছিলেন। জয় ছুটে ক্রশিং গার্ডের কাছে পালালো। আরও বাচ্ছারা দল বেঁধে রাস্তা পার হচ্ছিল। বেশীর ভাগই মায়েদের গাড়িতে উঠে পড়ছে। জয়ের সে আশা নেই। বরফের মধ্যে দৌড়ে দৌড়ে বাড়ি যাবার চেষ্টা করছে। শিবানী ওর সঙ্গে হেঁটে পারেন না। দ্যাখ্ না দ্যাখ্ হাত ছাড়িয়ে দৌড়বে। রোজ জয়কে সকালে ইস্কুলে পৌঁছোনো আর বিকেলে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর এত হয়রানি। কিন্তু নাতি আছে তার নিজের তালে।

শিবানী দেখতে পেলেন দূরে বরফের ওপর জয় ইচ্ছে করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ওলোটপালোট খেতে খেতে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গেল আরও নীচের রাস্তায়। পাড়াটা উঁচু নীচু। তাতে আরও গড়াগড়ি দেবার সুবিধে। শিবানী হাত নেড়ে থামতে বললেন। হাঁফাতে হাঁফাতে এগিয়ে গেলেন। কে কার কথা শুনছে?

আবার দেখলেন মাটি থেকে চাপ চাপ বরফ তুলে দু হাত দিয়ে গোল্লা পাকাচ্ছে। এখুনি ছেলেদের মধ্যে বরফের গোল্লা নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হবে। একবার তাঁর নিজের চশমার কাঁচেই কী জোর এসে লেগেছিল। জয় ওঁকে একেবারেই গ্রাহ্য করে না। দিন দিন অবাধ্য হয়ে উঠছে। হবে না? আদর, শাসন, কোনো কিছুই তো নেই। খুকু আছে অন্য জগতে। আর বিক্রম কাকে শিক্ষা দেবে? তার নিজের শিক্ষাদীক্ষা থাকলে তবে তো?

শিবানীর বিরক্তি তুঙ্গে ওঠে। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছোনো দরকার। শীতের মধ্যে আবার উল্টো পথে ফেরা। জয় হয়তো এতক্ষণে গড়িয়ে গড়িয়েই বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে বসে আছে। বন্ধ বাড়িতে ঢুকতে না পেরে আরও ঠাণ্ডা লাগাবে।

সন্ধ্যের পরে এমন বরফ জমে গেল আধ ফুটের বেশী বলে মনে হলো শিবানীর। জয় জোর করে স্লেজ্ নিয়ে বেরিয়েছিল। রাস্তায় কাঠের গাড়ির অনবরত ঢাল থেকে আছড়ে আছড়ে পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো। দলবল

অনেক জুটেও গিয়েছিল। শিবানী ভাবছিলেন কি ছাতার খেলা যে শুরু হয়েছে। জয়কে চাকাওলা কাঠের গাড়িতে বসিয়ে দড়ি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে চলে গেল এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। যেন জয় পিঁড়ি পেতে বসে বরফের সমুদ্র দেখতে বেরিয়েছে। ওদের শীতবোধ বলেও কিছু নেই। বাবা মায়েরাও কেমন নিশ্চিন্ত। আর যতক্ষণ না ঐ বাচ্চাগুলো বাড়ি ফিরবে, জয়কে বাড়িতে আনা অসম্ভব। এদিকে তাঁর হাজার কাজ পড়ে আছে। কোনো দিকে মন দিতে পারছিলেন না।

খুকু সাতটা নাগাদ বাড়ি এল। ততোক্ষণে বরফ পড়া থেমে গেছে। এখনও বরফ পরিষ্কার করার বড় ট্রাকগুলো এ রাস্তায় ঢোকেনি। খুকুর গাড়ি বিক্রমের পুরোনো গাড়ির পাশ কাটিয়ে গ্যারাজে ঢুকে গেল। জয় বসে বসে টিভিতে কার্টুন দেখছিল। শিবানী আজ ওকে চান করতে দেননি। একটু আগে ধরে বেঁধে চিকেন আর ভাত খাইয়ে দিয়েছেন। মার গাড়ির শব্দ শুনে জয় দৌড়ে দরজার কাছে গেল।

—"হাই মাম্! হোয়াই আর ইউ সো লেট?"

জয়কে আদর করতে করতে খুকু বলল—"বেশী জোরে ড্রাইভ্ করতে পারছিলাম না। স্ট্রীটস্ আর রিয়েলী ব্যাড।"

—"ইয়া, উই মেড্ আ স্নো ম্যান্। কাম অন্! ইউ হ্যাভ টু সী দ্যাট্।"

জয় টানাটানি শুরু করলো। খুকু বলল—"সিওর! আই উইল। বাট লেট মী হ্যাভ্ মাই টী।"

শিবানীর চা তৈরী হয়ে গেছে। আজকাল আর কেটলীতে জল ফুটিয়ে চা করেন না। মাইক্রোওয়েভের মধ্যে কাপে কাপে জল, চায়ের পাতাসুদ্ধ টী ব্যাগ দিয়ে বোতাম টিপে দেন। টুং করে শব্দ হলেই ফুটন্ত চা পেয়ে যান।

খুকু চা নিয়ে চিঠিপত্র দেখতে বসলো। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলো —"কেউ ফোন করেছিল?"

—"জানি না। বিকেলে তো অনেকক্ষণ ছিলাম না। সে সময় করতেও পারে।"

—"বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে?"

—"জয়ের ইস্কুলে। যেতে আসতে কম সময় লাগে নাকি? আর এই বরফ ঠেঙিয়ে যাওয়া। জোরে হাঁটতে তো পারি না।"

খুকু কোনো উত্তর না দিয়ে চিঠিপত্র খুলছিল। জয় খানিকক্ষণ লাফালাফি করে আবার টিভি দেখতে বসে গেল।

—"তোরা আজ খাবি কখন?"

খুকু জানলার বাইরে তাকিয়ে কিছু ভাবছিল। মার কথা শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। শিবানী সিংকে চায়ের কাপ রাখতে রাখতে আবার ডাকলেন— "খুকু, তোদের যেতে দেরী হবে নাকি?"

—"বিক্রম তো এখনও এলো না। ওয়েদারের জন্যে ট্র্যাফিক স্লো বোধহয়।"

—"হাইওয়েতে আবার বরফ কোথায়? নুনের লরী এসে এসে গলিয়ে দিচ্ছে, দেখলাম তো বিকেলের নিউজে। বাসে আসছে, তার আর কষ্ট কিসের? যত দুর্ভোগ হাঁটার সময়।"

খুকু সোজাসুজি ঘুরে তাকালো। শিবানী কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘরের বাকি কাজ সারতে লাগলেন। আজকাল এই রকমই হয়। কথায় কথায় রাগ হয়ে যায়। বিক্রম ফিরছে না বলে তোর কত চিন্তা! আর মাকে তো একবার জিজ্ঞেস করলি না বরফে যেতে আসতে কষ্ট হয়েছে কিনা। সারাদিনের সব কাজ চাপিয়ে বেরিয়ে যাস। না করলেই মেজাজ। মানসম্মান তো দূরের কথা, মা বলে একটু মায়া-মমতাও যদি করতিস। হাতে একটা ডলার পর্যন্ত দিস না। দেশে যেতে দিবি না। একটা মানুষ আর কত সহ্য করতে পারে?

শিবানী চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছেন। মনের মধ্যে যত রাগ হোক, বাইরে সহজে প্রকাশ করবেন না ভেবেও সময় সময় স্থির থাকতে পারেন না। পরে মনে হয়, চুপ করে গেলেই হতো। খুকুর সংসার ছাড়া তাঁর গতি নেই। অকারণ অশান্তি বাড়িয়ে কিইবা হবে?

শিবানী ভাত বসিয়ে দিয়ে আভ্‌নের মধ্যে ডাল, তরকারি আর মাংসের বাটি ঢুকিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে সব গরম হতে থাক। ওদের যখন ইচ্ছে হবে, তখন খাবে। নিজে এখন একটু বই পড়বেন। ব্রততী কয়েকটা বাংলা ম্যাগাজিন দিয়ে গেছে। একটু রাত হলে খেয়ে নেবেন। দুপুরে ভাত খাওয়ার অভ্যেস এদেশে এসেও ছাড়েননি। রাতে দুধ সিরিয়াল খেয়ে নেন। নয়তো টিনের স্যুপ্ আর চীজ্ স্যান্ডউইচ। প্রথম প্রথম খেতে তেমন ভালো লাগতো না। এখন অভ্যেস করে ফেলেছেন। রাত আটটার পরে বিক্রম ফিরলো। খুকু তখন চান করছিল। বই রেখে শিবানী উঠে এলেন—"তোমার এত দেরী হলো? খুকু এখনও খায়নি।"

—"আপনারা খেয়ে নিলেই পারতেন। এই ওয়েদারে যা ট্র্যাফিক পেলাম।"

—"খুকু চিন্তা করছিল। এখন আর চা খাবে? না ভাত দিয়ে দেব?"

—"দিন এক কাপ চা।"

বিক্রম এখন চা খাবে। তারপর ড্রিংক নিয়ে বসবে। গড়িমসি করে রাত বাড়াবে। খেয়ে উঠে টিভি চালাবে কতক্ষণ। পাশের ঘরে ঘুমোয় কার সাধ্য!

রাত নটা নাগাদ ওরা খেতে বসলো দেখে শিবানী নিজের দুধ সিরিয়াল নিয়ে টেবিলে এলেন। খাওয়ার টেবিলে গল্পগুজবের পাট নেই। রান্নাঘরের এক পাশে টিভি ঢুকিয়েছে। খেতে বসে বিক্রম একমনে দেখে যাবে। আগে আগে শিবানী দু-একটা কথাটথা শুরু করতেন। বিক্রম নিউজ শোনার ছুতো করে খালি চুপ করতে বলতো। খুকুর যে কি পরিবর্তন! ঐ মেয়ে কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। গল্প করতে গেলে তেমন সাড়া পাওয়া যায় না।

আজকাল রাগ করে শিবানী নিজেই বেশী কথা বলেন না। খাওয়া-দাওয়ার পর কাজকর্ম সেরে শুয়ে পড়েন। খুকুও ওপরে শুতে চলে যায়। বিক্রম কত রাত অবধি জেগে জেগে সিনেমা দেখে। আবার সকালে উঠে কাজে বেরিয়ে যায়। শিবানীর ধারণা এদের বাড়িটা খুব অদ্ভুত নিয়মে চলছে। আমেরিকায় এসে তো প্রথম প্রথম আরও কত বাঙালীদের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। তাদের দেখলে কেমন স্বাভাবিক মনে হয়। কি ভদ্র, মার্জিত সব ছেলেরা। "মাসীমা", "মাসীমা" করে মেয়েদের কি আন্তরিকতা। ওরা কেমন দল বেঁধে ক্লাব চালাচ্ছে, দুর্গাপুজো করছে, গান বাজনা থিয়েটার নিয়ে মেতে আছে। ব্রততীকেও তো দেখছেন এত বছর। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার মেয়েদেরও দেখেছেন। ঘরে বাইরে কি খাটতে পারে ওরা। না হলে এত দিক সামলাতে পারে?

খুকুরা আজকাল একদম বাঙালীদের সঙ্গে মিশতে চায় না। গত দেড় দু বছর থেকে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। সেই একবার বিক্রমদের ওষুধের এজেন্সীতে কি গণ্ডগোল হলো। পুলিস কেস্ হয়ে নানা ঝামেলা। ওঁকে কেউ ঠিকমতো ভাঙলো না অবশ্য। আন্দাজে যেটুকু বুঝেছিলেন গুজরাটি ওষুধ কোম্পানী জাল ওষুধ তৈরী করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। মাঝখান থেকে বিক্রমের চাকরি চলে গেল। কতদিন বাড়ি বসে ছিল। পরে অ্যারিজোনায় নতুন কাজ পেয়ে বহুদূরে চলে গেল। তখন থেকেই খুকু সামাজিকতা এড়াতে শুরু করেছিল।

শিবানী ভাবতেন খুকু বড় বেশী স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকের চাকরির পরে আবার রোজ সন্ধ্যেবেলা বেরোনো চাই। যেন বাইরের জগতের নেশা ওকে ক্রমশ পেয়ে বসেছিল। টিনা হাইস্কুলে, জয় ছোট। অথচ তাদের সঙ্গে থাকতো কতটুকু? সংসার, ছেলে, মেয়ে সব মার ঘাড়ে। বলতো—"রিয়েল এস্টেটের এজেণ্ট হবার ট্রেনিং নিচ্ছি। সন্ধ্যেবেলা ছাড়া সময় কোথায় আমার?"

শিবানীর কেমন ভয় হতো। খুকুর অত সাজগোজ ওঁর ভালো লাগতো না। মাথার চুলগুলোতে সোনালী রং করে এল একদিন। মুখে চোখে চড়া মেকাপ। সাজপোশাক এত উগ্র, এখানকার অন্য বাঙালী মেয়েদের মতো নয়। মাঝেমাঝে শিপ্রা দুপুরে ফোন করতো। খুকুদের পুরোনো চেনা। কাছাকাছি পাড়ায় থাকে। শিপ্রা ওঁকে বলেছিল—"মাসীমা, মীনা একদম ব্লণ্ড হয়ে গেছে দেখলাম।" শিবানী প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেননি। শিপ্রা বলেছিল—"ওকে আগে গোল্ডেন হেয়ারেও মানিয়েছিল কিন্তু। ফর্সা তো।"

শিবানী রেগে উঠেছিলেন—"কি আবার মানিয়েছে? একমাথা জটার মতো সাদা সাদা চুল খুলে ঘুরে বেড়ায়। কি ভাবে যে নিজের চেহারাটা নষ্ট করছে। আমি অনেক বারণ করেছিলাম, জানো তো?"

শিবানী খুব বকাবকি করেছিলেন। খুকুর সেই এক উত্তর—"এদেশে সবাই সাজে।"

—"না, তোর বন্ধুরা কজন চুল সাদা করেছে? বুড়ীদের মতো বিশ্রী

দেখায়। আর এত বেশী মেকাপ নিস, মুখখানাই অন্যরকম লাগে।" দিনে দিনে খুকু সাজগোজের বহর বাড়িয়ে চলেছিল। একদিন কালো চামড়ার টাইট প্যাণ্ট, কোমরে শেকলের মতো স্টীলের মোটা বেলট্ আর পাতলা সিল্কের ব্লাউজ পরে খুকু যখন তীব্র পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল, শিবানী স্পষ্ট অনুভব করলেন—খুকুর জীবনে কোথাও গোপনে গোপনে নিদারুণ ভাঙচুর ঘটে যাচ্ছে। আর কোনো কিছু ওর আয়ত্তে নেই। তাঁর একটি মাত্র সন্তান কি ভয়ংকর আবর্তের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। সে সময় তাঁর মহারাজের কথা মনে হয়েছিল। খুকুকে নিয়ে যদি একবার তাঁর কাছে যেতে পারতেন! কিন্তু কিছুই হয়ে ওঠেনি।

কয়েক মাস বাদে অ্যারিজোনা থেকে বিক্রম ফিরে আসছে জেনে শিবানী একরকম স্বস্তি পেয়েছিলেন। অথচ বিক্রম না থাকাতে তাঁর অন্তত শান্তিতে থাকার কথা ছিল। একটা মানুষকে দূর থেকে কত কম জানা যায়। খুকুর বিয়ের সময় ভালো করে খোঁজখবর তো নেননি। আমেরিকার সম্বন্ধ শুনে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। টুরিস্ট ভিসায় বেড়াতে এসে কি ভাবে গ্রীনকার্ড জোগাড় করেছিল। লেখাপড়া যাই-ই করে থাক, ছেলেটা যদি একটু মানুষের মতো হতো। চারদিকের বাঙালীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখে কি যে হিংসে আর কম্প্লেক্সে ভোগে। খুকু সারা জীবন চাকরি করছে। না হলে সংসার চলতো না। টিনা সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ক্যামপাসে রাখার খরচ কতো। নানা চাপে পড়ে আরও যেন রাগী আর সুবিধেবাদী হয়ে উঠেছে। চণ্ডাল রাগ না হলে আর অসহায় বিধবা শাশুড়িকে মারতে এসেছিল? ঘটনাটা কোনদিন ভুলবেন শিবানী? বিক্রমের গাড়িতে ওঁর গায়ের চাদরটা পড়ে ছিল। অনেক রাতে খেয়াল হতে গাড়ির দরজা খুলে চাদরটা নিয়ে এসেছিলেন। পরদিন সকালে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি। বিক্রমের গাড়ির দরজা অল্প খোলা থাকায় সারারাত গাড়ির ভেতরে আলো জ্বলেছিল। কখন গাড়ির ব্যাটারী ডাউন হয়ে বসে আছে। অশান্তির মধ্যে পড়েও মিথ্যে বলতে পারেননি। বরং বোকার মতো বলে উঠেছিলেন—"তুমি তো কিছুতেই সন্ধ্যে থেকে চাদরটা এনে দিলে না···

বিক্রম প্রায় তেড়ে এসে ওর ভাঙা হাতটা মুচড়ে দিলো—"খবরদার আমার গাড়িতে হাত দেবেন না। সব কিছু নিয়ে ওস্তাদি! গাড়ির দরজা বন্ধ করতে জানেন না···।"

শিবানী দুঃখে অপমানে কতক্ষণ ড্রাইভওয়েতে বসেছিলেন। হাতের যন্ত্রণার কথা মনেও ছিল না। তবু একসময় সেই যন্ত্রণাতেই হুঁস ফিরেছিল। জয় তাঁকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল। খুকু তো ঘটনাটার সময় ছিল না। ঠিক তার আগেই অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিল। টিনাও কলেজে থাকে। সাক্ষী ছিল একমাত্র জয়। বাবার চিৎকার আর দিদিমার কান্না শুনে ভয় পেয়ে ছুটে এসেছিল। দিদিমাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কতক্ষণ কাছে

বসেছিল। চোখ মুখ কান্নায় থমথমে। ওর সেদিন ইস্কুলে যাওয়া হয়নি। বিক্রম একবারও সামনে এল না। গাড়ির ব্যাটারি চার্জ করবার জন্যে ফোনে গ্যাস স্টেশন থেকে লোক ডেকে পাঠালো। তারপর কখন বেরিয়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা খুকুকে বলবেন কিনা ভাবছিলেন। আবার তুমুল ঝগড়া লাগবে ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন। মার গায়ে হাত তোলা খুকু সহ্য করবে না। ওঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফাঁকে জয়ই মাকে নালিশ করলো। তারপর ঠিক যা ভেবেছিলেন। খুকু আর বিক্রমের ঝগড়া, খুকুর কান্না, শিবানীর কান্না, বিক্রমের দায়সারা গোছের কৈফিয়ত, যাকে ঠিক ক্ষমা চাওয়াও বলা যায় না—এক কথায় নাটক হয়ে গেল। আর শিবানী আরও স্পষ্ট ভাবে জেনে গেলেন, বিক্রমের আক্রোশ খুব সাময়িক ব্যাপার নয়। তাঁর আমেরিকায় থাকাটাই ও বরদাস্ত করতে পারে না। তখনই কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল। খুকুর ঐ রুখে দাঁড়ানোতেই ভরসা পেয়েছিলেন। বিক্রমের পছন্দ অপছন্দে কিছু এসে যায় না। খুকুর জোরে উনি আছেন, এইরকমই ভেবে অনেক অপমানের মধ্যেও সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন।

এতদিন পরে অ্যারিজোনা থেকে বিক্রম ফিরে আসছে শুনে নিজের কথা ভাবেননি শিবানী। খুকু হয়ত নিজেকে সংযত করবে, জীবনযাত্রার রাশ টানবে আশা করছিলেন। বিক্রম চলে আসার পর সত্যিই কদিন ও আর সন্ধ্যেবেলা বেরোচ্ছিল না।

এদের সংসারে কি যে ঘটছিল শিবানী বুঝতে পারছিলেন না। বিক্রম নিজে এবার ইনসিওরেন্সের ব্যবসায় ঢুকেছে। প্রায়দিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকে না। আবার খুকু রাত করে বাড়ি ফেরা শুরু করলো। রিয়েল এস্টেটের এজেন্ট হওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই মিথ্যে বলে মনে হয় শিবানীর। তারা এরকম সাজপোশাক করবে কেন? ক্লায়েন্ট নিয়ে বাড়ি দেখানোর নাম করে রোজ রাতে একই সময়ে বেরোনো আর ফেরা এ কখনও সম্ভব! আমেরিকা বলে অজ্ঞ মাকে আবোলতাবোল বুঝিয়ে পার পাচ্ছে। আর ফোনে শিপ্রা তো পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলো খুকুকে নিয়ে লোকেরা এমন কিছু বলছে, যা নাকি ওর নিজেরও বিশ্বাস হয় না। তবে খুকু আর ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না, সেটা সত্যি।

কিছুদিন আগে হঠাৎ খুকু বলেছিল এক সপ্তাহের জন্যে ওকে অফিসের কাজে ফ্লোরিডা যেতে হবে। শিবানী ভেবেই পাননি খুকুর ব্যাংকের চাকরিতে এত বছরে কোথাও যেতে হয়নি, আর এখন ফ্লোরিডা পাঠাচ্ছে কেন? বিক্রম একদম চুপচাপ। কোনো মতামত দেয় না ইদানীং। খুকু চলে যাবার পর শিবানী নিজে আর নির্বিকার হয়ে থাকতে পারছিলেন না। একদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বিক্রমকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার বিজনেস ভালোই চলছে তো?'

—"হচ্ছে মোটামুটি। নতুন লাইন। সময় লাগবে।"

—"খুকুর তো দেখি বিশ্রাম নেই। সারাদিন ব্যাংকের চাকরি। আবার সন্ধ্যেবেলা অন্য কাজ। এত রাত করে ফেরে। ছেলের সঙ্গে মার দেখা নেই।"

বিক্রম মাথা নীচু করে ম্যাগাজিনের পাতা খুলে কিছু পড়ার চেষ্টা করছিল। শিবানী বুঝলেন ওটা সম্পূর্ণ ভান। কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আবার বললেন—"তুমি ওকে রাতের কাজটা ছাড়তে বলো। ওর তো শরীর ভেঙে যাবে এর পরে।"

বিক্রম এখনও ওঁর দিকে সোজাসুজি তাকাচ্ছে না। টিভি দেখতে দেখতে উত্তর দিলো—"আপনার আপত্তি তো রাতের চাকরিটা নিয়ে? নিজেই ওকে বলেননি কেন?"

—"কতবার বলেছি। গ্রাহ্য করে না। আমার সঙ্গে ওর কথা হয় কতটুকু? বাড়িতে এক মুহূর্ত থাকে?"

বিক্রমের চোয়াল ক্রমশ কঠিন হয়ে এল। সরাসরি শিবানীর চোখের দিকে চেয়ে রইল। শিবানীর কেমন ভয় করছিল। বিক্রম কি এখনই চিৎকার করে উঠবে? এ সব কথা তোলা কি অন্যায়?

বিক্রম ওর স্বভাবের বাইরে গিয়ে শান্ত ভাবে জবাব দিলো—"আমার ডিফিকাল্টির সময় ওর ফুলটাইম কাজটার খুব দরকার ছিল। এখনও দরকার। কিন্তু সন্ধ্যের ব্যাপারটা মীনার নিজের। ও যা লাইফ্ স্টাইল চায়, আর যেরকম খরচ করার টেণ্ডেন্সী, একটা ডাক্তার-টাক্তার দেখে বিয়ে দিলে পারতেন। আমার ক্ষমতার বাইরে। তবে আমি যা টলারেট্ করে যাচ্ছি, কোন ভদ্রলোক করতো না।"

সারারাত শিবানীর ঘুম এলো না। বিক্রমের শেষ কথাটা কিছুতেই মাথা থেকে যাচ্ছে না। কি বলতে চাইছিল ও? টলারেট অত করছেই বা কেন? ভদ্রলোক নয় বলে? টিনা ছুটিতে বাড়ি এল না। কলেজের কাজে কোথায় সামার জব নিয়েছে, বলছিল খুকু। জিনিসপত্র নিতে একদিন এসেছিল। যতক্ষণ ছিল, ঘরের দরজা বন্ধ। চলে যাবার সময় মুখখানা যেন রাগে দুঃখে গম্ভীর। শিবানী জড়িয়ে ধরেছিলেন। টিনা ওর গালে চুমু খাওয়ায় সময় লক্ষ্য করলেন চোখ জলে ভরে আছে। ওঁকে এখন মাঝেমাঝে ফোন করে। খুকুর সঙ্গে কথা হয় কিনা বুঝতে পারেন না।

খুকু আর বিক্রমের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই যে তুঙ্গে উঠছে, শিবানী তার আভাস পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্যে যে কত বড় আঘাত অপেক্ষা করে ছিল ভাবতে পারেননি। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বিক্রম বসে বসে টিভি দেখছিল। ইদানীং ড্রিংক করা বাড়িয়েছে। শুতে অনেক রাত করে। পরদিন ওঠেও দেরীতে। খুকুকে অনেক সকালে বেরোতে হয়। ও আগেই শুয়ে পড়ে।

টিভির আওয়াজে খুকু বোধ হয় ঘুমোতে পারছিল না। দুবার এসে চিৎকার করে টিভি কমাতে বলে গেল। কে কার কথা শোনে? শিবানী নিজের

ঘরে শুয়েই টের পাচ্ছেন টিভির আওয়াজ একটুও কমেনি। হঠাৎ শুনলেন দুমদুম করে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। হঠাৎ টিভি থেমে গিয়ে প্রচণ্ড চিৎকার। শিবানী ভয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। এত রাতে আবার কি ঝগড়া লাগালো খুকু ? ওঁর কি একবার যাওয়া উচিত ? তাতে বিক্রম হয়ত আরও ক্ষেপে উঠবে। কিন্তু খুকুর কান্না শুনে আর বসে থাকতে পারলেন না। ফ্যামিলি রুমে গিয়ে দেখলেন—বিক্রম ধাক্কা দিয়ে খুকুকে নিজের গায়ের ওপর থেকে সরাতে চেষ্টা করছে। খুকুর হাতে বিক্রমের খুলে রাখা চটি। উন্মত্তের মতো বিক্রমকে মারছে আর বলছে—"আই হেট ইউ ! গেট আউট অফ্ হিয়ার। ইউ সন্ অফ্ আ বীচ্।"

লজ্জায়, দুঃখে শিবানী নির্বাক হয়ে গেছেন। খুকু, তাঁর মেয়ে এমন ইতরের মতো ভাষা বলছে ! বিক্রমকে জুতো দিয়ে মারছে ! নিজের চোখে না দেখলে সহজে বিশ্বাস হতো না।

ধাতস্থ হতে যতটুকু সময় লাগলো, তার মধ্যে খুকুকে ধাক্কা দিয়ে বিক্রম উঠে দাঁড়িয়েছিল। শিবানীকে দেখে ফুঁসে উঠে বললো—"আমাকে অশিক্ষিত বলেন ! আপনারা খুব ভদ্রলোক, না ? জেনেশুনে বদমাইস পাগলকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।"

খুকু দাঁতে দাঁত দিয়ে বললো—"খবরদার মাকে গালাগালি দেবে না।"

—"গালাগালি আবার কি ? এটাই ফ্যাক্ট। তোমাদের ফ্যামিলিতে পাগল নেই ?"

শিবানীর মার কথা তুলেছে বিক্রম। বড় আঘাতের মতো বাজলো। বিষাদের সঙ্গে উন্মত্ততাকে এক করে দেখে সাধারণ মানুষ। তাঁর মার বিষণ্ণতার সঙ্গে খুকুর এই ব্যবহারের কি সম্পর্ক ?

হাঁফাতে হাঁফাতে বিক্রম তখনও শাসাচ্ছে—"বেশী তেজ দেখিও না। এরপর ঘার ধরে বের করে দেব।"

খুকুর চোখ জ্বলছে—"হাউ ডেয়ার ইউ টক লাইক্ দ্যাট্ ? কার বাড়িতে থাকো তুমি ?" শিবানী ওকে থামাবার চেষ্টা করছিলেন—"খুকু চুপ কর। ওপরে চল। মাঝরাতে কি শুরু করেছিস তোরা ?"

—"না, আজ কিছুতেই ছাড়বো না। অনেক সহ্য করেছি। একটা স্টেডি চাকরি করার কোয়ালিফিকেশন নেই, সেল্ফ রেস্পেক্ট নেই ! আমার রোজগারে থেকে আবার বড় বড় কথা !"

বিক্রম এক ঝটকায় খুকুর চুলের গোছ চেপে ধরলো—"শাট আপ ! আর একটা বাজে কথা বললে মুখ ভেঙে দেবো। তোমার ঐ এস্কর্ট সার্ভিসের টাকা ছুঁই আমি ? পাশে শুতে ঘেন্না করে আজকাল।"

খুকু যন্ত্রণায়, অপমানে কাঁদছিল। বিক্রমের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার পর বলেছিল—"এরপর দোতলায় উঠলে কোর্ট অর্ডার এনে রাস্তায় বের করে দেব। কুকুরের সঙ্গে শুই না আমি।"

শিবানীর শরীর কাঁপছিল। খুকুর জন্যে বড় কষ্ট অনুভব করছিলেন। ওদের কাছে প্রায় দয়া ভিক্ষার মতো বলেছিলেন—"খুকু, চুপ কর। আর শুনতে পারছি না। একটু চুপ কর।"

শিবানীর কণ্ঠস্বর ভেঙে যাচ্ছিলো। তখনও খুকুর দু চোখে আগুন। গালে জলের ধারা শুকিয়ে গেছে। সোনালী চুলের ঢাল জটার মতো জড়িয়ে গেছে। বুক উত্তেজনায় উঠছে, নামছে। শুধু মাকে দেখে ওর সম্বিৎ ফিরে এল। শিবানীকে ধরে ওপরে নিয়ে গেল। নিজের ঘরের দরজায় জয় দাঁড়িয়েছিল। শিবানী ওর বিছানাতে অবসন্নের মতো বসে থাকলেন।

সেই রাতে কারুর সঙ্গে কেউ আর কথা বলেনি। জয় নিঃশব্দে কাঁদছিল। শিবানী ওর মাথায় হাত রেখে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ছেলেটা ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সারারাত ধরে বিক্রমের সিগারেটের গন্ধ ওপরে উঠে এসেছিল। খুকু মাঝে মাঝে উঠে বাথরুমে যাচ্ছিলো। বেসিন খুলে চোখে মুখে জল দিয়েছিল। শিবানী ভাবছিলেন—স্বর্গ অথবা নরক বলে যদি কিছু থাকে, সে এই সংসারেরই আর এক নাম। স্বর্গ তাঁর দেখা হলো না। শুধু নরক দর্শন হয়ে গেল আজ। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে দুটো মানুষ তীব্র ঘৃণার পাঁকে ডুবে আছে। নরক দেখার আর কি বাকি?

তবু জীবন থেমে থাকেনি। তাঁর অভিজ্ঞতার পরে ব্রততীর সঙ্গেও আবার দেখা হয়েছিল। ব্রততী লিখেছিল, "মহারাজ, আমার দুঃখের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হতে চলেছে। শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বে এসে আজ যখন পেছন ফিরে দেখি, এমন কোনো সময় আমার স্মরণে আসে না, যখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু ছিল। বিষাদপ্রতিমার মতো আমার মা। তাঁর বিষণ্ণতার গাঢ় ছায়া আমার শৈশবকে ঘিরে রেখেছিল। দ্বিতীয় পর্বে, বৈধব্যের চিরশূন্যতা। সে একাকিত্বের কোনো ব্যাখ্যা নেই। একমাত্র খুকু ছিল আমার অবলম্বন। অথচ সেই মেয়েও যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল। মায়ের জন্যে তার তাপ উত্তাপ, আবেগ, ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখলাম না। আমার সঙ্গে তার দূরত্ব কোনোদিন ঘুচলো না। এই উদাসীনতা ওর কোথা থেকে এল? সংসারে কারুর জন্যে ওর পিছুটান নেই। মহারাজ, আমার ভয় হয়, ওর মানসিক গঠনে ভারসাম্যের অভাব যেন ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে। সেদিন অর্ধ-উন্মাদের মতো আচরণ দেখেছি। খুকুর সম্পর্কে আরও যে ভয়ংকর রুচি-বিকারের কথা বিক্রম বলেছে, আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না মহারাজ। হয়ত খুকুর ওপর আক্রোশ থেকে এমন সন্দেহ জন্মে থাকবে।"

ক্রমশ শিবানী বুঝতে পারছেন খুকুর সঙ্গে বিক্রমের সম্পর্ক প্রায় দিনগত পাপক্ষয়ের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সামান্য বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি করেছে, দুজনের একজনও ছাড়বে না। ছেলে মেয়ে মানুষ হয়নি, সেটাও ভাবছে। ডিভোর্স হওয়া মানে, হয় ছেলে মেয়ে নিয়ে টানাটানি, নয়, তাদের খরচ দেওয়া নিয়ে চুলচেরা হিসেব। আর আছেন বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো

তিনি নিজে। খুকু বোধহয় তাই আর ঝামেলায় যাচ্ছে না। ওরা দুজনেই অশান্তি এড়িয়ে চলছে।

কিন্তু ব্রততী অবাক হয়েছিল। বলেছিল--"ওরা এখনও একসঙ্গে থাকছে, সে ওদের কনভিনিয়েন্সের ব্যাপার। কিন্তু আপনি কেন চুপ করে আছেন? মীনার জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখলেও প্রতিবাদ করবেন না? অন্যায় দেখলে বলবেন না? লোকে যা খুশি বলুক। আপনি তো মা, আপনি কেন জিজ্ঞেস করতে ভয় পাবেন?"

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। চিরকাল ভেবে এসেছেন—প্রতিবাদ করা উচিত? নাকি মেনে নেওয়া? ওঁদের মনে হতো, হয়ত মেনে নেওয়ার অর্থ সব সময়ই হেরে যাওয়া নয়। পরিবর্তে, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিকে থাকা। মেনে না নিলে শিবানী কোথায় মানুষ হতেন? মধ্যবিত্তের সংসারে বাবার চেয়ে কাকার প্রতিপত্তি ছিল কত বেশী। মানিয়ে নিতে নিতেই তো ধোপে টিকে গেলেন সর্বত্র। কথায় কথায় রুখে দাঁড়ালে স্বামী মারা যাবার পর শ্বশুরবাড়িতেই বাস করা কি সহজ হতো? সংসারে কিছু কিছু জিনিস না পাওয়াতেই অভ্যস্থ ছিলেন। লড়াই করার জন্য সাহসের অভাব নয়, আসলে বড় রকম ঝগড়াঝাঁটি, অশান্তিকে ভয় পেতেন। শান্তি তো নিজের মনের ব্যাপার। লড়াই-এর যন্ত্রণা কি কিছু কম? অথচ এই পরিণত বয়সে তাঁর চিন্তাধারা বদলে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত দুঃখ আর অসম্মানের মূল্যেও তাঁকে এই সংসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। এমন ঘৃণ্য সহাবস্থানে মানুষ মানুষের মতো বাঁচে না। খুকুকে যা বলবার স্পষ্টই বলবেন।

শিবানীর কথায় খুকু একদিন সকালে অফিসে গেল না। বুঝেছিল মা এমন কিছু বলতে চাইছে, যা বিক্রম বা জয়ের সামনে বলবে না। বেলা করে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসেছিল। মা তার মধ্যে জয়কে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। দোতলায় চা নিয়ে এসে মা ওর কাছাকাছি বসলো। একথা সে-কথার পরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো—"খুকু, এস্‌কর্ট সার্ভিস মানে কি? সেদিন কথাটা বললো কেন বিক্রম?"

খুকু অনেকক্ষণ কথার উত্তর দিলো না। চায়ের কাপ পাশের টেবিলে সরিয়ে রেখে শিবানীর দিক থেকে সামান্য পাশ ফিরে শুলো।

—"আমাকে লুকোস না খুকু। সত্যি কথা বল।"

—"কি শুনতে চাইছো? সন্ধ্যেবেলা কোথায় চাকরি করি?"

—"সেটাই জানতে চাইছি। কাদের সঙ্গে অত রাত অবধি বাইরে থাকিস খুকু? কি দরকার ঐ চাকরি করার?"

খুকু তখনো পাশ ফিরে শুয়ে আছে। মার দিকে মুখ ফেরালো না। তবু শুনতে পেলেন শিবানী—"সন্ধ্যেবেলা মাঝেমাঝে লোকেদের সঙ্গে ঘুরতে বেরোই। বেশীর ভাগ সিংগল্ ম্যান্। নয়তো ডিভোর্সড্। কম্পানী দেবার জন্যে ঘণ্টা হিসেবে এজেন্সী থেকে ডলার পাই।"

এক দুর্বল কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"তুই ফ্লোরিডায় গিয়েছিলি কার সঙ্গে ?"

—"আমার চেনা আমেরিকান বিজনেসম্যানের সঙ্গে।"

শিবানীর কাছে খুকুর মৃত্যুসংবাদ কি এর চেয়ে অসহনীয় হতো ? কি অনায়াসে খুকু তার ঘৃণ্য জীবনযাত্রার কথা বলে যাচ্ছে। লজ্জা নেই, ভয় নেই। গ্লানিবোধ বলেও কি কিছু অবশিষ্ট নেই ? শিবানী যেন খুকুর স্বভাবের চূড়ান্ত ভারসাম্যহীনতাকেই প্রত্যক্ষ করছেন। খুকু কি ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠেছে ! জীবনে প্রথমবার শিবানীর কাছে খুকুর সংস্পর্শ অসহ্য মনে হলো। তবু ঘর ছেড়ে যাওয়া হলো না। এখনও অনেক কথা বাকি। ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়লে চলবে না। প্রায় ধিক্কার দেওয়ার মতো শোনালো তাঁর ভাষা—"আমি ভেবেছিলাম, কারুর সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে। হয়ত তাকে ভালোবাসিস। ছিঃ খুকু, এত নীচে নামতে পারলি ? রোজগারের আর উপায় ছিল না ?"

—"ব্যাংকের ঐ সাধারণ চাকরি করে এ বাজারে এতজনের সংসার চালানো যায় না মা। মাসে মাসে বাড়ির মর্টগেজ পেমেণ্ট, টিনার কলেজ, যত রাজ্যের টেলিফোন আর ইউটিলিটি বিল, গাড়ির ইনসিওরেন্স, কোথা থেকে কি করি জানো ? মাঝে বিক্রমের ইনকাম্ ছিল না কতদিন। অ্যারিজোনা থেকে কিছু পাঠাতো ?"

—"এদেশে দুটো চাকরি করেও লোকে সংসার চালাচ্ছে। তুই বিকেলে কোনো ভদ্র চাকরি নিতে পারতিস না ? দোকানে, সুপারমার্কেটে কাজ করছে না লোকে ?"

—"আমারও একটা জীবন আছে তোমরা ভুলে যাও। অনেক খেটেছি। আর দুটো শিফ্‌টে একঘেয়ে পরিশ্রম করতে পারি না। সন্ধ্যেবেলা একটু রিক্রিয়েশন দরকার হয় মানুষের। কেনই বা এ সব কাজ নেব না ? অনেক ভালো সময় কাটে। বিয়ে তো দিয়েছিলে এমন লোকের সঙ্গে যে আমেরিকাতে থেকেও বড়লোক হতে পারলাম না।"

—"সে জন্যে এমন কাজ বেছে নিলি যে সমাজে মুখ দেখাতে পারিস না। বরের হাতে মার খাচ্ছিস। আর মেয়ে ঘেন্নায় বাড়ি আসে না।"

শিবানীর উত্তেজনা ক্রমশ চরমে উঠেছিল। যেন খুকুকে আঘাত দিয়ে দিয়েই চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে। এতদিন অশান্তির ভয়ে চুপ করে থাকতেন। আজ ধৈর্যের শেষসীমায় পৌঁছে মরীয়া হয়ে উঠেছেন। নতুন করে আর হারাবার মতো কি আছে তাঁর ?

খুকু কখন উঠে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করেননি। ঘর ছেড়ে যাবার আগে ম্লান হেসে বললো—"তুমিও তো এ বাড়ি ছাড়বে ভাবছো। ব্রততী আমাকে বলছিল। মিশনে যাবার প্ল্যান করছো শুনলাম ?"

—"তুই যদি নিজেকে এতটুকুও না বদলাতে পারিস, আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়।"

—"আর তো যা হবার হয়ে গেছে মা। তুমি এত কষ্ট পাচ্ছো! তবু, চেষ্টা করেও কি কোনো কিছু ফেরাতে পারবো?"

—"সংসার টানতে গিয়ে নিজেকে শেষ করলি। ছেলে মেয়ের কাছেও কি এতটুকু মানসম্মান পাবি কোনদিন?"

শিবানীর দেহমনের অস্থিরতা ক্রমশ এক গভীর অবসাদে পৌঁছেছিল। পূজোর আসনে বসে থেকেও ধ্যানে একাগ্রতা আসে না। কখনো কখনো মহারাজের কথা মনে হয়। খুকুকে যদি একবার তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া যেত।

"এই পরিবেশ বড় দুঃসহ হয়েছে। অথচ এমন সম্বল নেই যে অন্য কোথাও যেতে পারি। দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোথায়, কার কাছে যাবো? আমেরিকাতেও হোমে বাস করার কথা ভাবতে ইচ্ছে হয় না। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ। অন্য ভাষা, অন্য জীবন। তবে কোথায় যাবো? এদেশে আপনাদের কতো মিশন আছে। সেখানে কোথাও আমার একটু জায়গা হয় না! শুনেছি সন্ন্যাসিনী অ্যাগনেস অথর্ব অবস্থায় পৌঁছেছেন। আমি তো তাঁর সেবা করতে পারি। আপনি তাঁকে বলেছিলেন 'অনিকেত'। মিশনে সর্বস্ব দান করার পরেও কোনোদিন ওখানে তাঁর নির্দিষ্ট ঘর ছিল না। বলেছিলেন, রাত্রে ধ্যানের পরে যে কোনো ঘরের মেঝেতে তিনি শুয়ে থাকতেন। এখনও তাই। সেই অনিকেত সন্তের সেবার অধিকারের জন্যে আপনার কাছে অনুমতি ভিক্ষা করছি মহারাজ।"

মিশনের অনুমতি পেয়ে শিবানী যেদিন লা আইল্যান্ড থেকে চলে গেলেন, খুকু আর ব্রততী দুজনেই পৌঁছোতে গিয়েছিল। মহারাজ খুকুকে মাঝেমাঝে আসতে বলেছিলেন। সিস্টার অ্যাগনেসের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় ব্রততী আর খুকুও সঙ্গে গিয়েছিল। অ্যাগনেস্ মাটিতে বসে বই পড়ছিলেন। বয়সের ভারে পিঠ নুয়ে গেছে। মহারাজ ডেকে বলেছিলেন —"মা, ইনি শিবানী। ঠাকুরের ভক্ত। আপনার সঙ্গে থাকবেন আর কাজে সাহায্য করবেন বলে এই মিশনেই থাকতে এসেছেন।"

অ্যাগনেসের শীর্ণমুখে প্রসন্নতার ছায়া। শিবানীকে পাশে বসতে বললেন। মহারাজ নীচেই কোথাও ঘরে চলে গেলেন। সেদিন রবিবার। একটু পরে হলঘরে তাঁর লেকচার শুরু হবে। তখন সবাই সেখানে গিয়ে বসবেন। হলঘর থেকে কার গান ভেসে এসেছিল—আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।

সিস্টার অ্যাগনেস শিবানীর হাত ধরে ঠাকুরের ছবির দিকে চেয়েছিলেন। অশীতিপর সন্ন্যাসিনীর শরীরে মৃদু কম্পন। দু চোখে জলের ধারা। মোমবাতির স্থির শিখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ব্রততী এক সময় বলল— "সময় হয়ে গেছে। এবার যেতে হবে।" খুকু কতকাল পরে শিবানীকে প্রণাম করলো। তাঁর বুকের ভেতর থেকে যেন অজস্র কান্নার ঢেউ উঠে এসেছিল। জীবনের তিনভাগ দুঃখের বিশাল জলরাশি পার হয়ে আসা হয়নি কি?

অনিকেত সন্ন্যাসিনীর হাত তখনও তাঁকে স্পর্শ করে ছিল। তিনি সেই রাজাধিরাজের কাছে উপস্থিত সকলের জন্যে মনে মনে শান্তি ভিক্ষা করলেন।

চলে যাবার আগে ব্রততী বলে গেল—"লেখাটা শেষ করে একদিন নিয়ে আসবো কি?"

—"থাক। শুধু নামটা বদলে দিও। 'রৌরব' দিও না।"

—"না, নতুন নাম ভেবেছি, 'অনিকেত'।"

সমাপ্ত